ছোট গল্পগুলো

অন্তরায়
বৃত্তি
স্থাবর
ডানাভাঙা
সাক্ষী
গরমিল
মাইক্রোস্কোপ
উত্তরণ
পালাবদল
পালাশেষের পালা
গিঁট
ইউনিফর্ম
ডেথ সার্টিফিকেট
মাটি ভিজে কাদ

মিনি ঘোষ

লেখিকার অন্যান্য বইঃ

হাইকোর্টেঃ
ওকালতি জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হাইকোর্টে।

কালাসাহিবঃ
অ্যাংলোইন্ডিয়ান সমাজের অন্তরাত্মা কে ছুঁয়ে রচিত কালাসাহিব।

মারণাস্ত্রঃ
লেক গার্ডেন্স থেকে ঢাকুরিয়া রেল লাইনের ধারে গজিয়ে উঠে ছিল এক বিশাল পল্লী। পল্লীবাসীদের জীবন যাত্রা, মনস্তত্ব, চাল চলনের খুঁটি নাটি এই উপন্যাসে। একটি সময়ের দলিল।

নারী সুরক্ষা আইনঃ
সহজ সরল, আটপৌঢ়ে বাংলা ভাষায় নারী দের সুরক্ষিত রাখার জন্য আইনি ধারার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন থেকে তোলা উদাহরন নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনি মন্ত্রক এই কাজের জন্য অনুদান দিয়েছে।

পুত্রদায়ঃ
একটা ছেলে জন্মালে সেই মায়ের জীবনে আর কোনও বোঝা থাকে না। বোঝা মানে বোধহয় দায়। আর সেই বোঝা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই বোধহয় পুত্রদায়- বড়দায়। এ কাহিনীর কর্তা ব্যক্তি সুকুদলা পুত্রদায়ে কণ্টকিত একটি চরিত্র।

ISBN 978-81-930593-2-6

শী
শেল্টর ফর হার এমপাওয়ারমেন্ট
Shelter for Her Empowerment,
B-258, Lake Gardens,
Kolkata-700045
033 24222159, +91 9830053132

সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন মিনি ঘোষ, সে ছিল যেন এক দিক দর্শন। আত্মসাৎ করেনিয়ে ছিলেন সাহিত্যের সারাৎসার। এর পরপরই শুরু করেন হাইকোর্টে ওকালতি। এই অভিজ্ঞতা ঘটিয়ে ছিল তার আত্মদর্শন এবং খুলে দিয়েছিল উপলব্ধির জগত।

Price: ₹200.00

ISBN 978-81-930593-2-6

9 788193 059326

ছোট গল্পগুলো

ছোট গল্পগুলো

মিনি ঘোষ

শী
শেল্টর ফর হার এমপাওয়ারমেন্ট

Choto Golpogulo
A compilation of short sotires
By Mini Ghosh
Shelter for Her Empowerment
E-mail : she.ngokolkata@yahoo.co.in

ISBN 978-81-930593-2-6

Copyright © Mini Ghosh

প্রথম প্রকাশঃ
January 2015
মাঘ ১৪২১

প্রকাশকঃ
শেল্টর ফর হার এমপাওয়ারমেন্ট
বি-২৫৮, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৭০০০৪৫
(০৩৩) ২৪২২২১৫৯, +৯১ ৯৮৩০০৫৩১৩২

মুদ্রক
শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা - ৭০০০০৯

মূল্য ১৮০/-

সূচিপত্র

১।	বৃত্তি	১
২।	স্থাবর	৯
৩।	অন্তরায়	১৬
৪।	ডানাভাঙা	২৩
৫।	সাক্ষী	৩৮
৬।	গরমিল	৪৪
৭।	পালাবদল	৫২
৮।	উত্তরণ	৫৭
৯।	মাইক্রোস্কোপ	৬৯
১০।	পালাশেষের পালা	৭৭
১১।	প্রতিবিম্ব	৮৪
১২।	ইউনিফর্ম	৯৪
১৩।	গিঁট	১০২
১৪।	ক্ষতিপূরণ	১১০
১৫।	ডেথ সার্টিফিকেট	১১৮
১৬।	লুণ্ঠন	১৩২
১৭।	মাটি ভিজে কাদা	১৪৬

ভূমিকা

এই ছোট গল্পগুলো নানা স্বাদের। প্রধানত গল্পগুলো মহিলাভিত্তিক। মহিলাদের নানা পরিস্থিতিতে দেখিয়েছেন লেখিকা, দেখিয়েছেন তাদের জীবনের টানাপোড়েন। একজন মাকেও যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবা যায় তাও দেখা গেছে ক্ষতিপূরণ গল্পে। তার অঙ্গহানির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে জিতে বাড়ি করার সঙ্কল্প নেয় ছেলেরা। ভাবে আর একটা অঙ্গহানি হলে কতই না লাভ হবে।

বৃত্তি জীবনের জোয়ার ভাটা। মহিলাদের জীবনে তার শারীরিক কদর্যতা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমনই নানা স্বাদে টইটুম্বুর এই ছোট গল্পগুলো।

এই গল্প বৃত্তের মধ্যে নানা বয়সী মহিলা ও তাদের নানা ধরণের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ভরে রয়েছে। প্রেম, মাতৃত্ব ও অসহয়তা নারী জীবনের নিত্য সঙ্গী।

বৃত্তি

সাদা ধপধপে পাঞ্জাবী, সামান্য গিলে করা হাতাটায় আর সাদা ধুতিতে জরির ইঞ্চিপাড়। টানটান, কোথাও এতটুকু কোঁচকানো না। ধুতি পাঞ্জাবী বেশ সময় নিয়ে পরেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। সিল্কের চাদরটা ভাঁজ করাই থাকে লম্বা করে, উনি শুধু কাঁধে ঝুলিয়ে নেন। সিল্ক বেশ চকচকে হয় ঠিকই কিন্তু একটু পুরনো হলেই কেমন যেন গায়ে লেপটে ধরতে চায়, ন্যাতান্যাতা লাগে। ঋজু ভঙ্গীটা চলে গেলেই ব্যক্তিত্বের দফারফা। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য তাই চাদর বদলান। আগে আগে পুরনোটাতেই অ্যারারুটের মাড় দিতেন, কিন্তু এখন পাল্টান। পুরনোতে মাড় দিলে চটচটে থাকে ঠিকই কিন্তু চমক থাকে না। আয়নায় ঘুরে ফিরে চেহারাটা দেখে নিলেন শ্যামাপদবাবু।

বাঃ। বেশ খোলতাই হয়েছে। শুধু—

এই শুধুটুকু নিয়ে মনটা আজকাল খচ্‌খচ্‌ করে বড্ড।

ভগবান আর উনি নিজে মিলে চেহারাটা বানিয়েছেন জবুর, কিন্তু এই অসম্ভব খাড়া নাকটা ঠিক মানানসই নয়। সাইড প্রোফাইলটা ভাল আসে না— কেমন যেন চোয়াড়ে লাগে। যাক, পুজোটা শেষ হোক, দেখা যাক। এবার চটিজোড়াতে পা গলালেন উনি। হরিণের চামড়ার তৈরী চটিতে পা দুটো ঢেকে যায়। রেগুলেটরটা ঘুরিয়ে পাখাটাকে আস্তে করে দিয়ে চেয়ারটাতে বসলেন। দুটো চোখ বন্ধ করে এবার শুধু অপেক্ষা।

ঘোষদস্তিদারের বাড়ির গাড়ি আসবে নটা নাগাদ। কিন্তু শ্যামাপদ ভট্টাচার্য সাড়ে আটটার মধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরি। শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়োতে অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে যায়। সবসময় তাই বেশ কিছুক্ষণ হাতে সময় রেখে উনি তৈরি হয়ে বসে থাকেন। অবশ্য যজমান এলে তিনি আধঘন্টা সময় নেন। চুপচাপ চেয়ারে কাপড়ে জড়ানো ন্যাসপ্রকরণ পুরোহিত দর্পণ, গীতা, চণ্ডী ও নারায়ণ শিলা হাতে নিয়ে স্মিতমুখে দরজা খুলে দাঁড়ান। কখনও কখনও কোন যজমান হয়তো বলে ফেলে—ঠাকুর মশাই, আমাদের বাড়িতেই তো নারায়ণ শিলা ছিল—আবার আপনি—ঠাকুর মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অবশ্য কথা বন্ধ হয়ে যায় যজমানের। স্বর্গীয় দীপ্তিতে ভাস্বর দুটি চোখ। ইস্‌। লজ্জায় কুঁকড়ে যায় সেই যজমান। উনি কি আর ঘণ্টা নাড়া পুরুত ঠাকুর? উনি ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত মানুষ। ওনার পূজা-বিধিই আলাদা।

আলাদা—শ্যামাপদ ভট্টাচার্য নিজেও জানেন স্বতন্ত্র এই স্টাইলটাই ওর মূলধন। দুধের মতো সাদা পোশাক, পায়ে অজিনের জুতো, হাতে লাল কাপড়ে জড়ানো পুঁথি, নারায়ণ শিলা ওর ভাবমূর্তিতে সম্পূর্ণতা আনে।

রোজ যেমন ঘটে আজও তারই পুনরাবৃত্তি হলো। চার বছরের পুরনো যজমান শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে দরজায় দেখে কাঁপাকাঁপা হাতে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালেন। লীলায়িত ছন্দে দীর্ঘকায়, সৌম্যকান্তি শ্যামাপদ ভট্টাচার্য গাড়িতে উঠে বসলেন।

আজ মহাষষ্ঠী।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য—এই নামে তার যজমানরা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। যারা তার যজমান হবার যোগ্যতা রাখে না, তারাও। কিন্তু এই নামটা স্বয়ং শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শ্যামাপদের মতো এইরকম একটা ম্যাড়ম্যাড়ে, অখাদ্য নাম আছে নাকি পৃথিবীতে আর একটা? জন্ম দেওয়া ছাড়া এই নামকরণ কাজটাই করেছে খালি ওর পিতৃদেব চিদানন্দ ভট্টাচার্য। টিঙটিঙে রোগা, হ্যাংলা, ভীতু আর অসম্ভব বোকা বোকা স্বভাবের লোকটায় কল্পনার ফসল অবশ্য শ্যামাপদ ছাড়া কিবা হওয়া সম্ভব? অথচ ঠাকুর্দা কিন্তু বাবার নাম রেখেছিল চিদানন্দ। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের যখন প্রায় তেরো বছর বয়স তখন ওকে গ্রামের টোলে ভর্তি করে দিয়েছিল চিদানন্দ ভট্টাচার্য। খোকা নামটাই তখন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ওর। অন্নপ্রাশনে কি নামকরণ হয়েছিল, সেটা জানা যায়নি কখনও। পিতৃভক্তিতে গদগদ হয়ে টোলে দাখিলের সময় ছেলের নাম দিল শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। হরিপদ ভট্টাচার্যের নাতি শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। বয়স আর একটু বাড়লে গল্প উপন্যাসে অনেক সুন্দর সুন্দর নামের হদিশ পেয়েছিলেন, রাগে তাই গরগর করতেন শ্যামাপদ...কেন? এই পদ-মার্কা নামটা ছাড়া নাম ছিল না?

আমি অনেক ভেবেই এই নামটা দিয়েছি রে বাপ। চিদানন্দ একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেছিল সেদিন বেড়ে ওঠা ছেলের দাবড়ানিতে।

ভারি নাম হলে লোকে বড় ঠাট্টা করে। আমার মতো তোকেও যদি সইতে হয়, নামের ভার বইতে হয়—তাই ভয়ে—চিদানন্দের হলুদ ছাপ মারা দাঁতগুলো মোটা ঠোঁটদুটোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায়।

করবে না ঠাট্টা, যেমন ছিরির কান্তি, তেমনি ভ্যাবলা।

শেষ বাক্যটি অবশ্য শ্যামাপদ নিঃশব্দেই বলেছিল। তবু ঈশ্বরের প্রতি শ্যামাপদ ভট্টাচার্য কৃতজ্ঞ, কারণ ওই চিমড়ানো চেহারাটা উনি পাননি। হরিপদর কন্দর্পকান্তি রূপ এক ধাপ পায়ের নিচে রেখে পরের ধাপে বর্তেছে। ভ্যাগিস্, ভ্যাগিস্ ঘটেছে সেটা।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য নিজের শরীরে দেবকান্তি ঠাকুর্দার চেহারাটাকে শান দিয়ে রাখছেন। ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে সবসময়। ঘোষদস্তিদারের পূজামণ্ডপ তাই যেন লাভ করেছে অতিরিক্ত একটি মাত্রা। দ্রুততালে ছটা কাঠি তিনটে ঢাকের ওপর বাজছে। ধূনোর গন্ধে চারিদিক ম ম। মৃন্ময়ী প্রতিমার সামনে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করছেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। সারা শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রভাময় জ্যোতি। গভীর দুটো চোখ প্রতিমার দুই চোখে নিবদ্ধ। অধিবাস করে প্রতিমার চারকোণে চারটে কাণ্ড আরোপণ করে উনি সূত্র বেষ্টন করলেন। এই সময়ে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের উপরিভাগে পাঞ্জাবী নেই। ধপধপে উপবীতটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে চাদরের ফাঁক দিয়ে। ভি ডি ও ক্যামেরার চোখ ঘোরাফেরা করছে—একবার দূর্গাপ্রতিমার মুখ, একবার শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দুটি হাত, একবার দূর্গাপ্রতিমার ফুল প্রোফাইল একবার শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের উদ্ভাসিত মুখ। লেন্স ঘুরছে, ঘুরেই চলেছে।

পূজামণ্ডপের ওপরে ঝুলছে চারটে ঝাড়লণ্ঠন, চারটে ফ্ল্যাড লাইট মণ্ডপের গেটের সামনে। সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গনের দুধারে সারি সারি নিয়ন লাইট। ছোট ছোট বালবে তৈরি

মণ্ডপের আলোসজ্জা। নতুন রঙীন শাড়িতে সজ্জিত মহিলারা কেউ বা বসে আছে চেয়ারে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চারা খেলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নতুন পোশাকে পুরুষরা একটু যেন লাজুক, লাজুক। শুধু কর্তা বিনায়ক ঘোষদস্তিদার আর ওনার স্ত্রী রমলা ঘোষদস্তিদার সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরছে ফিরছে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের আশেপাশে। টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো রিলের মধ্যে জুড়ে যাচ্ছে।

বাড়ির পুজো কিন্তু খুব ভিড়। আশেপাশের বাড়ি নয় শুধু, বাইরের বহু মানুষ দলে দলে আসছে। উত্তর কলকাতার বহু পুরনো ঐতিহ্যময় পরিবারগুলোর বাড়ির পুজোর মতোই, দক্ষিণ কলকাতার ঘোষদস্তিদারের বাড়ির পুজোও টানছে শহরকে। তবে এই বাড়ির পুজো পুরনো নয়, চারবছর হল শুরু হয়েছে। নতুন মণ্ডপ, নতুন ধরনের আয়োজন, হাল ফ্যাশানের সব কিছু। প্রথম বছর থেকেই শ্যামাপদ ভট্টাচার্য পুরোহিত।

বিনয়বাবুর শালীর মেয়ের বিয়েতে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওনার আলাপ। এক আমেরিকান সাহেবকে বিয়ে করলো মেয়েটি। দিল্লিতে হয়েছিল বিয়েটা। ওই দেশে আলাপ, এই দেশে বিয়ে। হিন্দু হয়ে বিয়ে করলো সাহেব। দিল্লির উঁচু মহলে কোনও কাজ হলো আর শ্যামাপদ ভট্টাচার্য যাজক নয়, সেটা হতে পারে না। অসাধারণ ওর উদার চিন্তাধারা মুগ্ধ করেছিল ঘোষদস্তিদারকে। বিয়েটা হয়েছিল তাজ প্যালেসে ইন্টার কন্টিনেনটালে। সময় বাঁধা। সকাল থেকে রাত অবধি যা যা আচার অনুষ্ঠান আছে সবই সারতে হবে মাপা সময়ের মধ্যে। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বাদ দিয়ে দিলেন। কিন্তু ত্রুটিহীন ওনার বিবাহ বিধি। বিবাহ কুশণ্ডিকার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিধি মেনে চললেন। হলের মাঝখানে হোম শুরু হলো। আগুনের তাপে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের রক্তিমাভ মুখ। প্রকৃত কর্ম, জয়া হোম, অষ্টাদশাহুতি—একাগ্রচিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করে চললেন উনি ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা, দিং চিত্তায়—গুরুগম্ভীর নিখুঁত সংস্কৃত উচ্চারণ। ঘোষদস্তিদার শুধু নয় সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল যখন বিবাহ শেষে সেই একই ব্যক্তি ভিন্নদেশী ছেলেটিকে নির্ভুল ইংরেজীতে চাপাস্বরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন হিন্দু বিবাহ মন্ত্রের অর্থ।

পুরুত বংশের ছেলে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের ইংরেজী বলিয়ে কইরে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি যেটা হওয়ার কথা নয় সেটাকে হওয়ার কথা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় সকলকে। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের অন্তর্নিহিত শক্তিটি হল ওর সুগম্ভীর বোধ। নিজের কাজের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান। এই জ্ঞান জাগরণের মূলে অবশ্য আছে বৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা।

সপ্তমী লেগে গেল এবার খুব সকালে। ভোরবেলা শুদ্ধবস্ত্রে, শুদ্ধচিত্তে ভট্টাচার্য শুরু করে দিলেন দেবীর আরাধনা। স্নানান্তে লাজচন্দন, শ্বেতসর্ষপ, দুর্বা ও আতপ তন্ডুল গ্রহণ করে ওঁ অস্ত্রায়ফট্, এই মন্ত্র সাতবার উচ্চারণ করে ভূতাপসারণের মন্ত্র বলতে লাগলেন। গম্‌গম্ করে মাইকে বাজছে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর। সত্যিই গায়ে কাঁটা লাগে, হাত পা যেন আলগা হয়ে যায় শ্রোতাদের। সপ্তমী অষ্টমী, দুদিনই পুজো দেখতে ভিড় লেগেই থাকলো। এই রকমই ভিড় লেগে থাকতো যখন হরিপদ ভট্টাচার্য পুজো করতো সুবলপুরে জমিদার বাড়িতে। সুবলপুর নয়, শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের জন্মভূমি হাওড়া জেলার তেঁতুলগাছি গ্রাম।

সেখান থেকে বিশক্রোশ তফাতে সুবলপুরের জমিদারী অঞ্চল। তেঁতুলগাছির আশেপাশে সমস্ত গ্রামে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, কালীপূজা বা মানতরক্ষার পূজাতে হরিপদ ভট্টাচার্যের যাজকবৃত্তি ছিল রমরমা। সুবলপুরের দুর্গাপূজা হতো খুব ধুমধাম করে। একমাস আগে থেকে উৎসবের সাড়া পড়ে যেতো। মেলা হত। কলকাতা থেকে নাটকের দল আসতো। গানবাজনা, মোরগ লড়াই আরো কত কীহু জমিদার নীলরতন রায় মহাসমাদরে পাল্কী পাঠিয়ে দাদুকে নিয়ে যেতেন। একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখেছে কি সম্মান ছিল দাদুর। আলাদা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, নতুন ধুতী, গামছা, বাসন কোসনও দিতো। ঝক্‌ঝকে কাঁসার আর প্রত্যেক বছর পুজা শেষে সন্তুষ্ট হয়ে রূপোর একটা বাসন দিতো দাদুকে। ফেরার পথে শ্যামাপদ রূপোর বাসনটা বুকে চেপে বসে থাকতো। আর খাওয়া দাওয়া—শ্যামাপদবাবুর নাকে এখনও লেগে আছে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ। সুগন্ধী আতপচালের ওপর রূপোর বাটিতে গরম করা সোনার বরণ ঘি। দূর্গা পূজাতো এক পুরুতের কাজ নয়। দাদুর কাজ ছিল তন্ত্রধারকের। চণ্ডীপাঠের জন্য আলাদা ব্রাহ্মণ। দাদু পূজা পরিচালনা করতেন। সন্ধ্যেবেলায় দাদুর ওপর যেন ভর করতো অলৌকিক শক্তি। অক্লান্ত হাতে আরতি করে চলতেন। কখনো হাতে বস্ত্র, কখনো প্রদীপ, কখনো ধুনুচি কখনো বা শঙ্খ। ভাবরসে উন্মত্ত দাদুর সারা শরীর ঢাকের তালে তালে দুলতো। মঞ্চের একপাশে বসে শ্যামাপদ ভট্টাচার্য বিস্ফারিত চোখে অবলোকন করতেন সব। খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো প্রৌঢ় শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের মনে আজও গ্রথিত আছে। আজও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পান দূর্গাপূজার সেই গভীর রাত্রি। দাদু পাঠ করে চলেছেন চণ্ডী। উদাত্ত কণ্ঠে দাদু পাঠ করতেন। সারাদিন পূজা মণ্ডপে পূজা পরিচালনার ব্যস্ত থাকতেন আর রাতে চণ্ডীপাঠ। দিনে অন্য ব্রাহ্মণ পাঠ করতো, সারারাত দাদু। বাড়তি এই কাজটুকু দাদু করবেই আর সে জন্যই তো—দলে দলে লোক গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসতো দাদুর চণ্ডীপাঠ শুনতে। মোহিত হয়ে যেত ওর শুদ্ধ উচ্চারণে, বাচনভঙ্গীতে। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য যখন বেশ ছোট ছিল তখন ওর দাদু বলেছিল ওকে—বুঝলি, যাজকবৃত্তিও একটা পেশা। মানুষের বিশ্বাস অর্জনের পেশা। এই জন্য যজমানদের চোখদুটোকে তৈরি করে নিতে হয়। এই যে আমি দূর্গাপূজায় দিনরাত লোকজনের মধ্যে থাকি তার কারণ জানিস্? চনমন করে চণ্ডীপাঠ করতে পারলে লোকের আস্থা বাড়ে, নাম ছড়ায়। আবার দেখ, দুর্গাপূজার সময় আমি যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করছি সেটারও সাক্ষী থাকে শত শত লোক।

ব্রহ্মচর্য কি তখন বোঝেনি অবশ্য ভট্টাচার্য, কিন্তু এটা আজ স্পষ্ট বোঝে। কেন টাউনে দাদুর একজন বাঁধা মেয়েমানুষ আছে জেনেও গ্রামবাসী কোনদিন ইঙ্গিত পর্যন্ত করত না। কারণ দাদু ওর একটা নিজস্ব কায়দায় যজমানদের চোখদুটো তৈরি করেছিল। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পূজা সর্বক্ষেত্রে কাজটা হতো মনোহারী। পূজাবিধির এই মনোহারিত্বের গুণেই ঠাকুর্দার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল কলকাতা মহানগরে। জীবনের শেষ দুর্গাপূজা উনি করেছিলেন কলকাতায়। শ্যামাপদ ছিল হরিপদ ভট্টাচার্যের নিত্যসঙ্গী। টাকা পয়সার স্বচ্ছলতা ক্রমেই বাড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেলেন ঠাকুর্দা হরিপদ ভট্টাচার্য। আর তারপর? হরিপদ ভট্টাচার্যের ছেলে চিদানন্দ ভট্ট দিলো সব গুলিয়ে। ওর এই ক্যাবলা কার্তিক

চেহারা, এলোমেলো পূজাবিধি দুদিনেই যজমানদের ভক্তি ছুটিয়ে দিলো। গড়গড় করে মন্ত্র পড়ে যেতো, না ছিল যতি না উত্তাপ। যজমানরা বলতে শুরু করলো—কি বাবা আর কি ছেলে বড় বড় কাজ গিয়ে হাতে রইল শুধু নিত্যপূজা। গোটাকয়েক কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও হাতে থাকল। নিত্যপূজাতে পাঁচ কাহন ধান আর গোটা দুয়েক টাকা দক্ষিণা। বছরে দুবার দুটো করে কাপড় পরিবারের সবার জন্য প্রায় চেয়েচিন্তেই নিতো চিদানন্দ ভট্টাচার্য। তার যজমানদের থেকে ভাগে ভাগে। দারিদ্র্য অনটন সংসারটাকে গিলে ফেললো যেন। বাবার অসুবিধা হলে শ্যামাপদকেও ছুটতে হতো নিত্যপূজা করতে। মনটা তখন থেকেই ছটফট করতো। পূজার ঘরের ছোট জানলাটা দিয়ে বারেবারেই তার চোখ ছুটতো বিশাল উন্মুক্ত আকাশের দিকে। পুরুতগিরির দৈন্য নয়, আমার চাই পৌরাহিত্যের সম্মান। বাইশ বছর বয়সেই বাপ মা, ভাই বোন ছেড়ে উনি কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। যত দিন যাচ্ছে গ্রামভিত্তিক কোন পেশাই আর টিকতে চায় না। আগে এলেম থাকলে গ্রামেও করে খাওয়া যেত কিন্তু এখন ঢু ঢু। তাই কলকাতা।

গত তেত্রিশ বছর ধরে গতানুগতিক বিধিনিয়মের ছকটাকে ভেঙে স্তরে স্তরে আলগোছে ঢেলে দিয়েছেন অল্প অল্প কারণসুধা। যেমন সন্ধিপূজাতে চামুণ্ডার পূজা ঘোষদস্তিদারের পারিবারিক প্রথাতে ছিল কিনা জানা নেই। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য প্রথম বছর থেকেই সন্ধিপূজাতে চামুণ্ডার পূজা চালু করলেন। অবশ্য কোনকিছুই শাস্ত্রবহির্ভূত নয়। দেশ বিভেদে সন্ধিপূজাতে চামুণ্ডার পূজা হয়ে থাকে। ভট্টাচার্যের সন্ধিপূজার খ্যাতি আকাশ ছুঁয়ে গেল। বহু লোকের সমাগম হয়েছে এবারও। ঘোষদস্তিদারের ব্যবস্থাও চমৎকার। সামনের বিশাল প্রাঙ্গনে চেয়ার পেতে দিয়েছেন সারি সারি। নির্বাক দর্শক আপ্লুত চিত্তে শুধু দেখে চলেছে কি স্বর্গীয় অভিব্যক্তি পূজারীয় মুখ জুড়ে, কি অসামান্য মাদকতা ছড়ানো কণ্ঠস্বরে। ঈশ্বর সাক্ষী বেয়াড়া নাকটার জন্য ওর মনটা যে খুঁতখুঁত করছে, সাবলীল ভঙ্গীটা দেখে তা ধরার উপায় নেই একফোঁটা। গভীরভাবে উদ্বেলিত ভট্টাচার্য ঘুরে ঘুরে উচ্চারণ করে চলেছেন—

ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী—

চারিদিকে চুপচাপ। শুধু ভি ডি ও ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছেলেটি নিঃশব্দ পদচারণে ফোকাস করছে ক্যামেরার লেন্স।

ভাবগম্ভীর সংস্কৃত উচ্চারণটা যে কত প্রয়োজনীয় সেটা জীবনের প্রারম্ভেই জেনেছিলেন ভট্টাচার্য। এছাড়া আর একটা জিনিসেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। আধুনিকীকরণ। সব জিনিসেরই প্রয়োজন আধুনিকীকরণের। এই আধুনিকীকরণের মোক্ষম অস্ত্র একটাই—সেটা হল ইংরেজী। এই ইংরেজীর জোরেই লোকে সমীহ করে, বেশ একটা আলাদা মর্যাদা দেয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে যখন ইংরেজী সংলাপ মিশে যায় তখন তার ফল কি হয় শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের জীবন তারই সংজ্ঞা।

ঘোষদস্তিদারের শালীর আমেরিকান জামাইয়ের বিয়েতে ওনার মুখে ইংরেজী শুনেই তো প্রচার ছুটলো দেশবিদেশে। গোপনে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে গেছেন যুবা বয়সে। সংস্কৃত বইগুলোর আড়ালে আজও আছে 'হাউ টু ইনক্রিজ ইয়োর ওয়ার্ড পাওয়ার', 'স্পিক বেটার

রাইট বেটার'। শুধু অবশ্য ইংরেজী নয়, ভাবভঙ্গীও উলটে পালটে রপ্ত করতে হয়েছে। দিল্লির বিয়ের ক্যাসেটটাতে শ্যামাপদর সুললিত ভঙ্গী আর ঐশ্বরিক ভাবেই তো সম্মোহিত হয়েছিল আমেরিকা প্রবাসী বাঙালীরা। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের মুখের ওপর ছলকে ওঠা পুলকটাকে রুখতে পারেন না একদম যখন মনে হয় পুরুতগিরি করে আমি আমেরিকাও ঘুরে এসেছি। আবার এসেছে আমন্ত্রণ। এবারেও বিবাহ। জানুয়ারী মাসে মিঃ দাশগুপ্তের কন্যার বিয়ে, ওকে যেতে হবে।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্যর দৃঢ় বিশ্বাস সামান্য একটা পরিবর্তন যদি উনি আনতে পারেন সামনের বছর দুর্গাপূজা তিনি আর ভারতবর্ষে করবেন না।

বহু কষ্টে জমে ওটা বৃত্তিও নষ্ট হয়ে যায়, নিজের চোখে দেখেছেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। হরিপদ ভট্টাচার্যের অমন ফলাও ব্যবসা কিভাবে শেষ করলো চিদানন্দের ক্লীবত্ব। ক্লীবত্ব ছাড়া আর কি? যে কিছু ফল প্রসব করে না সে তো ক্লীবই। নিজেকে কেটে ছেঁটে গ্রুমিং করতে হয়—তা না হলেই ফসকা।

ষষ্ঠী থেকে দশমী কেটে গেল ঝট করে। মনটা বেশ উতলা হয়ে আছে শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের। জানুয়ারী মাসে আমেরিকা যাওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেবেন ভাবছেন। এইবার পুজোর ক্যাসেটটা দেখেই চরম সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অক্টোবর মাসটা প্রায় কাবার করে দিয়ে ঘোষদস্তিদারের ডাক এলো। প্রত্যেক বিয়ে, পূজা, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ যাই হোক না কেন, ভট্টাচার্যবাবু এই ডাকটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। ভি ডি ও ক্যাসেটে বিয়ে, পূজা, শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞের পুনরাভিনয় দেখেন। উনি মন্ত্র পড়ছেন, উনি উঠে দাঁড়ালেন, দু চোখ মুদে উনি আওড়াচ্ছেন বীজমন্ত্র, ওর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি, আত্মসমাহিত উনি, ঋষির মতো বর কনেকে আশীর্বাদ করছেন সেই উনি, ছন্দময় শরীরটা মূর্তির সামনে হিন্দোলিত—আরও কত রকম ভঙ্গী, কত রকম এক্সপ্রেশন।

মুখে নির্লিপ্ততার প্রলেপ লাগিয়ে ভট্টাচার্য নিজেকে দেখেন।

ঘোষদস্তিদার নিজেই এলেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে ক্যাসেট দেখার আমন্ত্রণ জানাতে।

যাবেন তবে ঠাকুরমশাই—কাল বিকেল ছটায়। আমি যদি কোন কারণে না পারি, সুজয় আসবে আপনাকে নিতে। গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

সে হবেখন, সে যাবখন।

আজও সাড়ে পাঁচটার মধ্যে তৈরি হয়ে বসে থাকেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। ঠিক ছটায় গাড়ি আসে। ঠিক সাড়ে ছটায় বেরন উনি। গাড়িতেও ওঠেন। বাহ্যিক ভাবে সব কিছু খুব স্বাভাবিক, গতানুগতিক, কিন্তু শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের হৃদয়ে দামামা বাজছে। আজই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবো।

ক্যাসেট চালু হল—পর্দায় ষষ্ঠী, সপ্তমী, ঠিক-ঠিক আছে—অষ্টমী-সন্ধিপূজা-ইইস,—ক্যামেরা নিয়ে ছোঁড়াটা বোধহয় তখন মঞ্চের বাঁপাশে দাঁড়িয়েছিল—খাড়া নাক—সেই নাক—অথচ মূর্তির পেছনের জায়গাটায় দাঁডালে ওনার ফ্রন্ট প্রোফাইলটা পাওয়া যেত। রসটাই আর পাক দেওয়া যাবে না মনে হচ্ছে।

(৬)

মুডটা বিগড়ে গেল। বারবার দেখা বারবার জানা বোঝা জিনিসটাই দেখলেন, তবু খিঁচড়ে গেল মনটা। আবার এই বয়সে নতুন মডেলে ঢালতে হবে সবটা। আমেরিকায় জানুয়ারীতে যাওয়ার আগেই নিখুঁত হওয়া চাই। দেশ থেকে বিদেশ পাড়ি।

মনের ভেতরকার দশভাগ দ্বিধা মুছে একশভাগ সিদ্ধান্ত নিয়ে ডক্টর মুখার্জীর চেম্বারে এলেন ভট্টাচার্য। অনেকদিনের যজমান এই ডাক্তারবাবু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে তাই অসুবিধে হয়নি।

আসুন ঠাকুরমশাই, আসুন—ডাক্তারবাবু উষ্ণ গলায় আহ্বান করলেন, চেয়ারে বসেই অবশ্য। ডক্টর মুখার্জী কলকাতার একজন প্রথিতযশা ডাক্তার। লোকে বলে ডাক্তারবাবু হাতের খেলায় মানুষ বদলান।

ডাক্তারবাবু—ঠাকুরমশায়ের জমজমাট স্বরটা কিঞ্চিৎ ঢিলেঢালা।

বলুন—ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বলেন।

একটা কথা বলার ছিল—তখনও ঠাকুরমশাই কুণ্ঠিত।

কার সমস্যা? আপনার? ডাক্তার মুখার্জী ভট্টাচার্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।

আমরাই—মানে—ঠাকুরমশাই থামলেন।

প্রদীপে পুড়িয়েছেন নাকি? স্কিন গ্রাফটিং করাবেন? কোথায়? পায়ে? পিঠে? হাতে? ডাক্তারবাবু হাতড়াতে থাকেন।

না না, ওসব কিছু না।

তবে?

চোখদুটিকে সজোরে বন্ধ করে ইতস্তত ভাবটা গিলে ফেলেই বলেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য—

আমি প্লাস্টিক সার্জারী করাতে চাই।

ডাক্তারবাবু কথা বলেন না, শুধু ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে রাখেন।

আমার নাকটা। ভীষণ খাড়া। বড্ড বাজে লাগে।

কত বয়স হলো আপনার? ডক্টর মুখার্জীর গলায় এবার ধ্বনিত হয় পেশাদারী ডাক্তারের নির্মোহ কণ্ঠস্বর।

পঞ্চাশ। শ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবার চোখ খুলে ফেলেন।

এতো বয়সে এতো মেডিকেল হ্যাজার্ডস্—হঠাৎ কিছু কমপ্লিকেশন হয়েও যেতে পারে। আর সত্যিই যখন আপনার কোনও প্রয়োজন নেই, তবে অকারণে—

ডক্টর মুখার্জী কি কিছুটা বিরক্ত। রোগী দেখেও কি ডাক্তার বিরক্ত হয়?

অকারণে মানে? শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের গলার স্বর এবার শক্ত পোক্ত।

মানে আপনি যদি ফিল্মস্টার হতেন অথবা মডেল, তবে নাহয় প্রফেশনের জন্য এই বয়সে নাক পাল্টানোর প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনার প্রফেশনে—

এবার স্থির চোখে তাকালেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য—

একজন ফিল্মস্টারের বছরে কটা ফিল্ম রিলিজ করে? কণ্ঠস্বরও ভট্টাচার্যের অকম্পিত।

হবে দশ, বারো, ষোল—বলতে পারলাম না—ডাক্তারবাবু হেসে ফেলেন।

বেশ ধরা যাক্ না হয় কুড়িটা—উত্তেজনাকে ঠেসে ধরে রাখে ভট্টাচার্য।—কিন্তু একজন পুরুত ঠাকুরে কটা ক্যাসেট বের হয় জানেন? বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা বছরে কটা হয়?

ডক্টর মুখার্জী হয়তো মনে মনে উত্তরটা গোছাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগে একটু দম নিয়ে ভট্টাচার্য নিজেই উত্তর দিলেন—অগুন্তি। আর সবকটাতে ক্যামেরা ফোকাস করছে পুরুতকে। পূজা, কত শ্রাদ্ধ—সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ আমাকে ক্যামেরা ফেস করতে হয়—কথা বলতে বলতেই ভট্টাচার্যের গলায় ফুটে ওঠে ত্রাসের আভাস, উনি বলেন—আর যদি ক্যামেরায় এই বদখত নাকটা বার বার যজমানদের চোখে পড়ে তবে থাকবে তাদের আস্থা পুরুতের ওপর? থাকবে কোন মোহ?

কিন্তু—ডক্টর মুখার্জীর কথাটা শেষ হয় না। সোজা হয়ে বসে দৃঢ় গলায় বলে শ্যামাপদ ভট্টাচার্য।

না, না, নাকটা ছাঁটতে হবে, এ নাক আমার চলবে না।

স্থাবর

বড় ট্রাঙ্কটার একেবারে তলার দিকে রাখা রাখা ছিল গালিচাটা। ওপরে দুটো পুরনো লেপ, কিছু চিঠিপত্র, ছেঁড়া একটা বালিশ কাপড়ে জড়ানো আর দু চারটে বাসনও। একটা কাঁসার বাটি, বেশ বড়, দুটো দু মাপের গ্লাস। এই বাসনকটা যে এই ট্রাঙ্কটার ভেতরে ছিল সেটা একদম খেয়াল ছিল না। প্রীতিবালার, গালিচাটা বার করতে গিয়েই দেখল। ভারী ট্রাঙ্কটা অনেকদিন হলো খোলা হয়নি, ঢাকনাটা কেউ না ধরলে এখন আর পারে না প্রীতিবালা। ধরারও কেউ নেই, আর প্রয়োজনটাই বা কি? ঠাকুরঝিই ধরলো। ওর ইচ্ছে ছিল নিজে বার করে কিন্তু পুরনো লেপ আর বালিশগুলো থেকে এতো তুলো বেরিয়ে উড়তে আরম্ভ করলো যে প্রীতিবালা হাত লাগালো।

বার তো করলে, দ্যাখো অবস্থা— মুখ ঘুড়িয়ে আস্তে আস্তে ধূলো ঝাড়ে প্রীতিবালা। একটু জোর লাগালেই তো আরও ফাঁসবে।

বাইরে নিয়ে চল— ধূলো উড়লেই হাঁচি আসে আমার। একবার সশব্দে হাঁচার পর আরেকটা হাঁচি তখন সুখলতার উর্দ্ধমুখে।

ধূলো জড়ানো গালিচাটাকে পেছেনের বারান্দার মাটিতে ফেলে আলতো হাতে থুপ থুপ করে ধূলো ঝাড়ে প্রীতিবালা। এবার হাত লাগায় সুখলতা, কিছুটা ধাতস্থ। চৌকিটার ওপর পাতলো দুজনে দুদিকে ধরে। চার পাশ দিয়ে ঝুলে থাকলো গালিচাটা। চৌকির চেয়ে এমনিতেই বড় তার ওপরে মাঝে মাঝে বিরাট মাপের ছেঁড়াগুলো ওটার আয়তন বাড়িয়েছে। একদমই গেছে। দুদিনেই পুরো নষ্ট হবে। তুমি তেলের বাটিটা ওপরেই রাখতে পারো। তক্‌তকে পরিষ্কার পা দুটো মুড়িয়ে নিয়ে প্রীতিবালা গায়ের শালটা খুলে ভালো করে জড়িয়ে বসে। কি সুন্দর কাজগুলো দেখেছহু নীল সুতোর ফুল, সোনালী কাজ। সুখলতার খরখরে আঙুল ঘিস্ ঘিস্ শব্দ তোলে নীল ফুলে, সোনালী কাজে। ডুবে থাকা বালিরেখাগুলো গা ভাসিয়ে ওঠে। দশ-পঁশিচ-চল্লিশ- বছরের পাথরগুলোর ওপর পা পেলে ছুটে যায় পেছনে। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধার মুখে উকিঝুঁকি মারে পঞ্চবিংশতি যুবতী। যেদিন বাড়িতে আনলো ছোড়দা এই গালিচাটা, মনে করতে পার দিনটা। কাশ্মীরি গালিচা। আগে ছিল না আমাদের বাড়িতে। সুখলতার মুখে এখনও দোল খায় পঞ্চবিংশতি।

কেন? ছিলতো একটা লাল। প্রীতিলতার গলায় অন্যমনস্কতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাবা কিনেছিল। ওটাও কাশ্মীরি ছিল নাকি? মনে নেই। ভুলেই যাই সব আজকাল। এই গালিচাটা বড় পছন্দের ছিল আমার। ছোড়দা আনলো, বাবা টাকা দিলো। নামই হয়ে গেলো বৌদির বড় গালিচা। বাবাকে বলেছিলাম কত করে, কিন্তু বাবা আমাকে দিল না, তোমাকে দিল।

ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণে ভাঁটা পড়ে। ফিরে আসে আবার বর্তমানের বদ্ধ সময়ের আবর্তে। সময়ের ঘুর্ণি পাক খায় একই জায়গায়, একই সুতো ধরে।

কি ছিল আর কি হলো। বয়স যখন ছিল, কত করেছি, ভেবেছিলাম বুড়ো বয়েসে একটু শান্তি পাবো, সুখ পাবো। কপাল, বুঝলে, কপাল। বউ বলে, আমি কুচ্ছিত, সকালে মুখ দেখলে দিন খারাপ যায়। গলা বুজে আসে সুখলতার, কথা থেমে যায়। বুকের ভেতর শুধু দলাপাকানো একরাশ কষ্টবোধ। ছানি কাটার পর থেকে চোখ দিয়ে জল পড়ে অনবরত। অশ্রু ঝরে না। শারিরীক এই কষ্টের জলের সংগে যদি মনের আবেগ মেলানো যেত, হয়তো বুকে জমে থাকা ব্যথাটা লাঘব হত একটু, হয়তো হাল্কা হতো ভারী, কঠিন পাথুরে কষ্টটা। হাহাকার করে মনটা। ছেলেদুটো পর হয়ে গেলো। বুকটা ফেটে যায়। মা যেন ওদের দাসীবাদীরও অধম। ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা— হা ঈশ্বরহু আর কেন? উঠিয়ে নাও এবার। সারাদিন, কারাক্ষণ সুখলতা শুধু মা হওয়ার কষ্টে বিদীর্ন হয়, মাতৃত্ব হারিয়ে বুক খালি করা কষ্টে পাক খায়। বুকের যন্ত্রণা গলে গিয়ে চোখ দিয়ে ঝরে না ঠিকই কিন্তু দমকে দমকে বেড়িয়ে আসে মুখ দিয়ে। তাই সুখলতা বিলাপ করেই চলে। বলেই চলে ছেলেদের নিলিপ্ততা বউদের অকথ্য আচরণ ও ছেলেদের বাড়িতে তার অমানবিক অবস্থার কথা।

আঃ ঠাকুরঝি, চুপ কর। কেন মিছে বকো।

কপালটা সামান্য কুঁচকায় প্রীতিবালা। বৌদি, তুমি কি বুঝবে। রানী হয়ে আছ তুমি। আমার দুঃখ কি করে বুঝবে তুমি— সুখলতার খেদোক্তিতে ছোপ ছোপ ক্ষোভ।

তোমাকে তো বলেছি আমি ঠাকুরঝি, এখানে থাকো নিজের মনে। এতবড় বাড়ি। আমিও তো একাই থাকি। প্রীতিবালার স্বর খাদে। তুমি বললে অনেকদিন গায়ে পায়ে তেল দাওনি। খড়ি উঠছে। কি হল? লাগাও।

সকাল দশটা বাজলেই প্রীতিবালা সরষের তেলের বাটিটা পেছনের বারান্দায় রাখে। বেশ ওম ওম গরম ধরে তেলে। গায়ে লাগাতে আরামদায়ক।

রেকো না, রেখো না এটার ওপর। সুখলতা দুহাত তুলে বাধা দেয়। প্রীতিবালা আস্তে আস্তে বসে আবার। দুজনের মাঝখানে তেলের বাটিটা নামিয়ে রাখে।

গালচিটা নষ্ট হবে তোহু সুখলতা কিছুটা বিস্মিত। কিছু হবে না। প্রীতিবালা আবার গরম শালটা খুলে গায়ে জড়ায়। সুখলতার পা ফেটে চৌচির। জায়গায় জায়গায় রক্ত লেগে আচে। কালো, চামড়া ওঠা। ও এক খাবলা তেল হাতের চেটোতে নিয়ে পায়ে ঘষে।

উঃহু বেদনা বড়।

ঘষো না, শুধু লাগাও, আলগোছে। প্রীতিবালা জোড়া হাঁটু থেকে মুখ তোলে না।

তোমার পা ফাটে না, এই হাড়কাঁপানো শীতে?

ফাটে।

কই? দেখাও দেখি—

প্রীতিবালা নড়ে না, সুখলতা হাত বাড়িয়ে শাড়ীর পাড়টা সরাতে গিয়েও থমকে যায়। হাত তেলে চটচটে। বলে— তোমার পা তো ফাটতে চটচটে। বলে— তোমার পা তো ফাটতে দেখি না কোনো দিনই। শীতের দুপুর হলেও, আস্তে আস্তে আকাশের উত্তাপ বেশ গাঢ় হয়েছে। সামান্য গরম ছাড়ছে যেন। রোদটা মোলায়েম হলেও।

(১০)

তাকিয়ে থাকতে অনেকক্ষণ কেমন যেন কষ্ট হয় চোখে। নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনী রঙের গোল গোল চাকতি ঘোরে চোখের সামনে। ভারী হয়ে আসে চোখের পাতাদুটো, চোখের স্নায়ুগুলো অবশ হতে থাকে, চোখটা খুলে রাখা যায় না। প্রীতিবালা চোখ বুজেই থাকে।

লাল গালিচাটা তোমাকে বাবা দিয়েছিল? নাকি ছোড়দাই পেতেছিল তোমার ঘরে? বৌদি— ও বৌদি— ঘুমালে নাকি?

না— ঘুম না, একটু তন্দ্রামত। তেল লাগান হল তোমার? ঘরে বস, পিঠে লাগিয়ে দিই। প্রীতিবালা হাঁটুদুটো সোজা করে।

কতদিন পর বৌদি, তেল লাগালাম। তেল দেবে ওরা? তবেই হয়েছে। কি উপকার করলে তুমি আমার। নরক যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছিল না। তুমিও শররীটার যত্ন নাও। কতো সুন্দর ছিলে তুমি। রোগা হয়ে গেছ। কণ্ঠার হাড় বেড়িয়ে গেছে। অমন সোনার রঙ, কালি মেরেছে। দাও, তোমাকে একটু তেল লাগিয়ে দিই। এই শীতে আরাম দেবে।

ফ্যাসফ্যাসে গলার স্বরে মিষ্টি স্বাদটা মেশে না। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া, বেখাপ্পা।

রুন্টি, বাবুয়াদের খাওয়াও তুমি? —প্রীতিবালার মুখ আবার হাঁটুতে।

খাওয়াই, শোওয়াই, চান করাই, জামা কাপড় গুছাই। দরকার হলে ওদের কাপড়ও কাচতে হয়। একটা ঝি— ওদের বাসায় আমি একটা ঝি। ওরা আমাকে কি ভেবেছে? আমার কেউ নেই? ওদের দয়ার প্রত্যাশী আমি? ভগবানের ইচ্ছায় তুমি নিয়ে এলে আমায়। ওদের মুখে ঝাঁটা মেরে এলাম। বৌদি— অ বৌদি, আমাকে রাখবে তো তুমি? বৌদি— বল না কেন কিছু? অ— বৌদি— সুখলতার আকুল স্বরে চট্‌কা ভাঙে প্রীতিবালার।

ও, হ্যাঁ, বলো কি বলছিলে— প্রীতিবালা মুখ তোলে।

তোমার কাছেই থাকব তো আমি? সুখলতা জানতে চায়।

তা তো থাকবেই।

রোদটা উষ্ণ। উত্তাপে গা মুড়িয়ে বসে থাকা দুটি বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নীরবে গায়ে মাখে রোদের তাপ, আলোর আভা। সুখলতার বিবর্ণ সাদা থানটা রোদের আলোতে বেশ কমলা রঙ ধরেছে, প্রীতিবালার ধপ্‌ধপে সাদা জমিতে সবুজ নক্সাপাড় শাড়ীটা আলোর চমকানিতে একটা ঝক্‌ঝকে দ্যুতি ছড়ায়। কোনোও রঙ ধরে না, শুধু ঔজ্জ্বল্য।

তোমার ছেলেমেয়েরা কেউ থাকে না এইখানে, তোমাকে সম্মান দেয় ঠিকই কিন্তু তোমাকে কাছে রাখলে পারে জয়ন্ত— সুখলতার হাত আবার তেলের বাটিতে চোবে।

সম্মান। হ্যাঁ, সম্মান— প্রীতিবালা জড়ানো শালটা আরেকটু টানে।

হুঁ, তাই তুমি বোঝ না আমার অশান্তি, আমার জ্বালা। সুখলতার ঝাঁঝালো গলা শালে ঢাকা প্রীতিবালার কানে ঢোকে কিনা বোঝা যায় না। বারোটা গড়িয়ে গেছে, নিঝুম নিঝুম। বাতাসের গতি ধীর, আলস্যমাখা। বারান্দার পাঁচিলের পেছনের বড় গাছটা এখনও ছায়া

ফেলতে শুরু করেনি। স্থিরই আছে ফেলতে শুরু করেনি। স্থিরই আছে পাতাগুলো শুধু হাওয়ার হাল্কা হাতে দোলায় মাঝে মাঝে হলুদ পাতা খসছে, একটা, দুটো, চারটে।মন খারাপ করা স্তব্ধ নীরবতা। প্রীতিবালার সারা শরীরটাই অন্তরালে, শালে ঢাকা, শারিতে ঢাকা, হাঁটুর মাঝখানে স্থির। পাড়ের প্রান্তভাগ আঙুলের ডগা অবধি টানা। সুখলতার ক্ষয়াটে হাত একবার তেলের বাটিতে নামছে, একবার নামছে পায়ের গোড়ালির ফাটাতে কখনও বা নামছে তেলের বাটিতে আবার উঠছে সানতোলা হাঁটুতে। যেখানে ওর অনেক দিনের পোষা বাতের ব্যথা প্রাই চিড়িক্ মারছে। এমন করেই শীতের সকাল হয়, দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। ছেলেবয়সে ছুটোছুটি করে কেটে যেত। শীতের মায়ামমতায় যৌবনে কখনও পুলক লাগতো মনে, কখনও বা মন বিষণ্ণ হতো ঝপ্ করে সন্ধ্যেনামা অন্ধকারে। ভালো ছিল, বেশ ছিল। ভালো লাগায়, দুঃখ লাগায়, রেগে ওঠায়, জ্বালা ধরায়। আজও কষ্ট আছে, অশ্রু নেই। রাগ আছে, ছাইয়ের মতো ঝুরঝুরে, আগুন নেই। নিভে গেছে, সব আবেগ সারশূন্য, রিক্ত হতাশা আর কাঠফাটা ব্যথা বড় ভোগায়। সব কিছু শক্ত শক্ত, রুক্ষ, ইচ্ছে হয় কাঁদতে, কেঁদে কেঁদে বুক হাল্কা করতে কিন্তু কিছুই হয় না। সুখলতার সব দুঃখ যেন ওর মুখে, তাই অন্তরশূন্য। খা খা করা বুক নিয়ে শুধু হাহাকার করে। সুখলতা এতো ভাবে না, ভাবতে পারে না। শুধু ছেলেদের নির্মম ব্যবহারে, বউদের নিষ্ঠুর উক্তিতে সে অতীতের দিকে ফিরে ফিরে চায়। ওদের কাঠিন্যে অপমানিত হয়, খুব ছালওঠা জ্বালা ধরে বুকে। বুকের কষ্টটা প্রশমিত করতেই অতীতের পৃষ্ঠা খুলে বসে। আর তখনই নামে দুচোখের ধারা। ঢল নামে অনুভূতির। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা কাঁদে না। শিশু, কিশোরী, যুবতী সুখলতা ফুঁড়ে ফুঁড়ে কাঁদে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদে। বর্তমানে নয়, অতীতেই জমে আছে যত আবেগ, যত ভালবাসা, যত ক্ষোভ, যত ঈর্ষা। ঈর্ষাও ছিল ওর।

গালিচার রঙটা এখনও ফিকে হয়নি। ছিড়ে গ্যাছে, কোথাও কোথাও সুতো উঠে গেছে কিন্তু রঙটা তাজা। অথচ কতদিন হয়ে গেল। টুপ টাপ, টুপ টাপ, স্মৃতির ওপর আলো পড়ে। অনবরত স্মৃতি এসেই চলেছে, আসছে যাচ্ছে, থাকতে থাকতেই আর একটাও ঢুকে পড়ছে। ঠ্যালাঠ্যালিও লাগে কখনো, মনটা একটু স্থির করে বাছাই করে নিতে হয় একটা।

ছোড়দা কি অত্যাচারই না করেছে এই গারিচাটার ওপর। শুয়ে থাকতো মাটিতে ফেলে, নখ কাটতো নাপিতকে দিয়ে, চুল কাটতো। দুপুরবেলা শুয়ে থাকতো এটা পেতে আর বামাচরণদা পা টিপে দিত। বড়দাদা মরার পর বড় আহ্লাদ দিত ওকে বাবা। মা ও দিত, তবে বাবাই বেশী।

সুখলতার মন স্মতিবিজড়িত,গলা আবছা আবছা। মনে আছে বৌদি, দাদা কাজ করে না দেখে তুমি অবাক হতে। আরে, জমিদার বাড়ির ছেলে, কি কাজ করবে। বাগানে বসে কতদিন দুপুরে চুরি করে আমরা আচার খেয়েছি, গল্প করেছি। তুমি বলতে তোমার কি মজা, তোমার বর কি সুন্দর গ্রামে গ্রামে ডাক্তারী করে। সকালে বার হয়, সন্ধ্যায় ফেরে। সান্তনা দিতে আমায়? তুমি তো জানতে, ডাক্তারী করে ওর কি রোজগার। বউকে শাড়ী দিয়েছে কখনও একটা? দিয়েছে একটা গয়না— অথচ বাবা যে কেন আমায়? সুখলতা সময় খুঁড়তে খুঁড়তে চোট খায়।

(১২)

স্বামী কাজ করে, নিজে উপায় করে এমন পুরুষ ভালো লাগে না তোমার— হ্যাঁ, এসব কথাই তুমি বলতে। দু আধলা রোজগারের কি দাম? বাপের এতো পয়সা থাকতেও আমার সুখ হয়নি। বাবা এক ছটাক্ জমি দিল না পর্যন্ত আমাকে, ছেলে ছেলে করেই গেলো সারাজীবন। তুমি তো বিয়ে হওয়া ইস্তক দেখনি দুঃখ কি? কষ্ট কি? অভাব কি? অথচ আমি ছিলাম জমিদারের মেয়ে?

তুমি মাস্টারের মেয়ে হয়ে যখন আমাকে পুজোর সময় দামী শাড়ীটা তুচ্ছ করে দিতে তখন অপমান হত না আমার? লাথি মেরে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হত না? অথচ তুমি বেশ দুঃখী দুঃখী ভাব করতে। সেই দেখে কর্তা বলত বৌরানীর মনে দুঃখ আছে। তোমার কোনো অভাব নেই, আর তোমার প্রতিই সহানুভূতি। একেই বলে পুরুষ মানুষ। অ বৌদি, শরীর খারাপ নাকি? মাথা নামিয়ে বস কেন? তোমার ছেলে এমন রত্ন। বউ, তোমার বউ। বড় ভালো মেয়ে। শিক্ষিত। তুমি যখন যাও কত সেবা করে, যত্ন করে। আরে, আমি গেলেই কতো যত্ন আত্তি। আর তুমি তো— বোঝে, ও বোঝে, এই বয়সে শরীরর বিশ্রাম চায় আমি মরলাম ঘানি টেনে টেনে। যৌবনে বিশ্রাম পাইনি, এই বয়সে শরীর দেয় না। ছেলের ভাত বাড়ো, অফিসের তাড়া। তার ওপরে নাতি নাতনীর উৎপাত—

উৎপাতহু আহা উৎপাত— হাঁটুর ওপর থুতনী রাখা প্রীতিবালার দুটি ভেসে ওঠা লোভাতুর দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ে না সুখলতার। সে তখনও বলে চলেছে— সুখী মানুষ তুমি। সৌখিন, নির্ঝন্ঝাট। সুখলতার চোখ যখন প্রীতিবালার দিকে ঘোরে তখন প্রীতিবালার দৃষ্টিজোড়া আবার নেমে গেছে হাঁটুর মধ্যে। বোজা, স্থির। প্রীতিবালার গায়ের সাদা দামী শালটার ওপর সবুজ সুতোর কাজ। সুখলতা খুঁটিয়ে দেখে। অম্বলের জ্বালা বুকে গলায়। সুখলতার সুখ নেই, কোনো সুখ নেই। সুখলতার সুক নেই, কোনো সুখ নেই। সুখলতা পয়ষট্টি, প্রীতিবালা চৌষট্টি। সময়সিনী দুজনে। একজন অস্থির, মুখর, অন্যজন স্থির, চুপচাপ। সুখলতা হা হা করে বিলাপ করে, কষ্টের বিবরণ দেয়, কিন্তু মনের শূন্যগর্ভ থেকে একটুকরো অনুভূতি টেনে পায় না বুকভাড়া এক দুঃখের আস্বাদন। কিন্তু প্রীতিবালার নিশ্চল ঠোঁটের নীচে, অকম্পিত গলার প্রান্তভাগে, একবুক দুঃখকে প্রতি মুহূর্তে পালন করে, উলটে পালটে দেখে, নীরবে মুখর বঞ্চনার কথা বলা হয়ে ওঠে না কখনও কাউকে। মন যখন ছিল অপরিণত, গভীর ব্যথার দু একটা কথা হয়তো কখনও বা প্রকাশ করেছিল কিন্তু পরমুহূর্তেই গুটিয়ে ফেলেছে নিজেকে। তার সেই তীব্র সংবেদনশীল জায়গায় বাইরের কর্কশ হাত ঠেকতেই শিউরে উঠত সে। বড় কদর্য লাগতো। নিজস্ব, একান্ত সেই নিজস্ব কষ্টের মহিমা বাইরে টানলেই ধুলিসিক্ত হয়। দুঃখের সেই অধরা রূপকে জগতের মালিণ্যে ক্লেদাক্ত হতে দিতে চায়নি। তাই তাকে মনে হত সুখী-নির্ঝন্ঝাটপ্রিয়। আরো একটা বিশেষণেও সে প্রায়ই অভিষিক্ত হয়েছে— অহঙ্কারী। নিজেকে গুটিয়ে রেখে নিজের মনের রক্তক্ষরণকে বুকের অন্তঃস্থলে চেপে রাখতে রাখতে প্রীতিবালা সরে গেছে সাধারণ সুখদুঃখমাখা জগত থেকে। তাই সে অহঙ্কারী। নিজের সুখের গর্বে গর্বিত। ভেবেছে সবাই তাই। বৃদ্ধা প্রীতিবালা জীবনের

সীমানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, জ্বরণটা চেপে রাখতে গিয়ে ক্ষতটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে. তাও সুখীসুখী ভাবটাকে পরিহার করতে পারিনি আমি। ঠাকুরঝির কর্মব্যস্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। অলস অকর্মণ্য বিলাসী নিজের স্বামীকে দুপুরে আলস্যে গড়াতে দেখে উদ্‌গত কান্নার ডেলাগুলোকে ফেরত পাঠিয়েছি কত সকালে কত দুপুরে, কত সন্ধ্যায়। কাউকে বলতে পারিনি আমি কারণ আমার দুঃখগুলো অন্য স্বাদের। অচেনা এই স্বাদ কেউ গ্রহণ করবে না জানতাম। উগ্‌রে ফেলবে। আর তখন আমার দুঃখের সেই শোচনীর পরিণাম দেখে মনটা ঘোলাজলে পাকসিক্ত হবে। কিন্তু আজ বয়সের তেজ নিভতে বসেছে। পড়া দিনে দুঃখকে নিজের ভেতরে বেঁধে রাখা স্নায়ুপেশীগুলো যে প্রায় অকেজো। প্রীতিবালার শালে মুড়ি দেওয়া শরীরের অভ্যন্তরে ছলকে ছলকে ওঠে ব্যথার আধার। মাতৃত্বের অবমাননায় ঠাকুরঝির যে আক্ষেপ তার সঙ্গে! নিজের মনের ঝুলিটাও উপুড় করে দিয়ে এক হতে চায় প্রীতিবালা। ছেলেদের প্রতিদিনকার কাজে হাত লাগিয়ে, নাতি নাতনীকে নাইয়ে খাইয়ে সুখলতার সুখ নেই। সুখ হয়তো ওর থাকতো যদি সেই কাজের ভারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো মায়ের সম্মান। যে সুখলতা কর্মযোগী স্বামীকে পেয়েছিল পায়নি স্বামীর প্রেমের স্পর্শ। বৃদ্ধা, দুঃখী সেই সুখলতার সঙ্গে! একাত্ম হয়ে যেতে তীব্র এক আকাঙ্খা অনুভূত হয় প্রীতিবালার হৃদয়ের স্তরে স্তরে। প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী টান টান হয় নিজেকে ছড়িয়ে ফেলার তীক্ষ্ণ ইচ্ছার উত্তেজনায়। প্রীতিলতার বুকে দুঃখের পাহাড় জমেছে। আকণ্ঠ উঠে এসে বুকভর্তি এই বেদনা ফেটে বেরতে চাইছে। ঠোঁটদুটিতে উঠে আসতে চাইছে অন্তরের উপচে পড়া অফুরন্ত দুঃখভার। যৌবনে স্বামীর প্রেমময় আহ্বান আমার মনের শৈত্যে জমে গেছে। ছেলেমেয়েদের উচ্ছাসও বেড়া ডিঙতে পারেনি, পারেনি আমার হৃদয় ছুঁতে। কর্মহীনতার কলঙ্ক হয়তো আমার স্বামী মেটাতে পারত যদি সে জানতো আমার দুঃখের উৎস। আমার শীতলতার তলে দুঃখের আগ্নেয়গিরির সন্ধান পেলে সেও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠতো দাউ দাউ করে। দাম্পত্য জীবনটা আমার হতে পারত প্রেমময়, উষ্ণ। আমার মনের বেথরে তপ্ত আবেগ রাশি রাশি ছিল। কাছাকাছি দুটি হৃদয় যখন ভালোবাসার উত্তাপ ছাড়ে, মনের আবেগে গলে যায়, তখন দুটি মিলে যায়, একাকার হয়। প্রীতিবালার বর্ম ভেঙে, মনের খোলস টেনে ফেলে পারেনি ওর স্বামী তার মনের সঙ্গে! একাত্ম হতে। তাই স্বামী সরে গেলো। একাকী প্রীতিবালার রইল একাকীত্ব সম্বল। ছেলেমেয়েরাও আমার কঠিন আবরণকেই আমি বলে চিনেছে। নাতি নাতনীরা দূরের বাসিন্দা। মেয়েজামাইয়ের সঙ্গে বউমার সঙ্গে ছেলেরে সঙ্গে রচিত হয়েছে ঠাণ্ডা ব্যবধান।

আজ যখন গুটিকয়েক বছর হাতে নিয়ে বসে আছে প্রীতিবালা, অন্তর্মুখী মনটা টগ্‌বগ করে ফুটতে ফুটতে বেড়িয়ে আসার জন্য তোলপাড় করে। মনে হয় নাতির ওই ছোট নরম শরীরটাকে বুকে প্রাণপ্রণে জড়িয়ে স্বর্গসুখ পায়। নাতনীর মুখে সবে ফোটা কচি, বোলগুলো দুকান ভরে শোনে।

শ্রান্ত ছেলের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে সাধ হয় ওর। বউমার রান্নাঘরে ঢুকে আবদার করে বলতে চায়— সরো, আজ আমি রাঁধবো। মেয়ের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে বলে— থাকতে এসেছি সাতদিন। তুইও ছুটি নে অফিস থেকে। বিশ্রাম কর। জামাইয়ের তদারকি আমার।

বলে, বলে, মনে মনে সব বলে প্রীতিবালা। কিন্তু ছেলের বাড়ি গিয়ে ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে শরীর ভালো তো? নাতি নাতনীর হাতে কিছু উপহার তুলে দিয়ে গাল টিপে দেয় ওদের। শিশু ওরা। কিন্তু ওরাও শুধু গালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পায়, হৃদয়ের উত্তাপে দ্রবীভূত হয় না।

মেয়ে, প্রীতিবালার মেয়ে, মায়েরই মতো। সহজ হতে জানে না, সহজ করতে পারে না কাউকে। ছেলেবেলায় প্রাণবন্ততার কিছু হদিশ মিলতো কিন্তু এখন আত্মস্থ, গম্ভীর। সে পারেনা কাউকে একটু আলতো হাতের ঠেকা দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হতে দিতে। মা একা, বিচ্ছিন্ন, মেয়ে সাবধানী, স্বতন্ত্র, নির্বাক।

বিয়ের পরপর সমবয়সিনী ননদ সুখলতার সঙ্গে বেশ খানিকটা সৌহার্দের সম্পর্ক ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে প্রীতিবালা অনুভব করেছে দুজনের মধ্যেকার সহসযোজন দূরত্বকে। সুখলতাও বোধহয় তাই। এতবছর সেইজন্যই বোধহয় সুখলতা ছিল সুখলতার জগতে, প্রীতিবালা প্রীতিবালার। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই সুখলতার প্রতি এক আন্তরিক টান অনুভব করছে সে। ছেলেদের কাছে নিগৃহীতা সুখলতা বুকে টেউ তুলেছে প্রীতিবালার। সুখলতার সে! তার সন্তানদের সম্পর্ক বিষিয়ে গেছে, প্রীতিবালার সঙ্গে শুকিয়ে গেছে সবকটি নাড়ীর প্রাণময় সম্পন্দন। মাতৃত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সবমায়ের মধ্যে আনে এক অস্বাভাবিক আকুতি। অহঙ্কার, রুচিবোধ, সংস্কার, স্বভাব, সব কিছু খসে পড়ে, শুধু মাতৃত্ব জেগে থাকে। মা, মা হতে চায়। আহত মাতৃত্বের যন্ত্রণা এক, প্রকৃতি অভিন্ন। হৃদয়ের সাজুয্য প্রীতিবালার ভেতর এক তাগিত সৃষ্টি করে। নিজেকে মেলে ধরতে ছট্‌ফট করে ও। সমব্যথী এক বৃদ্ধাকে, দুঃখে দুঃখে প্রবীন তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টা উন্মুক্ত করে দেখাতে চায় প্রীতিবালা। হিমঘর থেকে দুঃখকে মানবিক সমবেদনার উত্তাপে গলিয়ে বুকটা হাল্কা করতে উন্মুখ প্রীতিবালা শালটা আলগা করে হঠাৎ দৃঢ় হয়ে বসে।

ঠাকুরঝি—

প্রীতিবালা গা ছমছমে কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে তেরছা চোখে চায় সুখলতা। প্রীতিবালা দেখে সুখলতার ভেঙে যাওয়া নোংরা নখের পাশ দিয়ে সরষের তেল গড়িয়ে পড়ছে। চোখে পিচুটি। দাঁতহীন মুখ মাড়ির শূলানিতে নড়ছে। মুখ নাড়ানিতে মুখের বলিরেখাগুলো সচল। প্রীতিবালা তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে, ও আবার বোঝে সুখলতার ওই চুপসে যাওয়া মুখগহ্বরের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া টোঁঠদুটি সমবেদনায় শুধু বলতে পারবে— দুঃখ তুমি কি বুঝবে বৌদি, চিরদিনের সুখী মানুষ তুমি, সৌখিন, নির্ঝন্‌ঝাট।

কেঁপে ওঠে প্রীতিবালা। বেড়ে ওঠা সূর্যের তাপ, ঠাণ্ডা বাতাসের ছাপটা ও সামনে বসা এক বৃদ্ধার প্রবল অস্তিত্ব থেকে নিজেকে বিলুপ্ত করতেই শালটা আবার ভালো করে জড়িয়ে ঝুপ করে ডুব মারে ও নৈঃশব্দ্যের অতলে।

অন্তরায়

পার্থ অফিস থেকে বাড়ি ফেরা সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা ওকে দেয়নি মনোরমা। চা জলখাবার খেয়েও একটু সুস্থির হয়ে বসতেই চিঠিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

শিবেনবাবু আগে বলে রেখেছিল মনোরমাকে।

দেখ, পার্থ বাড়ি এলেই সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা দিও না ওকে, একটু জিরিয়ে নিতে দিও বেচারাকে কথাটা বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলেন।

হ্যাঁগো, আমি দেবো' মনোরমা ঢোক গিলেছিল একটা।

তুমি মা, তুমি দেবে না তো কে দেবে? শিবেনবাবু অবাক।

তা তো বটেই। মনোরমা চুপ করে যায়।

মা-হ্যাঁ মা তো আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু কি মা বলেই এতো এতো ভার বইতে হচ্ছে আমায়?

চিঠিটা দেখেই ভুরুটা কুঁচকে উঠলো পার্থর।

কার চিঠি?

শিবেনবাবু জবাব দেয় না। মনোরমা কি বলবে বুঝতে না পেরে তাকায় শিবেনবাবুর দিকে।

কার চিঠি। পার্থ আবার জিজ্ঞাসা করে। পার্থ কি তবে ভয় পাচ্ছে চিঠিটা খুলতে?

তোর। মনোরমা সসংকোচে বলে।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কে লিখেছে? পার্থ বাবার দিকে চোখ ঘোরায়।

রেজিষ্ট্রী চিঠি তো। শিবেনবাবু বলে।

তো? পার্থ ভুরু তোলে।

প্রেরকের নাম তো লেখাই আছে।

শিবেনবাবু নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ, উকিলের। শিবেনবাবু জোরে টান মারে সিগারেটে। পার্থর মুখের বদলটাকে ও ধোঁয়ার আড়াল থেকে দেখে।

আমরা পড়িনি—মনোরমা বলে ওঠে।

কেন? পার্থর মুখজুড়ে রাগ ও বিরক্তি।

তোর চিঠি, তাই—মনোরমা সাফাই গাইছে?

না পড়লেও তো জানতে চিঠিটা কার। তবে উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?

মনোরমা নিরুত্তর।

দ্যাখো মা, যাই মানাক তোমায়, ওই ন্যাকামীটা মানায় না।

কুঁকড়ে ওঠে মনোরমা। ওর দশাসই বিরাট চেহারা, ওর চওড়া মুখ জোড়া ভুরু, পুরুষ্ট, ঠোঁট—কোথায় টুক করে লুকিয়ে পড়ে ছোট্ট একটুখানি অপমানের কালিমা।

আদ্যোপান্ত চিঠিটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে পার্থ।

একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরায় শিবেনবাবু। ধোঁয়ার আস্তরণ ঘিরে রেখেছে ওকে সম্পূর্ণ। ইদানিং খুব সিগারেট খাওয়া বাড়িয়ে ফেলেছেন শিবেনবাবু। মনোরমা দু একবার বারণ করেছে কিন্তু কর্ণপাত করেনি ও।

থামো তো—ওকে চুপ করিয়ে দিয়েছে শিবেনবাবু।

শরীরটা তো খারাপ হচ্ছে—মনোরমা তাও বলেছিল। এত ভার বয়েও যদি শরীরটা ক্ষয়ে না থাকে তবে দু চারটে টানে কোনও ক্ষতি হবে না।

আর কি বলবে মনোরমা? আর কি বা বলা যায়?

চিঠিটা শেষ করে পার্থ কিছু বলে না। দুটি উদগ্রীব হৃদয় সাগ্রহে শুধু অপেক্ষা করে। আস্তে আস্তে পার্থ ওঠে, নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

কি লিখেছে? অবশেষে শিবেনবাবু উৎকণ্ঠা আর চাপতে পারে না।

আমি জানতাম, আমি খুব ভালো করে জানতাম। দাঁতে দাঁত পিষে পার্থ রাগ চাপে।

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় মনোরমার।

তবে কি? তবে কি?

কি লিখেছে? শিবেনবাবু জানতে চায়।

হঠাৎ নাটকীয় চালে পার্থ ঘুরে দাঁড়ায় মনোরমার মুখোমুখি।

মা, তুমি কি আমাদের রেহাই দেবে না কোনদিনই?

ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে মনোরমার দুটি কান।

আমি? আমি কি করলাম? বিড় বিড় করে বলে মনোরমা।

কি করলে? ডিভোর্স চেয়েছে মণিদীপা। সবচেয়ে বড় এলিগেশন্ কি জানো? শারিরীক অত্যাচার। ফিজিকাল ক্রুয়েলটি। তোমার অত্যাচার। তোমার-তোমার-পার্থ নিজেকে সামলাতে না পেরে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

এই ভয়টাই কয়েকদিন ধরে চেপে বসেছিল মনোরমার মনে। কেন জানে না ওর খালি মনে হচ্ছিল পার্থর বউ আমার ভয়ে চলে যায়নি তো?

মনোরমা গত ছ মাসের প্রতিদিনকার ছবি উলটে পালটে দেখে। বিয়ের তিন দিনের মাথায়ই খাবার টেবিলে বসে পার্থ হাসতে হাসতে বলেছিল— তোমাকে ভীষণ ভয় পাচ্ছে দীপা।

মনোরমা মাথা নীচু করে খাবার বাড়ছিল। ও মাথা না তুলেই বলেছিল আস্তে ও। মনোরমা চায়নি আলোচনাটা গড়াক।

শিবেনবাবু পার্থর দিকে না তাকিয়েই বলেছিল—চেহারাটা তো ওরা আগেই দেখেছিল পার্থ, নতুন করে আবার ভয় পাওয়ার কি হল? মনোরমা লক্ষ্য করেছে ওর স্বামী আজকাল মাঝে মাঝে সুর পাল্টায়। বিষণ্ণতা মাঝে মাঝে ছেয়ে ফেলে ওর স্বর। ও মৃদু স্বরে প্রায়ই বলে চেহারা দিয়ে মানুষটাকে বিচার করিস না।

শিবেনবাবুর কথা শুনে চোখে জল এসে যেতে চায়। কিন্তু আজ প্রায় পয়ত্রিশ বছর চোখের জল চেপে রেখেছে মনোরমা। জল কখনও আর বাইরে গড়িয়ে পড়ে না। শুধু বুকে ব্যথা করে প্রচণ্ড। তাই শিবেনবাবুও বিয়ের পরপর কম খোঁটা দেয়নি মনোরমাকে, কম অবিশ্বাস করেনি। শাশুড়ীর সং! ঝি-এর ঝগড়া লেগে গেল একদিন। ঝির হাত ধরে ওকে শান্ত করার বহু চেষ্টা করে তরুণী মনোরমা। কিন্তু ঝগড়া থামানো যায় না। চীৎকার চেঁচামেচি শুনে সবাই হাজির হলো। ঝিকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করা হল তখনই। টাকাটা হাতে নিয়ে গুণতে গুণতে হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো ঝিটা। কাঁদতে কাঁদতে বললো—বৌদি এত জোরে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো যে আমি মরি আর কি। আমার এই রোগা শরীরে ওই বাঘের থাবা—

মানোরমা অবাক। আমি? আমি ঝাঁকুনি দিলাম? কখন? কেন? শাশুড়ীও সুযোগটা ছাড়লো না। বলল— বৌমা, কেন বাছা, তোমার ওই শরীরে খামচে ধরলে ঝি মাগীকে।

অষ্টাদশী মনোরমার অসহায় মুখচ্ছবি দেখে কারুর সহানুভূতি জাগেনি কারণ সত্যি কথা বলতে কি অষ্টাদশীর করুণ মুখ আর কে দেখেছে? সবাই দেখেছে কঠিন পুরুষালী শক্ত একখানা মুখ। পেশীবহুল চেহারা, চওড়া কব্জি, চওড়া কাঁধ। বিশাল কাঠামো। শিবেনবাবুও রাত্রে মনোরমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে প্রশ্ন করেছিল—

তুমি ঠিক মেয়েছিল তো?

তিন মাসের অন্তঃসত্বা তাকিয়েছিল। শিবেনবাবু দিকে। দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল ওর।

শিবেনবাবু রুখে উঠেছিল—কান্নাকাটি কোরো না, কোরো না। ওই রকম একটা কাঠখোট্টা চেহারায় আর যাই মানাক কান্নাকাটি মানায় না। মনোরমা ছোটবেলায় মার মুখে শুনেছে—দ্যাখ্ মনো, তোর ওই মদ্দা চেহারায় আর যাই মানাক বোনদের গায়ে হাত তোলা মানায় না। মনোরমা সারাজীবন ওকে কি কি মানায় না তার হিসেব রেখে চলেছে। ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরপরই ছেলের বউ ভয় পেলে, মনোরমা জানতো, মনোরমার এই দানবাকৃতি চেহারায় আর যাই মানাক অপমানিত হওয়া মানায় না। মনোরমা নিঃশব্দে তাই না মানাবার হিসেবের খাতায় আর একটিপংক্তি যুক্ত করেছিল।

উকিলের চিঠি পাওয়ার পর থেকে পার্থর মেজাজ সেই যে বিগড়ালো, আর তা টিক হল না। বরঞ্চ বলা যায় উত্তরোত্তর মেজাজ ওর আরও চড়তে শুরু করলো মনোরমার সঙ্গে তো কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছে পার্থ। শিবেনবাবু কথা বললে হু হা করে উত্তর দিচ্ছে। সত্যিই অবশ্য পার্থর কিছু করার নেই। মনোরমা ভাবে ও আমার ওপর রাগ করতেই পারে। স্বামীর সং! বনিবনা হয় না বা স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহার, এইসব দোষারোপ দুচার ছত্র থাকলেও শাশুড়ী অত্যাচারের ওপর জোর দিয়েছে মণিদীপা বেশি। মনোরমার এই পর্বতাকৃতি শরীরটা বিচ্ছেদের একটা ভলো গ্রাউন্ড কোর্টে মনোরমা যেই উঠে দাঁড়াবে তখন কে না বিশ্বাস করবে এই দজ্জাল মেয়েমানুষটি একটি অত্যাচারী শাশুড়ী?

এর মধ্যে পার্থ মা বাবাকে না জানিয়েই যোগাযোগ করেছিল শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে। জ্যাঠতুতো ভাই শৌভিককে পাঠিয়েছিল ও মণিদীপার সং! দেখা করতে। সাদাসিধে ছেলেটি লেখাপড়া বিশেষ করে করেনি। বেশ সরল, হয়তো কিছুটা বোকাও। জমাটে স্বভাব শৌভিকের, তাই একমাত্র ওর সঙ্গেই আলাপ জমে উঠেছিল কিছুটা মণিদীপার। তাই সাহস করে পার্থ ওকে পাঠিয়েছিল মণিদীপার কাছে। একদিন দুপুরবেলা, পার্থ তখন অফিসে, শৌভিক এসে হাজির। শৌভিক মণিদীপার সঙ্গে দেখা করেছে শুনে, মনোরমাই আগ্রহান্বিত হল বেশি। পার্থ বাড়িতে নেই, এই অবকাশে শৌভিককে কিছু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

হ্যাঁরে শুভ, কি বললো বৌমা? মনোরমা ওকে কাছে নিয়ে বসে।

কি আর বলবে, বলল যাব না। ও বাড়িটা ফালতু।

ব্যাস, শুধু এই জন্য আসবে না? মনোরমা আরোও জানতে চায়।

আসলে কাকী ওর একটা গোপন ব্যাপার আছে।

গোপন ব্যাপার। মনোরমা আশ্চর্য হয়।

হ্যাঁগো। আরে তাই জন্যই তো ছেড়েছে ও পার্থদাকে। কিন্তু পার্থদাটা শালা এক নম্বরের বৌ পাগলা। শৌভিক খাটের ওপর পা মুড়ে বসে।

তুই জানিস মনোরমা চাপা স্বরে বলে।

হ্যাঁ, তা আর জানি না। এখানে যখন ছিল তখন তো প্রায়ই বলতো থাকবো না আমি, চলে যাবো। বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার পার্থদাকে ভালবাসি না। আমি আসলে—হঠাৎ চুপ করে যায় শৌভিক। জিভ কেটে বলে— এই যা, পার্থদা তোমাকে বলতে মানা করেছে, আমি বলে দিলাম।

বল না বাবা, বল। আমি তোর পার্থদাকে জানতেও দেব না।

মনোরমা আরও সরে আসে শৌভিকের কাছে।

বৌদি আসলে লভ করে অন্য আর একজনকে—কথাটা বলে ফেলেই শৌভিক মনোরমাকে সাবধান করে— কিন্তু কাকী দাদা যেন না জানে।

না রে না, দাদা জানবে না। বুকের ওপর থেকে যেন এক বিরাট পাথর সরে যায় মনোরমার। একটু চুপ করে থেকে ও ফিস ফিস করে বলে—তবে আমার সম্বন্ধে কিছু বলে নি?

শৌভিক হেসে ফেলে—বলেনি আবার? বাপ মা, দাদা, ছোটবোনটা একবাক্যে বললো—শাশুড়ী, আরে ব্বাস, কি খান্তারণী, বাপরে বাপ—

মনোরমা, আর কোনও প্রশ্ন করে না।

শৌভিক চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে খাটে—মাইরী কাকী, হিন্দী ফিলমের মনোরমাও কুঁই কুঁই করবে তোমার সামনে। শালা কি বডি তোমার। এক্কেবারে ইউকো জুনা।

আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে এসেছে পার্থ।

শৌভিককে দেখে একটু চমকে উঠল—কি রে, তুই আগেই এসে গেছিস?

হ্যাঁ দাদা—শৌভিক বলে।

চল আমার ঘরে—শৌভিককে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল পার্থ। রাত প্রায় আটটা নাগাদ শৌভিক আর পার্থ বেরল ঘর থেকে। কাউকে কিছু না বলেই ওরা বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে শৌভিক শুধু হাতটা তুলল কাকা কাকীমার উদ্দেশ্যে।

উকিলের চিঠিতে শুধু শাশুড়ীর শারিরীক অত্যাচারের কথা উল্লেখ ছিল, ডির্ভোস সুট ফাইল করলে দেখা গেল প্লেইনটে মানসিক অত্যাচারের কথারও উল্লেখ আছে। শাশুড়ী ওর ওই পাহাড়তুল্য পুরুষাবলী গড়ন নিয়ে কমবয়েসী একটু নরম মেয়ের ওপর মানসিক চাপও কম ফেলেনি। মণিদীপার স্নায়ু দৌর্বল্যের একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছে ওরা। ওদের অভিযোগ মায়ের এই ষণ্ডামার্কা চেহারাটাকে কাজে লাগিয়েছে পার্থ। বউ যে ভয় পাচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ছে, এসব দেখেও পার্থ মুখ বুজে ছিল।

ওর এই নীরবতা মণিদীপার জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ডিভোর্স কেস্‌টা ফাইল হওয়ার পর থেকে পার্থ মা-বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলা একদম ছেড়ে দিয়েছে। মনোরমাও আর জিজ্ঞাসা করে না কোনও কথা। কেস্ চলছে, বড় উকিল ঠিক করা হয়েছে, এই টুকুই খালি শুনেছে ও। শিবেনবাবুই মাঝে মাঝে শৌভিককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছে। অবশ্য পার্থ থাকলে শৌভিকও বিশেষ কথাবার্তা বলে না কাকা কাকীমার সঙ্গে। মনোরমা একথাটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছে যে পার্থ মাকে একদম বিশ্বাস করতে পারছে না। মায়ের দিকে ও তাকায় না পর্যন্ত। প্রচণ্ড একটা ঘেন্না ওকে চেপে ধরেছে। অথচ ও তো জানে ও মণিদীপা অন্য ছেলের ওপর আকৃষ্ট এবং সেটাই ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার প্রধান কারণ। পার্থ হয়তো ভাবছে মা মণিদীপার একটা ভালো হাতিয়ার হয়ে মণিদীপার জীবন থেকে ছেঁটে ফেলছে পার্থকে। পরোক্ষভাবে ছেলে জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। মনোরমা তো জানে পার্থ কত ভালবাসে মণিদীপাকে। মানসিক যন্ত্রণায় পার্থ যে ছটফট করছে, মনোরমা বোঝে। ওর ভীষণ ইচ্ছে হয় ছেলের মাথায় হাত বোলাতে ওর বলতে ইচ্ছে করে বাবা, মন খারাপ করিস না, আমি তো আছি।

ইচ্ছে হয়, কিন্তু বলা হয় না কারণ মনোরমা আছে শুনলেই জ্বলে উঠবে পার্থ। তোমার ওই রাক্ষসীমার্কা অস্তিত্বটাই তো নষ্ট করে দিচ্ছে আমার জীবন।

শিবেনবাবু বলছিল একদিন—বৌমাকে বড় ভালবাসে পার্থ। মনোরমা সায় দেয়—হ্যাঁ, কিন্তু বৌমা তো অন্য আর একজনকে—

শিবেনবাবু সোফার ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে বলে—হ্যাঁ সেটা ঠিকই, তবে—

শিবেনবাবু মুখের কথা টেনে নিয়ে মনোরমা বলেছিল তবে? তবে তো বৌমা কোনরকমেই থাকবে না। শিবেনবাবু চুপ করে যায়।

কোর্টের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে গেল। এবার শুরু হবে সাক্ষ্য। এসব খবরও শৌভিকের মুখ থেকেই শোনে মনোরমা আর শিবেনবাবু। খাবার টেবিল ছাড়া দেখাই হয় না পার্থর সঙ্গে আজকাল। পার্থ ওদের দিকে তাকায় না। শিবেনবাবু পার্থর দিকে তাকায় কিনা মনোরমা জানে

না, তবে ও তাকায় পার্থর দিকে, চোরা দৃষ্টিতে চায়। পার্থর বিরুদ্ধে ওর মাকে সবাই কাজে লাগাচ্ছে। মাতৃত্ববর্জিত শক্তপোক্ত ওর মায়ের শরীরটাকে কাজে লাগোচ্ছে ওরা। মনোরমা গুমড়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরেই সোজা মা-বাবার ঘরে এলো পার্থ।

বাবা, আজ তোমরা কি আমার সঙ্গে একটু যেতে পারবে?

কোথায় পার্থ? কেন পারব না? কখন যেতে হবে বল না?

এখনই? বাবা উঠে দাঁড়ায়।

এখন না, এই আটটা নাগাদ।

তোর মাও যাবে? শিবেনবাবু জানতে চান।

যেতে তো হবেই। পার্থ আর দাঁড়ায় না।

সাতটার মধ্যেই ওরা তৈরি হয়ে নিল। ট্যাক্সিতে উঠে শিবেনবাবু জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাচ্ছি রে পার্থ?

উকিলের বাড়ি দিন পনেরো বাদেই মাকে জেরা করবে ওদের উকিল। তাই মিঃ দত্ত ওর চেম্বারে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে।

দুঁদে উকিল মিঃ দত্তও পর্যন্ত প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলেননি মনোরমাকে দেখে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ওর। ও বোঝে ওর এই শারীরিক বিকৃতি দেখেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মিঃ দত্ত। বিকৃতি ছাড়া আর কি? এই বিশাল মোটা শরীর, এই মাসল। পেশীবহুল হাত পা, কঠোর চৌকা মুখ। ঠোঁটের উপর হাল্কা লোমের ছায়া, কঠিন চোয়াল। শক্ত পোক্ত হাড়। মেয়েমানুষের এমন চেহারা হয়?

আচ্ছা, মনোরমা দেবী, আপনি কি জানেন আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ? মিঃ দত্ত শুরু করেন।

হ্যাঁ।

মোটামুটিভাবে বলা যায় আপনার গ্রাউন্ডেই পার্থবাবুর স্ত্রী ডিভোর্স চেয়েছে।

মনোরমা তাকিয়ে থাকে উকিলবাবুর দিকে।

বৃহৎ এক মূক বন্য প্রাণীর মতো ও শুধু তাকিয়েই থাকে।

শুনুন মণিদীপা দেবী। বিশেষ আর কিছুই গ্রাউন্ড আনেনি ডিভোর্সে। কারণ নিজের প্রণয় কাহিনী চাউড় করে তো আর ডিভোর্স চাওয়া যায় না—আর আর মনে হয় বাপ মার কাছ থেকে ও ডিভোর্সের সমর্থন ঠিক আদায় হয় না—তাই মনে হয় সুযোগ নিয়েছে আপনার—মিঃ দত্তর দুটি চোখ আবার জরিপ করে মনোরমাকে, বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করে। এই শরীর কতটা কেসটাকে ঝোলাবে।

কি করা যায় তাহলে মিঃ দত্ত? অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে পার্থ।

দেখুন মিঃ বোস, টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, ওনাকে দেখলে জজসাহেব নির্ঘাত বিশ্বাস করবে আদার সাইডকে। মিঃ দত্তর কণ্ঠে কি হতাশা?

মিঃ দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন— যদি ওদের গ্রাউন্ডাকে কাটাতে পারা যেতে তবে কিন্তু ওরা কিছুতেই ডিক্রী পেত না। কারণ অন্য কোন বিশেষ জোরদার গ্রাউন্ড তো ওরা তৈরি করতে পারেনি। যদি বানচাল করা যেতে এই গ্রাউন্ডটা—

চেয়ারে বসেই অস্থির হয়ে পড়ে পার্থ—সে সব ভেবে আর কি হবে। জীবনটাই আমার অভিশপ্ত।

রাত্রে বাড়ি ফিরে খেল না কেউই। আশ্চর্য, মনোরমাও অনুরোধ করল না কাউকে খাওয়ার জন্য। শুয়ে পড়ল সবাই। বিচ্ছিন্ন তিনটি প্রাণী একা একা কাটিয়ে দিল প্রায় দশটা দিন। প্রতিটি দিনের চেহারা ছিল এক ঠাণ্ডা নিষ্কম্পক। হঠাৎ বাঁক ঘুরলো ওদের জীবনযাত্রার। হঠাৎ থমকে থাকা সংসারটা ধড়ফড় করে উঠে বসলো। সকালবেলা ঝি আবিষ্কার করলো। ভাড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ভেতর থেকে ও প্রথমে মা মা করেই ডেকেছিল। শিবেনবাবু ঝিকেই জিজ্ঞাসা করেন—মা কোথায়? পার্থও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। শেষ পর্যন্ত দরজা ভাঙতে হলো। অচৈতন্য মনোরমা মেঝেতে পড়ে রয়েছে, মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরছে। একটা ছোট্ট কাগজ চাপা দেওয়া ছিল ভাড়ার ঘরে রাখা ছোট একটা টেবিলের ওপর—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হল। গুমের ওষুধ খেয়েছে ও। ডাক্তার পাম্প করে ওয়াশ করল পেট। দুদিন তাও যমে মানুষে টানাটানি চলল। অনেকগুলো স্লিপিং পিল খেয়েছিল মনোরমা। শিবেনবাবু অবাক হয়ে ভাবলো কোথায় পেল ও এতগুলো?

এই কদিন নাওয়া খাওয়া নেই শিবেনবাবুর আর পার্থর। এক নাগাড়ে রাত জাগছে ওরা দুজনেই। চরম উৎকণ্ঠায় ওরা দুজনই বিপর্যস্ত।

দুদিন কেটে যাওয়ার পর আজই প্রথম চোখ মেলল মনোরমা। শিবেনবাবু এসে হাত রাখল মাথায়। পার্থ দাঁড়িয়ে রইল একধারে। ঠিক সাড়ে নটা নাগাদ ডাক্তারবাবু এলেন চেক আপ করতে।

ভালোই তো আছেন এখন—সহাস্য মুখে ডাক্তারবাবু বলেন।

আর কোনও ভয় নেই তো ডাক্তারবাবু? শিবেনবাবু তখনও কাটিয়ে ওঠতে পারেনি বিমূঢ়তা।

কি ম্যাডাম কেমন লাগছে এখন?

মনোরমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ও হাসে ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে।

এতগুলো পিল খাওয়ার পর তো কেউই প্রায় বাঁচেনা তবু, আপনাদের চেষ্টাতেই—পার্থ এগিয়ে আসে।

লেথাল ডোজই প্রায় নিয়েছিলেন উনি, তবে মনে হয় হয়তো ওনার আনইউসিয়াল বডি ওয়েট পয়জন এফেক্ট এবসর্ব করে নিয়েছিল কিছু। আর তাই হয়তো ব্রেইন ড্যামেজটা পুরোপুরি ফ্যাটাল হয়নি।

ওর এই শরীরটার জন্যই কি তবে—দুচোখ বিস্ফারিত পার্থর। ডাক্তারবাবু সামান্য চুপ করে বলেন—বডি ওয়েট আর স্ট্যামিনা হয়তো বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে অবশ্য এভরিথিং ইজ আ ওয়াইল্ড গেস্।

মনোরমা সজোড়ে দুচোখ বন্ধ করে বহির্গামী অশ্রুকে আবার ফেরত পাঠায় ভেতরে।

(২২)

ডানাভাঙা

প্রত্যেকদিন সকালে আসার সময় হাজারবার ঘড়ি দেখে শ্রেয়া। সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছানো চাই-ই। স্যার ঠিক সাড়ে দশটায় ঢোকেন লাইব্রেরীতে। ঢুকেই একগ্লাস জল। দুমিনিটের মধ্যেই কলার ব্যান্ড আর গাউনে সজ্জিত হয়ে সারাদিনের জন্য বেড়িয়ে যান কোর্টরুমের উদ্দেশ্যে। এই সময়টাতে, শ্রেয়া লক্ষ্য করেছে, জুনিয়ররা এসে না পৌঁছালে তার প্রশস্ত কপালেও দু একটা বিরক্তির ঢেউ খেলে যায়। এই সামান্য অভিব্যক্তিটুকুই যথেষ্ট। শ্রেয়া লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। যে করেই হোক সাড়ে দশটার দু একমিনিট আগেই পৌঁছবার চেষ্টা করে সে। হাইকোর্টে ঢুকে লিফটের জন্য আর দাড়ায় না। লাফিয়ে লাফিয়ে বড় বড় ধাপওলা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় যখন ওঠে মনে হয় দম বুঝি বন্ধ হয়ে গেলো, তবুও ছুটে গিয়ে লেডিস টয়লেটে ব্যস্ত আর গাউন পরে নেয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে আয়নায় নিজেকে জরিপ করে নেয় এক মুহূর্তের জন্য। এই সময়টা বড় দামী। আয়নায় নিষ্প্রভ ছায়া দেখলে বাকী সারাদিনটা মন খচখচ করে, তার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে যেদিন, মনটা খুশিতে ডগমগ করে ওঠে।

গুড মর্নিং স্যার, শ্রেয়ার মুখে মিষ্টি হাসি।

গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। চলো কোর্টে

স্যারের পিছনে প্রায় দৌড়েতেই হয়। লিষ্টে তিননম্বর মামলা থাকলেও প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো। কড়িডোরে বেড়িয়ে সিগারেট ধরায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইজীবি রঘুবীর সেন। শ্রেয়াও বেড়িয়ে আসে। এখনও মেনশনিং চলছে। মামলার ডাক হতে দেরী হবে।

তুমিই করে দাও না মামলটা, একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে মিঃ সেন।

আমি? শ্রেয়া লজ্জিত হয়ে ওঠে।

কি আছে আর এতে? সাধারণ ওয়াইডিং আপ পিটিশন তো। আদার সাইডের যা ক্লেইম তুমি তার সেটুকু মানবে যেটুকু এডমিটেড্ ক্লেইম। বাকীটা মানবে না। আর দেখবে যেন সহজ কয়েকটা কিস্তিতে টাকাটা দেওয়া যায়। রঘুবীর শান্ত স্বরে মামলাটা বুঝিয়ে দিতে দিতে ব্রিফের লাল ফিতেটা খোলে।

স্যার, যদি না পারি — শ্রেয়ার কণ্ঠে আগ্রহ ও কুণ্ঠা মেশামেশি।

করো, করো, কিছু হবে না। আমি তো আছিই। আটকালে দেখবো। রঘুবীর সেন মৃদু হাসে।

স্যার, মামলার ডাক হবে এবার, সলিসিটর ফার্মের ক্লার্কটা কোর্টরুমে থেকে ব্যস্ত হয়ে বেড়িয়ে আসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা মটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে রঘুবীর সেন গটগট করে ঢুকে যায় ভেতরে। শ্রেয়ার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

ছোটখাটো মানুষটা কিন্তু কি অসাধারণ ব্যক্তিত্বহু সবার থেকে আলাদা। শ্রেয়া ভেতরে ঢোকে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে ভয়ে। স্যার বলেছেন মামলাটা করতে কিন্তু—। তিন নম্বর মামলার ডাক পড়ে।

ভীড় ঠেলে শ্রেয়া এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে রঘুবীর সেন জোরালো আর্গুমেন্ট শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকের উকিলের প্রতিবাদের দু একটুকরো কথা রঘুবীর সেনের আর্গুমেন্টের তলায় চাপা পড়ে যায়। পিটিশনটা যদিও বিরোধীপক্ষের, তবুও রঘুবীর সেনের উচ্চকন্ঠ শুনে মনে হয় আদালতের কাছে সেই এসেছে ন্যায়ের দাবী জানাতে। মক্কেল অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল কোর্টরুমে। অর্ডার শুনে মক্কেল খুশী, সলিসিটর ফার্মের অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক খুশী। রঘুবীর সেনের পেছনে পেছনে বেড়িয়ে এলো মক্কেল ও অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকটি।

এইটাই চাইছিলাম স্যার — মক্কেল বিগলিত। গুচ্ছের বাজে কথা বলালেন আমাকে দিয়ে আর বলছেন এইটাই চেয়েছিলাম। রঘুবীর সেনের ধমক খেয়ে মক্কেল বোকা বোকা মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে।

স্যার আজ তাহলে আপনার চেম্বারে — মক্কেলের কথা শেষ হওয়ার আগেই এগিয়ে যেতে যেতে মিঃ সেন বললেন, আমার ওখানে কি? অর্ঘবাবুর স! যান ওনার অফিসে। অর্ঘবাবুই আপনাদের অ্যাডভোকেট। উনিই চিঠিপত্র করে দেবেন।

একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল শ্রেয়া। স্যার এগিয়ে যেতেই পা বাড়ায়।

কেমন বুঝলে? বললাম কর মামলাটা। পারবে না করতে?

মোদ্দা কথা হলো টাকা যেটা পাওনা তা দিতেই হবে মক্কেলকে। তবে দিতে পারবে কয়েকটা সহজ কিস্তিতে।

লিফটের সামনে লম্বা লাইন। প্রথমবার ওঠা যাবে না। দ্বিতীয়বার হয়তো ওঠা যাবে। রঘুবীর সেনের পেছনে দাঁড়ায় শ্রেয়া।

কেস্‌টা ডাক হওয়ার স! স!ই তো স্যার আরম্ভ করে দিলেন, কিভাবে সেই পরিস্থিতিতে কেসটা করা যেতো ঠিক বুঝতে পারে না শ্রেয়া। হয়তো বেশী কুন্ঠা প্রকাশ করেছি। হয়তো জোর দিয়ে ইচ্ছেটা জানানো উচিত ছিল। উত্তরটা হাতরাতে থাকে সে। স্যার, মামলাটার ডাক হয়ে গেছিল। অ্যাড্‌জরনমেন্ট কিছুতেই দিলেন না জজসাহেব। কোনোরকমে চালিয়ে গেলাম স্যার। কালকে লিষ্টে থাকবে মামলাটা 'ফর ওর্ডারসে'। রঘুবীর সেনের জুনিয়র সুবিমল লিফটের লাইনের কাছে প্রায় ছুটে এসে এক নিঃস্বাসে বলে।

কালতো বলেছিলাম তোমাকে রেডী থাকতে। একস! দুটো মামলা ডাক হবে জানতাম আমি। ভাগ্য ভালো যে কাল অবধি টানা গেল। রঘুবীর সেনের গলায় চাপা উষ্মা।

স্যার, আপনি বললেন মামলাটা কঠিন। তাই — সুবিমলের মৃদুস্বরে কিছুটা অনুযোগের ছাপ। বাজে কথা বলো না, রঘুবীর সেন রেগে ওঠেন। লিফটে স্যারের স! ওঠে শ্রেয়া। সুবিমল থেকে যায়, দোতলায় আট নম্বর ঘরে মামলার গতি লক্ষ্য করার জন্য। শ্রেয়া ছাড়া রঘুবীর সেনের আরো দু জন চেম্বার জুনিয়র। শ্রেয়া যখন প্রথম ঢোকে তখন একজন মেয়েও

ছিল জুনিয়র। খুব ধান্দাবাজ। লাইন টাইন করে দুটো কোম্পানির প্যানেলে নাম ঢুকিয়ে রঘুবীর সেনের চেম্বার ছেড়ে দিয়েছে। এখন ওর পুরোপুরি ইনডিপেনডেন্ট প্র্যাকটিস। মাঝে মাঝে কথা হয় ওর সঙ্গে শ্রেয়ার। তবে শ্রেয়া ওকে একটু এড়িয়েই চলে। ভীষন তিক্ত কথাবার্তা।

স্যারের ভরসায় থেকো না। নিজে চেষ্টা কর এদিক ওদিক। নিজেই দাঁড়াতে হবে ভাই এ লাইনে। অন্য কেউ সাহায্য করে না। আমি তো ওনার চেম্বারে দেড় বছর থেকেই বুঝে গেছিলাম যে কিছু হবার নয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্যানেলে নাম ঢুকিয়েছি। যতোটুকু আছে ততোটুকু আমার? সিনিয়রের হাজারটা থাকলে আমার কি? সুলেখা রুক্ষ গলায় বলে। সুলেখার বক্তব্য স্যারকে বলেছিল একদিন কথায় কথায়। দু এক মিনিট যেন কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তুমি যতটা মার্জিত ও ভদ্র, সবাই তো ঠিক তেমনটি নয়। ওরা জীবন সম্পর্কে হতাশ। তাই ভীষন শুষ্ক। ছিবড়ে হয়ে যাওয়া চেহারা আর মন নিয়ে শুধু বিষ উদগারণই সম্ভব। তোমার মতো নরম মিষ্টি মেয়ের পক্ষে এ ধরণের কথাবার্তা—

শেষের দিকে রঘুবীর সেনের গলার আবেগ চাপা থাকে না। নরম মেয়ে—কথাটা ঢেউ তোলে মনে। এতকাল নিজেকে একটু শক্তধাতের মেয়ে বলেই জানতো শ্রেয়া। ওর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে স্বভাবের কাঠিন্য বলেই ভাবতো সবাই। ভেতরের নরম জমির ওপর কত আঁচড় পড়েছে কেউ কোনোদিন তার খোঁজ করেনি। আমিই বা কতটুকু বুঝেছি নিজেকে। শ্রেয়ার মন ভিজে ওঠে। অব্যক্ত বেদনায় ও তৃপ্তিতে এতো ব্যস্ত মানুষ। মক্কেল, ব্রিফ, আইনের মোটামোটা বই, কনফারেন্সের পর কনফারেন্স যেন তার দিনের প্রতিটিক্ষণকে কিনে রেখেছে। সেই মানুষটা এতো বোঝেন আমায় কখন উনি সময় খুঁজে পান চরিত্র বিশ্লেষণের। আসলে বিরাট মাপের পুরুষ উনি। তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে অতলস্পর্শ মানবচরিত্রের খুঁটিনাটি ধরে ফেলেন। গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন। হবেই না বা কেন? এতো সাফল্য একজীবনে কজন পারে অর্জন করতে? চোখ বন্ধ করলে আজও চোখের সামনে দেখতে পায় প্রথমদিনের দৃশ্য। স্নায়ুতন্ত্রীতে রিনরিন করে জড়িয়ে পড়ে হৃদয়ের বাজনা। মক্কেলদের অপেক্ষা করার ঘরেই বসেছিল শ্রেয়া। ব্যাগের মধ্যে বাবার বন্ধুর দেওয়া সুপারিশ পত্র ছিল। গ্র্যাজুয়েশনের পরেই 'ল'তে ভর্তি হয়েছিল। কলেজ জীবনে প্রতিবছরই যখন ডিবেটিংয়ের ফাস্ট প্রাইজটা নিয়ে বাড়ী ফিরতো, বাবা প্রত্যেকবারই শ্রেয়াকে উৎসাহ দিয়ে বলতো, উকিলই হ তুই মা। তর্কযুদ্ধে জয়ী হবিই তুই। বাবার উৎসাহেই 'ল' পড়া। পাশ করার পর হাইকোর্টের একজন সিনিয়র খুঁজে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারুর মেয়ে জুনিয়র নিতে আপত্তি, কেউ আবার ইতিমধ্যেই জুনিয়রের সংখ্যাবৃদ্ধিতে গলদঘর্ম। শেষ পর্যন্ত অসিতকাকুই সন্ধান দিলেন রঘুবীর সেনের। হাইকোর্টের নামডাকওলা আইনজীবি। যার কাছেই খোঁজ খবর নিল সকলেই উচ্চ প্রশংসা করলো।

আশাকরি নিয়ে নেবেন তোকে। আমাদের কোম্পানিকে প্রায় ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বাবা ছিলেন নামকরা ল'ইয়ার। ছেলেও যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত।

অসিতকাকু উচ্ছ্বাসে পঞ্চমুখ। ফোনে শ্রেয়ার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করে নিয়েছিলেন তিনি, তবু বাড়তি সাবধানতার জন্য শ্রেয়ার সে! একটা পরিচিতি পত্র দিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার এই বাল্যবন্ধুটি বড় স্নেহ করেন শ্রেয়াকে। সুন্দর করে সাজানো মক্কেলদের বসার ঘরটা। পিতৃপুরুষের হাতে তৈরী বাড়ীটা ছেড়ে যাননি রঘুবীর সেন। পুরনো ছাঁচের বাড়ীটাকে গড়ে পিটে নুতন করে নিয়েছেন। বাড়ীটা ছিমছাম, রুচিপূর্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে যে হলঘরটি দেখা যাচ্ছিল সেটা ভর্তি শুধু বই আর বই। দেয়াল আলমারী চারটে দেয়াল জুড়েই। এতো বই পড়তে হয় নাকি? বিস্ফারিত চোখে শ্রেয়া দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চারিদিক চুপচাপ এতো বড়ো অ্যাডভোকেট কিন্তু মক্কেলের খুব ভীড় ছিলনা। দু একজন বসেছিল। মক্কেলদের ডাকার আগেই ডাক পড়লো শ্রেয়ার। ভারী পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই শ্রেয়া বিস্মিত। জোরালো আলো ঘিরে রেখেছে ঘরটা। বেশ বড় ঘর। লম্বাটে ধরণের। সুসজ্জিত টেবিলটা ঘরের একাংশ আটকে রেখেছে। এয়ারকণ্ডিশনড ঘরের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে।

বসো— গদীআটা চেয়ারে বসা সৌমকান্তি ভদ্রলোকটির গম্ভীর গলা শোনা গেল। সম্মোহিতের মতো চেয়ারটা টেনে বসলো শ্রেয়া। ব্যাগ থেকে চিঠিটা বার করতে গিয়েও বার করলো না।

কাজ করতে চাও? ভদ্রলোকের মাজা গলার স্বর। হ্যাঁ, একটু কেসে গলাটাকে পরিষ্কার করলো শ্রেয়া। দ্যাখো, আমার চেম্বার জুনিয়র দুজন আছে। তোমাকে সুযোগ কতটা দিতে পারবো জানি না। বিশেষ করে প্রায় সবই আমার আবার সলিসিটর ব্রিফ।

রঘুবীর সেন থামলো।

শ্রেয়া উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো রঘুবীরের দিকে। হৃদপিণ্ডটা থমকে দাঁড়ায়।

নিজেকে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। আমি শুধু কিছুটা সাহায্য ক রবো। রঘুবীর সেনের শেষের কথাটাতে উৎসাহিত হয়েছিল শ্রেয়া।

স্যার, আমি কাজ করতে চাই। শ্রেয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

সেতো বটেই। তোমরা ইয়াং জেনারেশন। উদ্দীপনা তো থাকবেই। শুধু কাজ করে যাবে। এখানে গীতার উপদেশ তোমায় অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। কাজেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। এই চিন্তা মনে রেখে এগলে হঠাৎ একদিন দেখবে কখন ফলটি এসে তোমার ঝুলিতে পড়েছে।

রঘুবীর সেন ছেঁটে ছেঁটে শব্দ ব্যবহার করেন। কথাবলার ভঙ্গীটাও দারুন আকর্ষণীয়।

স্যার তবে কবে থেকে শুরু করবো? শ্রেয়া উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

কবে থেকে মানে? সামনের সপ্তাহের সোমবার থেকেই আরম্ভ করো। কাল থেকেই বলতাম, তবে কাল আমি সুপ্রীম কোর্টে যাচ্ছি তো, তাই— আমি ছাড়া অসুবিধা হবে প্রথমে। রঘুবীর সেনের কথাগুলোর মধ্যে জড়িয়ে ছিল অনুভূতির উত্তাপ।

প্রায় যেন ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফিরে এসেছিল শ্রেয়া। প্রথমদিনেই যে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ভাবতে পারেনি সে।

(২৬)

কাজ শুরু করে তো শ্রেয়া 'থ'। অবশ্য কাজ শুরু ঠিক বলা যায় না। কাজ আর কোথায়? কিছুই বোঝে না। কতগুলো ভারী ভারী অচেনা শব্দ শুধু কানে ছিটকে আসে অবিরত। অরিজিনাল সাইড, অ্যাপেলেই সাইড, কোর্ট এ্যাপলিকেশন, রুল ইশু, ইনজাংশন— মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতো না। স্যারের অন্য দুজন জুনিয়র সুবিমল বা কুনালকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ওদের মুখেও ফুটে উঠতো অর্থবহ হাসি। কুনাল সাহায্যও করেছে কিছু কিছু। মামলার লিষ্ট দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে মামলাগুলোকে কিভাবে ভাগ করা হয়, লজিমা বলতে কি বোঝায়, জুরিসডিকশন মানেই বা কি। কোনো কোনো সময়ে কাজের চাপ কম থাকলে স্যার বেশ শিক্ষকের মতো শ্রেয়ার অনেক প্রশ্নের জট খুলে দিয়েছেন। জলের মতো সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা ভদ্রলোকের। উদার উন্মুক্ত পুরুষ। নিজের ব্রিফে অন্য সিনিয়ররা হাতই দিতে দেয় না, অথচ রঘুবীর সেন নিজের হাতে ব্রিফ তুলে দিয়েছেন শ্রেয়াকে।

ভালো করে তৈরী কর কেস্টা। নিজে লড়াই করতে হবে এই কথাটা মনে রেখে বুঝে নাও সব, মিঃ সেন জোর করেন।

কুনাল ও সুবিমল দুজনেই ভীষণ চটজলদি সাফল্যে বিশ্বাসী। শ্রেয়ার দৃষ্টি এড়ায় না ওরা। প্রায়ই মক্কেলদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে আখের গুছিয়ে নিতে চায়। কাজে আত্মভোলা মানুষটিরও সমালোচনা করে ওরা সুযোগ পেলেই। স্যারের ওপর বিতৃষ্ণা ওদের আকণ্ঠ।

লোকটা বদমাইশের হাড়। কোনদিন উঠতে দেবেনা আমাদের। কখনও কোনোও কিছু পুরো শেখাবেনা। ছিপ নিজের হাতে রেখে জলে খেলাবে জুনিয়রদের। পাকা খেলোয়াড়। জুনিয়র ফি বলে নেবে একগাদা টাকা কিন্তু তার সিংহভাগই ওর গহ্বরে যাবে। লজ্জায় কান লাল হয়ে গেছিল শ্রেয়ার। এতো নগ্ন সমালোচনা। রঘুবীর সেনকে শ্রেয়াও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি প্রথমে। মাঝে মাঝে গোড়ার দিকে ভদ্রলোককে ওর বেশ ধূর্ত বলেই মনে হতো। কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করার একবছরের মধ্যেই যখন একটা সার্ভিস ম্যাটারের ব্রিফ ওর হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেয় তখন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে মন। রাত জেগে পড়াশুনা করে তৈরী করে ব্রিফটা। পিটিশনের প্রত্যেকটি অক্ষর যেন মুখস্থ হয়ে যায় ওর। কেস্টাতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আর্গুমেন্ট করে ও। মক্কেল যা চেয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্ডার বার করে আনে। অন্যদিকের উকিলের প্রত্যেকটি যুক্তির উপস্থাপনকে পাল্টা আক্রমণে কেটে ফেলে। রঘুবীর সেন ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য দু একজন সিনিয়র উকিল যারা মামলাটা শুনেছিলেন, রঘুবীর সেনের কাছে শ্রেয়ার প্রশংসা করেন।

অ্যাম রিয়েলী প্রাউড অফ ইউ, রঘুবীর সেন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন শ্রেয়ার দিকে। কেস্ জিতে যতটা নয়, রঘুবীর সেনের অভিনন্দনে অভিভূত হয়েছিল বেশী শ্রেয়া সেদিন।

আরে বিনে পয়সার মামলা, তাই তোমাকে দিয়েছে। ও মালাকে তো চেনো না। মক্কেল পয়সা দেবে না, তাই মক্কেলের ওপর কোনো দায়িত্বও নেই। এমন জেনারাস ভাব করলো যেন কত মহৎ। শালা — সুবিমলের কটূক্তি হিংসার পচা গন্ধ পেলো শ্রেয়া। রঘুবীর সেনের প্রশংসার মাধুর্যও তখনো তার মনে ছড়িয়ে, তাতে যেন নোংরা নালার জল ছেটালো কেউ।

আমাদের দিয়ে কি আর কেউ দায়িত্বপূর্ণ মামলা করাবে এই জুনিয়র স্টেজে? প্রতিবাদ না করে পারেনি শ্রেয়া।

প্র্যাকটিসে ঢোকার প্রথমদিকে চারিধারে সে বেশ দৃষ্টি রেখেছিল। সকলেই বলতো চোখ কান খোলা না রাখলে টিকে থাকা যায় না। আলাপও হয়েছিল কয়েক জনের সঙ্গে। কিছুদিন অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কিছু সুযোগের আশ্বাসও দিয়েছিল কেউ কেউ। চিরদিনের মেধাবী ছাত্রী শ্রেয়া। পিছু হঠা কাকে বলে জানে না। সপ্রতিভ, কথাবার্তায় টানটান। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবো এই ইচ্ছার জোরে বাধাবিপত্তি ডিঙতে পরাঙ্মুখ নয় সে কখনো কিন্তু এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে রধুবীর সেন যখন তাকে মামলাটা করার সুযোগ দিল তখন ছিটিয়ে থাকা মনটাকে গুটিয়ে আনে সে। একাগ্রচিত্ত হয়ে কাজ করবো— শ্রেয়া ভাবে। স্যারের প্রশংসার প্রত্যেকটি কথা যেন ঝাঁঝালো অনুভূতিতে ঠাসা। ভরে ওঠে মন।

এই মামলাটা করার পর পরই পূর্বপরিচয়ের সূত্রধরে একজন অ্যাডভোকেট ওকে ছোট একটা সিভিল রিভিসনের কেস্ দেয়। কেস্টা বোঝার জন্য ভদ্রলোকের চেম্বারে একদিন যেতে হয় ওকে। পরেরদিন লিষ্টে একদম একনম্বর মামলা। ছোট কেস্। আইনের মারপ্যাচ বিশেষ কিছু ছিল না। ওর্ডার আশানুযায়ী। সামান্য অভিজ্ঞতায় শ্রেয়ার সাফল্য অভাবিত। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ শ্রেয়াকে আর একটা মামলা করতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। উত্তেজনায় ফেটে যায় বুকটা। স্যারের সেই গভীর দৃষ্টি। চাপাস্বরে সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ভেতরের ধড়াস ধড়াস শব্দ টের পায় শ্রেয়া। স্যারের খোঁজ করে কোর্টরুমে ঢুকে দেখে বিশাল এক ফাইলের মধ্যে ডুবে রয়েছেন তিনি। বাহ্যজ্ঞানরহিত নিজের কাজে নিমগ্ন ধ্যানরত এক যোগী পুরুষ যেন। উঠে আসা আবেগটাকে গিলে ফেলে শ্রেয়া। পেছনের চেয়ারটা সন্তর্পনে টেনে বসে পড়ে সে। কেমন যেন এক অস্বস্তিবোধ কামড়ে ধরে মনটা। স্যারকে না বলে অন্য কারুর মামলা করতে যাওয়া ঠিক হয়নি বোধহয়। না যদি করতে পারি এই ভয়ে আসলে বলিনি, অস্বস্তিবোধটাকে তাড়াতে চেষ্টা করে শ্রেয়া। সেদিন চেম্বারে গিয়েও নয়, প্রায় তিনদিন চেষ্টার পর অবকাশ মিলল স্যারকে বলার।

খুব ভালো। ওকালতি করতে এসেছে আর মামলা করবো না। দোকান তো সাজিয়ে বসেছি আমরা। ক্রেতা এলে কথা বিক্রি তো অবশ্যই করবে। তবে রঘুবীর সেন থেমে যায় হঠাৎ।

তবে কি স্যার? শ্রেয়া ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিছু না। জায়গাটা তো ভলো না। নানাধরনের লোক। তোমার মতো আকর্ষণীয়া মেয়েদের অযাচিত ভাবে হয়তো কেউ মামলা দিয়ে সাহায্য করতে চাইবে। একজন ছেলে অ্যাডভোকেটকেও তো দিতে পারতো মামলাটা। কিন্তু তা হবার নয়। বুঝে চলতে হবে আর কি, রঘুবীর সেন মোলায়েম গলায় বোঝায়।

রক্তের ঝলক ওঠে মুখে। কতো সম্মানীয় লোক উনি, আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করাই ওনার আদর্শ। নিজেকে আমি খেলোই কবলাম বোধহয়। সত্যিই তো ভদ্রলোক মামলাটা আমকে দিতে গেলো কেন?

আর একটা কথা শ্রেয়া। লাইনটা নোংরা, যার তার সঙ্গে ঝট্ করে কথা বলো না। বেশী অন্তরতার জায়গা নয় এটা। হাই পাওয়ারের চশমার আড়ালে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে মিঃ সেনের।

না না স্যার, শ্রেয়া গুটিয়ে যায় অনুশোচনায়।

অন্য কোনো মেয়ে হলে বলতাম না। বেশীর ভাগই তো ঝানু আর পোড় খাওয়া। তা না হলে সস্তা। তুমি আলদা বলেই আমাকে একটু বেশী ভাবতে হয়।

নিজের শরীরের ভেতর রক্তের দুলতে দুলতে শব্দ অনুভব করে শ্রেয়া।

যখনই সময় পেতো রঘুবীর সেন শ্রেয়ার সঙ্গে আলোচনা করতো তার ভবিষ্যত গঠনের পরিকল্পনার।

কাজ করবে মন দিয়ে। প্রফেশন ইজ আ জেলাস ওয়াইফ। অবহেলা করলে বিগড়ে যাবো। কাজ করে যাও। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমার হাতে তৈরী হয়ে তুমি বড় হবে সেটা আমার কতো গর্বের বিষয়। তিন বছর পর আর তোমার অন্যের সাহায্যের দরকার হবে না। যদিও পাঁচ বছর তো এখানে কোনো সময়ই না। এই প্রফেশনে মোটে তোমার একবছর হয়েছে, এখনো তুমি জন্মাও নি এখানে। সব হবে, শুধু ধৈর্য ধরো।

রঘুবীর সেনের অসাধারণ দূরদর্শিতা আগের থেকেই ভবিষ্যতের মোড়কে ঢাকা ঘটনার চাল বুঝে নেয়। সুবিমল ও কুনাল ওকে একটা ষ্টিমার পার্টিতে যাওয়ার নেমতন্ন করে। জুনিয়র অ্যাডভোকেটদের সম্মেলন। সারাদিনের প্রোগ্রাম। এমন করে চেপে ধরে ওরা যে ও আর না বলতে পারে না। রাজী হয়ে যায়। শুক্রবার ছিল স্যার চেম্বারে বসবেন না জানে, কিন্তু শনিবারই পার্টি, সন্ধ্যেবেলা চেম্বারে গিয়ে হাজির হয় সে। ওপর থেকে স্যার নেমে আসেন। বিশ্রাম করছিলেন বোধহয়, শ্রেয়াকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ। শ্রেয়ার ভালো লাগে। কোনোমতে অপরাধীর মতো পার্টির ব্যাপারটা বলে ফেলে।

নিশ্চয়ই যাবে। ছেলেমানুষ মেয়ে। আসলে আমার ভয় কি জানো? তুমি এতো নরম মেয়ে, কারুর কথায় না হঠাৎ আঘাত পেয়ে বসো। আর ওদের সঙ্গে তোমার মানসিক স্তরের এত তফাৎ — কুনাল, সুবিমলকে তো জানি। ওরা জানে শুধু সস্তায় বাজিমাত। কিছু না জেনে টাকা রোজগার আর অবসর বিনোদনের জন্য মোটা দাগের কথাবার্তা। তুমি কি পারবে?

স্যারের প্রতিটি কথার মধ্যে শ্রেয়ার উৎকর্ষতার স্বীকৃতি। শ্রেয়া বিহবল। মনে মনে ঠিক করে যাবে না সে।

কিন্তু পরেরদিন সকালে বাড়ী চড়াও হয়ে কুনাল এমন জোর করে যে সে আর না বলতে পারে না। কিন্তু একদম ভালো লাগে না। সারাদিনটা যেন মাটি হয়ে যায়। এদের লাগামছাড়া কথাবার্তা, হাল্কা চটুল রসিকতা আর সবচেয়ে বিরক্তিকর অকারণ হাসি। মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। ষ্টিমারে একটা কোন বেছে বসে পড়ে সে। শনিবার সারাদিন চেম্বারে কাটাবার কথা। ব্রিফ পড়া, স্যারের সঙ্গে মামলা নিয়ে আলোচনা, মক্কেলদের সঙ্গে কর্নফারেন্স শোনা। মাঝে মাঝে চা। আর খালি থাকলে মুগ্ধ হয়ে স্যারের কথা শোনা। কতো জানেন উনি! অথচ কতো নিরভিমানী! উনি ঠিকই বুঝতে পারেন আমাকে, এসব হাল্কা আনন্দ আমার জন্য নয়। ষ্টিমার পার্টি থেকে ঘুরে এসে প্রতিজ্ঞা করে শ্রেয়া, আর নয়।

মন ঢেলে কাজ আরম্ভ ও। ব্রিফগুলো ভালো করে পড়ে নোট করে। কেস্ 'ল' গুলো বার করে স্যারের সামনে সাজিয়ে রাখে। লোভীর মতো পড়াশুনা করে সে নিজেও স্যারের সঙ্গে। যদি সুযোগ পাওয়া যায় মামলাটা করে দিতে যেন তার কোনোও অসুবিধা না হয়। স্যারের দিক থেকে তো অবাধ অনুমতি। নিজে করার জন্য বড় বড় মক্কেলের মামলাও ছেড়ে দিতে চান শ্রেয়াকে। শ্রেয়া নিজেকে তৈরী রাখে। কিন্তু কোর্টে মক্কেলরা এমনভাবে কড়া নজর রাখে যে তার পক্ষে মামলা করা প্রায় অসম্ভব। হয়তো স্যার এসে তখনো পৌঁছাননি। দিনে জোঁকের মতো সেঁটে থাকে শ্রেয়ার পেছনে।

স্যার কোন ঘরে আছেন দিদি?

আপনি সময় চেয়ে নিন যদি উনি না এসে পৌঁছতে পারেন। অর্থাৎ শ্রেয়া যেন না করে মামলাটা, ওদের প্রত্যেকটি কথায় নিহিত থাকে সেই সর্তকীকরণ।

জুনিয়র দাঁড়ানো মানেই হলো মামলাটার বারোটা বাজা। একবার তো ডাক হয়ে গেল একটা মামলার। স্যার অন্য ঘরে মামলায় ব্যস্ত। এইরকম আশঙ্কা করেই স্যার আগের দিন চেম্বারে বলেছিলেন, আমি না এলে তুমিই করে দিও।

ডাক হতেই তাই ব্রিফ খুলে প্রস্তুত শ্রেয়া। মুখ খুলতে যাওয়ার আগেই স্যারের ক্লার্ক ছুটতে ছুটতে হাজির, নট টুডে করে নিন, স্যার বলে পাঠিয়েছেন। ব্রিফটা বন্ধ করে নট টুডে করে নিল শ্রেয়া।

হতাশায় ভেঙে পড়েছিল মনটা। কিন্তু চেম্বারে ঢোকার সে! সেই স্যারের ধমকানি শুরু হলো।

কি ব্যাপার! মামলাটা করলে না কেন? সব জেনে বোকার মতো স্থগিত করে দিলে।

স্যার রথীনবাবু যে বললো আপনি নট টুডে করতে বলেছেন।

শ্রেয়া সংশয় প্রকাশ করে।

তোমাদের নিয়ে পারা যায় না। আরে, মামলা করতে করতে অতো দিকে খেয়াল থাকে নাকি? তোমাকে তো চেম্বারেই বলে দিয়েছিলাম কোরো ডাক হলে।

স্যারের কথায় ভারী মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে নিমেষে। উনি ব্যস্ত মানুষ, ভুলটা আমারই। চরম উৎসাহে স্যারকে সাহায্য করার কাজে মেতে ওঠে ও। ধীরে ধীরে চেম্বারের প্রায় সমস্ত কাজই সে নিজে দখল করে নিয়েছে। কুনাল তো আজকাল আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কোর্টের কড়িডোরে জোর গুজব যে ও একজন মাঝারি গোছের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কাজ করছে। সুবিমল আসে, তবে নির্লিপ্ত ভাব।

কোর্টে দাঁড়িয়ে জোরগলায় অন্যপক্ষের উকিলকে কতখানি নাস্তানাবুদ করা সম্ভব, একজন উকিলের ওকালতির সাফল্য সাধারণ লোক সেই মাপকাঠিতেই মাপে। কিন্তু এতো আর একটা একক কাজ নয়, ওকালতির অভিজ্ঞতা ও স্যারের কাজের ধারা অনুসরণ করে শ্রেয়া বুঝতে পেরেছে ওকালতি একটা যৌথ কর্মযজ্ঞ। ড্রাফটিং করা, নোট করা, কেস 'ল' বার করা, খুঁটিনাটি প্রস্তুতি পর্ব লম্বা। পরিণত মাথার প্রয়োজন আর্গুমেন্টের জন্য, প্রয়োজন অভিজ্ঞতার। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে সাজানো মামলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেদিন নিজের

চোখেই সে দেখলো জুনিয়র অ্যাডভোকেটটি কিভাবে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল কেস্‌টাকে। সিনিয়র এসে কেস্‌টাকে বাক্যের জাল ফেলে ফেলে তুলে আনলো ডাঙায়। ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলো মামলাটা।

মামলাট করার সময় মার আসতে পারে নানা দিক থেকে। একটা কথা মনে রেখো, তুমি যেমন অনেক খেটে তৈরী করছে, মামলাটা অন্যপক্ষের উকিলও হারবার জন্য আসেনি কোর্টে, সেও লড়বে আপ্রাণ বিরোধী পক্ষকে দুর্বল ভাববে না কখনো। রঘুবীর সেনের প্রতিটি কথা যেন নেড়ে চেড়ে উপভোগ করে শ্রেয়া। কথার মধ্যে যে এতো গায়ে কাঁটা দেওয়া রোমাঞ্চ ছড়িয়ে আছে কে জানতো? সম্পূর্ণভাবে না জেনে কোনো মামলা করা মোটেও পছন্দ করেন না রঘুবীর সেন। অনেক জুনিয়র উকিল ব্যাপারটা ভালো না জেনেই দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। জেরার ফাঁদে পা দিয়ে তখন দিশাহারা। এধরণের ঘটনা কোর্টে আকছারই ঘটে। স্যার বিরক্ত হন খুব। নিজেদের আত্মসম্মান বোধ নেই এদের। আইনটাতো বুঝতে হবে। ওদের চেষ্টা কতটুকু? বোধবুদ্ধি কতটুকু? অন্যের আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাবে শ্রেয়া কুণ্ঠিত বোধ করে।

ধীরে ধীরে সে নিজেও অনুভব করে মামলা শুধু উঠে দাঁড়িয়ে করলেই হলো না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সাধনা আর সুতীক্ষ্ণ মেধা। স্যারের আর্গুমেন্ট মন দিয়ে শোনে। কথার কি বাঁধুনি! আইন সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান আর সবার ওপর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি। এতো গুন আছে আমার? সন্দেহ জাগে মাঝে মাঝে। চার বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। কতো মামলা করা দেখলো। কোথা থেকে কখন যে কোন সুতোয় টান পড়বে আগে থেকে বুঝে নেওয়া অসম্ভব। ছোটখাটো কোনো কেসে কোনো কথা বলার জন্য আগে তার মধ্যে যে সাহস ছিল এখন যেন কেমন তার অভাব অনুভব করে। নিজের দুর্বলতার কথা স্যারকে বলে ফেলে ও একদিন। তখন তো তুমি জানতে না কিছুই। না বলতে পারলে ফলটা যে কি হবে সেটাও বুঝতে না। এখন চোখ ফুটেছে তোমার। এটা তোমার অবনতির নয়, উন্নতির লক্ষণ। প্রত্যেকটা সংশয়ের পর্দা কেমন সহজে উঠিয়ে দিতে পারেন রঘুবীর সেন, শ্রেয়ার মন শ্রদ্ধায় ঝুঁকে যায়। সব দিক দিয়েই একজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ। সিনিয়র কতো অ্যাডভোকেট সম্পর্কেই তো নানধরণের মশলা দেওয়া গুরপাক গুজব শোনা যায়। কিন্তু স্যারের ইমেজ দাগহীন, পরিষ্কার, সকলেই শ্রদ্ধা করে। রঘুবীর সেন বিবাহিত। একটি ছেলে আছে। দার্জিলিংয়ে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। ভদ্রলোকের স্ত্রীটিকে কিছুতেই যেন ওর পাশে মানায় না। পাকানো চেহারা, অসম্ভব রাগী মুখ। কথাবার্তা এক দম বলেন না, কঠিন মুখ ভাব। কদাচিৎ চেম্বারে ঢোকে। এতদিন মোটে দুবার ওনাকে চেম্বারে ঢুকতে দেখেছে। একবার কিসের যেন একটা চাবি দিতে ঢুকেছিলেন। শ্রেয়ার খুব খারাপ লেগেছিল দেখে যে স্যার হাত বাড়ানো সত্ত্বেও চাবিটা টেবিলে রেখে ভদ্রমহিলা কারুর দিকে না তাকিয়ে বেড়িয়ে গেল। আরেকদিন বোধহয় কোনো জরুরী কথা ছিল স্যারের সঙ্গে। দরজার কাছ থেকে ইশারায় স্যারকে আসতে বলে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন উনি। বড্ডো অহংঙ্কারী বলে মনে হয়। স্ত্রীর সামনে স্যারও অস্বস্তিবোধ করেন। তাই আলাপ হওয়ার সুযোগ ঘটেনি ওনার স্ত্রীর সঙ্গে। বিবাহিত জীবনে মানুষটা অসুখী, শ্রেয়া

বুঝতে পারে। এতো টাকা উপার্জন করেন, এতো সাফল্য এতো যশ, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে মানুষটা কতো অসুখী। সমবেদনায় মনটা টন টন করে ওঠে। মামলা তৈরী করতে সাহায্য করে, হাত বাড়িয়ে সব কাজ নিজে টেনে নিয়ে, শ্রেয়া ভদ্রলোকের চাপ কমাতে চায়। রঘুবীর সেনের সঙ্গে শ্রেয়ার যোগাযোগটা বোধহয় দৈব অনুগৃহীত ছিল। শ্রেয়ার মধ্যে যে খনি আছে, কোনোদিন কারো কাছ থেকে জানেনি ও। নিজের অজান্তেও ছিল অনেক কিছু। দুপুরবেলায় ত্রক ছুটির দিন চেম্বারে ব্যস্ত শ্রেয়া। বার বার চোখের সামনে চুলটা এসে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। হাত দিয়ে চুলটা সরিয়ে নিয়ে ক্লিপের মধ্যে যেই গুঁজে দিতে যাবে চমকে ওঠে স্যারের গলার আওয়াজে। সরিও না চুলটা। সামনের চুলটা তোমার চোখের ওপর এসে পড়লে কেমন যেন স্বর্গীয় লাগে তোমায়? আশেপাশের বাতাসেও যেন ছড়িয়ে যায় সুরভি। চমকে ওঠে শ্রেয়া। এভাবে কে তাকে বলেছে কবে? মোটামুটি সুশ্রী একথা কৈশোরের প্রারম্ভেই জেনেছে। দু একজন স্তুতিও যে করেনি তা নয়। কিন্তু সে সব তো চাটুকারের ভাষা। তার অলৌকিক রূপের কথা তো সেও জানতো না। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আর ব্রিফে মন বসাতে পারে না শ্রেয়া। স্যার অবশ্য বিফ্রের মধ্যে ডুবে যাকে আগাগোড়া। কথা ফুরিয়ে যায় হঠাৎ। কলম বন্ধ করে নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই বেরিয়ে আসে শ্রেয়া নিঃশব্দে। ও উঠে দাঁড়ায়। চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসে রঘুবীর। শ্রেয়ার মনে হয় মনের তলায় এক গভীর বেদনাকে চাপতে চাইছেন উনি। স্যারের সম্মোহক দৃষ্টির সামনে চোখ নত হয়ে আসে। আবিষ্টের মতো দরজার দিকে পা বাড়ায়।

দিনগুলো ডানা মেলে চলে। প্রানচাঞ্চল্যে ভরপুর শ্রেয়া কেমন যেন শান্ত হয়ে গেছে হঠাৎ। আত্মস্থ, সমাহিত। কি খবর শ্রেয়া? শরীর খারাপ নাকি? রঘুবীর সেনের চোখ এড়ায় না শ্রেয়ার এই পরিবর্তন।

না স্যার, কিছু হয়নি তো, শ্রেয়ার অস্ফুট স্বর।

না না, শরীরের যত্ন নিও। খাটুনি তো খুব, রঘুবীর সেন উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

খাটুনি বেশী হলে শরীরে চাপ পড়বে। কিন্তু শ্রেয়ার মনে হয় কিছুদিন ধরে কাজ সে করছে ঠিকই কিন্তু মনপ্রাণ শরীর ঢেলে কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বন্ধ আর সে রাখতে পারছে না। কয়েকদিন ধরেই মনটা খালি ছুটে বেড়ায়। ভাবতে ভালো লাগে খুব। অথচ অকারণে ভাবনা চিন্তা করার অভ্যাস তার কোনোদিনই ছিল না। পড়াশুনা করতো ঠিকঠাক্ কিন্তু পরীক্ষার ফল নিয়ে তার সতীর্থরা যেমন আকাশপাতাল ভাবতো তেমন মাথাব্যথা তার কখনো হতো না। যে কাজটা করতে হবে সেটা ফাঁকি না দিয়ে করতো বরাবর। এটাই ছিল শ্রেয়ার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। খোলামেলা চরিত্রের মেয়ে ছিল ও। ইউনিভার্সিটিতে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে ছিল অবাধ মেলামেশা। ওরা প্রায়ই বলতো, তোর সঙ্গে খুব সহজে মেশা যায়। কোনোও মেয়েলীপণা নেই তোর।

প্র্যাকটিসে ঢোকার পর ভালো করে কাজটা শেখাবে দিকেই একমাত্র ঝোঁক ছিল ওর। কিন্তু আজকাল তার নিজের ভেতরটাই কেমন যেন পালটে গেছে। সহজ সুরটা আর বাজে

না মনে। সব কিছুতেই বাধো বাধো লাগে। ওর পুরো অস্তিত্বটারই শিকড় ছেঁড়া আলগাভাব। কেউ অন্যায়ভাবে কিছু বললেও প্রতিবাদ করতে পারেনা। অথচ বেশ কিছুক্ষদিন আগে এক অ্যাডভোকেটের ওপর ক্ষেপে গিয়ে সে তো চরম অপমানই করে দিয়েছিল।

মেয়েরা এখানে সাজ দেখাতে আসে। কি আর করবে বেচারারা, মাথায় ঘিলু বলতে তো কিছু নেই, ভদ্রলোকটির বোধহয় রসিকতা করার ইচ্ছা ছিল।

আর ছেলেরা বুঝি আসে এখানে নারীতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে? পাত্তা বুঝি একেবারেই পাননি, কারন হতাশের দলই এই ধরণের কথা বলে, শ্রেয়ার মুখ রাগে ঝলসে উঠেছিল। অপমানে বেঁকে গিয়েছিল লোকটার মুখ।

তখনও শ্রেয়া রাগলে ভারসাম্য রাখতে পরতো না। জ্বলে উঠতো। এই আগুনধরানো রাগ নিভে গেল কবে? শ্রেয়া ভাবতে চেষ্টা করে।

এখন আর কোনো নোংরামিতে যেতে ইচ্ছা করে না। নিজেকে যেন খুঁজে পেয়েছে ও। নিজের কথা বলার যে সুন্দর ষ্টাইলটা সে রপ্ত করেছে, সে বুঝতে পারে সেটাই এনে দিয়েছে বিশিষ্টতা। এই নূতন আমি, আমার ভেতরেই ছিল, কিন্তু আমি জানিনি। রোগাটে শরীরের আড়ালে ছিল আমার তন্বী দেহ, অথচ আমি আগে দেখিনি, আগে জানিনি, ভাবনার পর ভাবনা আন্দোলিত করে ওর মন।

মিনি বাসে যখন বাড়ী ফেরে শ্রেয়া, সামনে টাঙানো একটা আয়নায় নিজের মুখটা ভেসে ওঠে। নিজের চেহারাটা ভীষন টানে ওকে। সৌন্দর্য, লাবণ্য এসব ঘষটে যাওয়া বিশেষণ না, ইকনমিক্সের ছাত্রী শ্রেয়া উপযুক্ত একটা শব্দ খোঁজে।

রোজই কিন্তু তোমার দেরী হচ্ছে শ্রেয়া আজকাল চেম্বারে আসতে। স্যারের কথার মধ্যে কি অনুযোগ আছে? শ্রেয়া ঠিক বুঝতে পারে না।

আসলে শ্রেয়া নিজের মধ্যে কোনোও খুঁত রাখতে চায় না। নিখুঁত করে সাজে ও। সাজের বাড়াবাড়িও চলবে না আবার সাদামাটাও যেন না লাগে। এমনভাবে ফোটাতে হবে নিজেকে যেন তার শরীর মন ও মেধার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে তার চেহারায়। মশগুল হয়ে থাকে শ্রেয়া। এককালে খুব মিশুক ছিল সে। কিন্তু এই কয়েকবছরের মধ্যে শ্রেয়া ঝট্ করে কারো সঙ্গে অন্তরত্ব হতে পারেনি। তবুও নীলাদির কাছে ও বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বেশীর ভাগ গভর্মেন্টের ব্রিফ ভদ্রমহিলার। পুরুষ প্রধান জগতে তিনি মোটামুটি দাপটেই আছেন। বিয়ে করেছিলেন ছেলেবেলায়। স্বামী মারা গেছেন অথবা সম্পর্ক রাখেন না। দুরকম গুজবই কড়িডোরে চালু। নীলাদিকে দেখে স্পষ্ট কিছু ধারনা করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রেয়াও প্রশ্ন তোলেনি কোনোদিন।

বুঝলি ওকালতি মানে শুধু গাধার খাটুনি। মেশিনের মতো চলা। নিজস্ব জীবন বলতে কিছু নেই।

শ্রেয়া ঠোঁট টিপে হাসে। নেই মানে? নিজস্ব জীবনই তো এইখানেই খুঁজে পেয়েছে সে। দিনগুলো আগে মাঝে মাঝে ভারী মনে হলেও এখন মনে হয় প্রতিটি দিন নূতন স্বাদের, প্রতিটিক্ষণ জন্ম দেয় অচেনাবোধ। ভালোলাগা শুধু ভালোলাগা।

শ্রেয়াকে নিরুত্তর দেখে নীলাদি যেন আরো উৎসাহ পায়। বুঝবি, বয়স হলে বুঝবি। শরীর আর টানা যায় না।

মেয়েদের পক্ষে তো আরও খারাপ। অন্যচোখে দেখে সবাই। কালো গাউনের পেছনে চোখ ছোটে মেয়েটাকে দেখতে। যতক্ষণ মেয়ে আছো ভালো অ্যাডভোকেট হবার জন্য চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেই হা হা করে উঠবে সবাই। যে মেয়ে অ্যাডভোকেটটা একজন ছেলে অ্যাডভোকেটের থেকে ভালো কাজ জানে তাকে বাতিল করা হবে শুধু মেয়ে বলেই। ছেলেদের সোজা রাস্তা, মেয়েদের ঘুরপথ। কতো ভালো মেয়ে রাস্তা ভুল করে হারিয়ে গেল। তিরিশ বছর তো কাটালাম, শেষের দিকে নীলাদির স্বর খাদে নেমে যায়। অভিযোগে ঠাসা এখানে প্রায় সকলেরই কণ্ঠ।

ভালো লাগে না শ্রেয়ার। নিজের শাড়ীর প্রত্যেকটা ভাঁজ পরিপাটি রাখে শ্রেয়া। অনেকদিন দেখেছে ঘাম জমলে মুখটা বড়ো ফ্যাকাসে মনে হয়। হাল্কা হাতে রুমাল বুলিয়ে ঘামটা মুছে নেয় বার বার। কোর্টের দোতলা তিনতলা করতে খুব শারিরীক পরিশ্রম হয়। আজকাল তাই ধীরেসুস্থে ওঠে বা লিফটের জন্য অপেক্ষা করে। আমি দৌড়ঝাঁপ করলেও মামলা ডাক হয়ে যেতে পারে। শ্রেয়া নিশ্চিন্ত। একটা আলো আলো ভাব চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অনবরত। সুন্দর করে হেঁটে যায় ও। কড়িডোরে দাঁড়ানো পুরুষদের চোখের নীরবস্তুতি না তাকিয়েও অনুভব করে। আবেশে মন টইটম্বুর। নারীত্বের এই উন্মোচনে শ্রেয়া বিমূঢ়। সবসময় একটা সজ্জা সজ্জাভাব ঘিরে থাকে ওকে। দাঁড়িয়ে উঠে মামলা করা মানেই শুধু জোরে জোরে কথা বলা। কোর্টে দাঁড়িয়ে কথা বলা এড়িয়ে যায় ও।

এই ল্যাণ্ড ম্যাটারটা কাল করে দিও, রঘুবীর সেন ব্রিফটা শ্রেয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমিহু শ্রেয়া ঢোক গেলে। একঘর লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবো। শ্রেয়া মনে মনে চুপসে যায়। কিছুই তো নেই মামলাটায়। শ্রেয়ার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন তিনি।

কেড়ে নিয়ে যেতে হয় এখানে আর তুমি পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ? রঘুবীর সেনের চোখের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে চায় শ্রেয়া। মুগ্ধতার ছায়া খুঁজে পায়।

আমার ভেতরের প্রকৃত নারীসত্ত্বাকে চিনেই উনি মোহিত।

কাজপাগল রঘুবীর সেনের নিজস্ব কোনো শখের হদিস শ্রেয়া কোনোদিন পায়নি। আইনের বই, মামলা আর কোর্ট। কিন্তু শ্রেয়া প্রথম থেকেই দেখেছে স্যারে রাজনীতির প্রতি এক অদ্ভুত দুর্বলতা। এতো সাফল্যেও মন ভরেনি। রাজনীতিতে সক্রিয় যোগদানের জন্য ছেলেমানুষীও করে ফেলেন মাঝে মাঝে। পার্টির কোনো ছেলে এলেই হলো, মক্কেল টক্কেল সব বাদ দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে একান্তে আলাপ জুড়ে দেবেন। রাজনীতি করা স্যারের যে কি দরকারহু নাম বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। আরো চাই— এ সব মানুষেরই আর্তি।

সন্ধ্যাবেলায় একটা ঘরোয়া পার্টিতে স্যার বেশ উত্তেজিত গলাতেই নিজের এই ঝোঁককে বিশ্লেষণ করছিলেন। একটু রঙীন ছিলেন বোধহয় তাই বাগ্‌সংযম কিছুটা শিথিল। কথাবার্তা কিঞ্চিৎ বেহিসাবী।

রাজনীতিই এখন মই। ওকালতিতে আক কি আছে?

ক্লান্তি এসে গেছে। এর থেকে একজন হাউস ওয়াইফের কাজেও নূতনত্ব আছে। গোনাগুনতি রাজনীতির জগৎ, বুঝলে ভায়া, ওকালতির চেয়ে জটিল অনেক। উকিলরা তো আমরা উঠতিদের পেছন থেকে টানি। জোর করে দাবিয়ে রাখি কাউকে, কাউকে বা বশ করে। কিন্তু রাজনীতিতে পেছনে টানতে হলে ঝুনো মাথা চাই, কেউ এখানে দুর্বল না। তুমি যেমন ভাবছ আমি ওকে বিপথে চালিয়ে পিছিয়ে দিলাম, সেই শোকটাই যে আবার তোমাকে ঘোল খাওয়াবার ব্যবস্থা করছে তলায় তলায় তা তুমি জানতে পারবে না। সাংঘাতিক, বড় সাংঘাতিক। হাসির দমকে মিঃ সেনের মুখের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট ভেসে ওঠে। শ্রেয়া ভাবে ভদ্রলোকের মুখে তো যথেষ্ট আঁকিবুকি কাটা। মেপে হাসেন সব সময় তাই দেখা যায় না দাগগুলো, একটু আলগা হতেই বেড়িয়ে পড়েছে সব ওপরের চামড়া ভেদ করে। খাবারগুলো খুব দামী ছিল। কিন্তু শ্রেয়ার খিচড়ে থাক। মনটা ওর স্বাদযন্ত্রের ওপর ভর করেছে যেন। মুখে বিস্বাদ ঠেকে সব।

শ্রেয়ার চারিদিকে সকলে কর্মব্যস্ত। কাজ আর কাজ। কোর্টে কোর্টে দৌড়াদৌড়ি। কড়িডোরে দাঁড়িয়ে মক্কেলের সঙ্গে আলোচনা। শ্রেয়া আপ্রাণ। নিজের মোহিনী মূর্ত্তিটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে।

আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি? নিজেকে স্বতন্ত্র করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম না তো? ভয়টা ঠেলে ঠেলে আসে। স্যারের চেম্বারে কাজও কমে এসেছে, সিনিয়র ব্রিফ পান, যারা ব্রিফ দেয় তারা জুনিয়রও দিয়ে দেয়। যে ব্রিফে যে জুনিয়র সেই সাহায্য করে। মাঝে মাঝে শ্রেয়াকে শুধু চুপ করেই বসে থাকতে হয়। চুপচাপ কোনো একটা ব্রিফ টেনে নিয়ে পাতা উল্টে চলে আসে নিঃশব্দে। পায়ের তলায় চোরাবালির অস্তিত্ব টের প্রায়।

হাল্কা নীল রঙের শাড়ী ব্লাউজ। কপালে লাল ছোট টিপ। মিনিবাসে চেম্বার থেকে বাড়ী ফিরছিল শ্রেয়া। কি কোথা থেকে? প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দীপাকে দেখে শ্রেয়া। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চুল এলোমেলো। শাড়ীটাও কোঁচকানো। হাতে কয়েকটা ব্রিফ। পায়ের কাছে ব্রিফকেস্।

চেম্বার থেকে শ্রেয়া দৃষ্টি বোলায় দীপার শরীরে।

তুমি?

কোর্ট থেকে চেম্বার সেরে ফিরছি। কি যে ক্লান্ত লাগছে। কাজ অনেক ছিল তাই সোজাই চেম্বারে গেছিলাম। দীপার গলায় আত্মতৃপ্তির আভাস। নিজেকে কেমন যেন পরাজিত বলে মনে হয়। কোথায় চলেছি আমি? আমার লক্ষ্য কি? নিজের সমস্ত শক্তি নিংড়ে, একরাশ ক্লান্তি গায়ে মেখে প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধে জেতার সংকল্পে সবাই যখন ব্রতী, আমি তখন মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কর্মজগত থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছি। বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় শ্রেয়ার। শুধু নিজের শরীর আর মনকে উলটে পালটে দেখলাম এতোদিন, অথচ কাজটা আমার গুছিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কাজ করেছি অনেক, কিন্তু নিজের ভবিষ্যত গড়ার জন্য কিছু করিনি, নিজের সত্ত্বাকে মেলে ধরতে গিয়ে, অস্তিটাকে তছ্নছ্ করেছি। আত্মসম্মান বজায় রাখতে রাখতে সম্মানটা তৈরীই করলাম না।

নিজের হাত নিজের কামড়াতে ইচ্ছা করে। প্রথমদিকে দুএকটা সুযোগ পেয়ে স্দ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল শ্রেয়া। কিন্তু তারপরে কি যে হয়, প্রতিক্ষণে নিজেকে একঘরে, কোনঠাসা অপাক্তেয় মনে হয় এখন।

বাবার একবন্ধু আলিপুর কোর্টের প্রবীন অ্যাডভোকেট। বাবা নিয়ে গিয়েছিল একদিন তার কাছে। ভদ্রলোক ওর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওকে প্রস্তাব দেয় কাজের। আমি কেস্ তো পাঠাই হাইকোর্টে। ওখানে দু-একজন অ্যাডভোকেটের কাছেই সাধারণতঃ পাঠাই। ওরা তোমার থেকে সিনিয়র। যে কেস্গুলো পাঠাবো, তুমি ওদের সঙ্গে জুনিয়র হিসাবে কাজ করবে।

ভেবে দেখার জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নেয় শ্রেয়া। রাস্তায় নেমে বাবার বকুনি।

ভেবে আবার কি দেখবি? এক করে সব ব্যবস্থা করলাম। দিলি সব ভেস্তে। যা ইচ্ছে কর। নিজেরা বুঝতে শিখেছ।

শ্রেয়া বুঝতে পারে বোকামী করে ফেলেছে সে কিন্তু বাবার বন্ধুর প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হতে পারে না। স্যারকে বাদ দিয়ে কাজ করলে কি ভাববেন উনিহু অবশ্য মনের কথা বাইরে প্রকাশ করে না ও।

আরো কয়েকজন কাজের কথা বলেছিল। কিন্তু অন্য পরিবেশে গিয়ে কাজ করার কথা ভাবতেই পারেনি ও তখন। স্যারের চেম্বারে তার যে রাগী রাগী ভাব। ধূলো বালিতে গড়াতে হবে ভাবলেই গা সির সির করে উঠেছিল।

কি ভুল করেছিহু আত্মগ্লানিতে মন তিক্ত হয়ে ওঠে। মাটির ধূলো গায়ে মেখেই তো উঠে দাঁড়ায় সবাই। নূতন করে শুরু করতে হবে আমায় — বিছানায় শুয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে শ্রেয়া। সলিসিটর ফার্মের একজন ভদ্রলোকের সে! কিছুটা আলাপ আছে, তাকে বলে দেখলে হয় — শ্রেয়া চারিদিকে পথ খুঁজতে থাকে। পরেরদিন কোর্টে গিয়ে ভদ্রলোকটিকে চোখে পড়ে না। আজ ভদ্রলোক আসেননি বোধহয় কোর্টে, শ্রেয়া অনুমান করে। এক নম্বর কোর্টের সামনে ভদ্রলোকের অফিসের ক্লার্কের সে! দেখা হয়ে যায়।

সোমেনবাবু কোথায় জানেন? শ্রেয়া জিজ্ঞাসা করে।

স্যার তো আজ সারাদিন অফিসে, ক্লার্কটি বোধহয় ব্যস্ত ছিল, তাই আর কথা না বাড়িয়ে ছুটে চলে যায়। অফিসে গিয়ে দেখা করি, কি আর করবেন। বড় জোর কিছু হবে না বলবেন, শ্রেয়া সাহস সঞ্চয় করে। কোর্টের সামনেই একটা বেশ বড় ঘরের অফিস। মাঝখানে কাঠের পার্টিশন। একটুখানি অফিস স্পেস পাবার জন্য এখানে কাড়াকাড়ি।

সুইং ডোরটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে শ্রেয়া। ভেতরের ঘাম তো আর বাইরে থেকে মোছা সম্ভব নয়। ব্লাউজটা ঘামে জবজবে।

সোমেনবাবু? শ্রেয়া বাইরে বসা ছেলেটির কাছে খোঁজ করে।

এইমাত্র বাইরে গেলেন। ছেলেটি বসে বসেই উওর দেয়। কখন আসবেন জানো? শ্রেয়া প্রশ্ন করে।

আজ আর ফিরবেন না, ছেলেটি নির্বিকার।

নিজের অজান্তেই স্বস্তির নিঃস্বাস পড়ে শ্রেয়ার। চমকে ওঠে শ্রেয়া। আমি কি মনে মনে চাইছিলাম ভদ্রলোকের সে! না দেখা হোক? উনি না থাকলে আমি কি করবো। আমিই তো এসেই ছিলাম, শ্রেয়া যুক্তি সাজায়। বছর চারেক হয়ে গেলো শ্রেয়ার। মনে হয় যেন সেদিন। কিন্তু দেখতে দেখতে একগুলো দিন কেটে গেল। কিছুই করতে পারলাম না এখন পর্যন্ত, শ্রেয়া অনেক তলিয়ে ভেবেছে। দুচারজন যে সমসাময়িক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা হয় মাঝে মাঝে, সকলেরই এক মত। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। পেলেই তার সদ্ব্যবহার করতেই হবে তা নাহলে পিছলে একদম নীচে। বলে টলে দেখো না কাউকে। সাহায্য কেউ করবে না, কাজও কেউ শেখাবে না। নিজে নিজে শেখো, নিজে নিজে জানো।

তেল মেরে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করো — ব্রিফ পাবে, রজত বোঝায় ওকে। একই কলেজে পড়তো ওরা। শ্রেয়ার থেকে একবছর আগে পাশ করেছে। দেখা হলেই শ্রেয়ার সঙ্গে কথা বলে খুব। কুদঘাট অঞ্চলে থাকে। লড়াকু ছেলে। এর মধ্যে একে একে ধরে মোটামুটি বেশ এগিয়ে গেছে। অর্চনারও মত খুব স্পষ্ট। প্রায়ই শ্রেয়ার সঙ্গে ফেরে। আমার সিনিয়র তো বড় সিনিয়র। বড় বড় ব্যাপার। ওখানে সুযোগ নেই কিছু। ওখানে আর থাকবো না। দেখি চেষ্টা চরিত্তির করে যদি কিছু জোগার করতে পারি। মাঝে মাঝে ভীষণ হতাশা আসে জানো?

শ্রেয়া চুপ করে শোনে। ওদের চিন্তাগুলো বড় স্বচ্ছ। কেউ এগোতে সাহায্য করবে না অতএব টিকতে হলে নিজেকেই লড়তে হবে। ছিনিয়ে নিতে হবে। এই ধারনাটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে জোর করে ধরে রাখতে পারে না। স্যার আমার জন্য করবেনই কিছু। সুভদ্রার স্যার তো চেষ্টা করে ওকে একটা সলিসিটর ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। এখন ও কতো ভালো করছে নিজে নিজে। আর চিত্রলেখার সিনিয়র ওনার জন্যই তো আজ ও সিটি কোর্টে প্র্যাকটিস জমিয়েছে। গুছিয়ে বসছে একজন একজন করে। আস্থা হারানো উচিত নয়। পৃষ্টপোষকতা একটুখানি, তাও কি পাবো না আমি ওনার ওপরতো আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি — ভাবনার পর ভাবনা এলোমোলো করে দেয় ওর মন। মিনিবাসে সামনের সিটে বসেছিল শ্রেয়া, হু হু করে জানালা গলে হাওয়া ঢোকে ভেতরে। বুকের কষ্টটা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে খত সৃষ্টি করেছে অন্তস্তলে। একটু নাড়া লাগলেই যন্ত্রণা হয় বড়। চোখে জমে থাকা রাগ ঘন হয়ে গড়িয়ে পড়ার আগেই দু চোখের পাতা বন্ধ করে জলটা শুষে নেয় শ্রেয়া।

আচ্ছা, আজ যদি আমাকে কেউ একটা মামলা করতে দেয়।

সাক্ষী

পাঁচঘর ভাড়াটের বাড়িটা সব সময়ে শব্দের বিশৃঙ্খলয়ায় ঘোট পাকায়। হালে শুক্রবার সাড়ে নটা থেকে দশটা টেলিভিশন একফালি শব্দ শুধু হাওয়ায় ভাসে, আর সব শব্দগুলো থিতিয়ে যায়। প্রশান্তরা রঙীন টিভি কিনেছে। বাড়ির মেয়েরা বাচ্চার হুমুড়ি খেয়ে পড়ে ওদের ছোট্ট ঘরের মধ্যে। পুরুষরা অবশ্য যায় না। কেউ কেউ ঘরে বসে থাকে, কেউ বা নোংরা উঠোনের একধারে মোড়া পেতে ঝিমোয়। শুক্রবারের এই আধঘন্টা সময়ের মধ্যেই অনুপ ঘটিয়ে বসল ব্যাপারটা। কোঁক করে শুধু একটা শব্দ হয়েছিল মাত্র। ব্যাস্ তারপরেই সব ঠাণ্ডা। অবশ্য কোঁক শব্দটা হওয়ার আগে প্রচুর শব্দের আদান প্রদান ঘটছিল।

অতসী দাঁত দাঁত পিষে রেখেছিল। বলব তুমি বলরাম দাসের কাছ থেকে কমিশন খেয়ে লরির মাল ভরেছ-

মিথ্যে কথা- কে বলেছ এ কথা? অনুপ ভয়ে সিঁটিয়ে ওঠে-- বিষাক্ত হাসিতে অতসীর মুখ ভেসে যায়-

যে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে বলতে পারে কুড়ি পেয়েছি। তার তো সব কিছুতেই আধা আধি-- অনুপ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলে-- কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? তোমার বাপ যে ঠগ্ সে আর কে না জানে?

অতসী থিক্ থিক্ করে হাসে-- পনের টাকা আধা আধি, লরির বালি আধি আধি-- বলরামবাবুর বউয়ের সঙ্গেও আছে আধা আধি । অনুপের গলার আওয়াজ চড়তে গিয়েও নেমে আসে খাদে, বিকৃত একটা শব্দ শুধু আটকে থাকে ওর গলায়।

চুপ, চুপ-- অনুপের ঝাকড়া ঝাকড়া চুল দুলে ওঠে। ও ভারি ভারি পা ফেলে হাঁটে পাঁচ ফুট বাই দু ফুট ঘরের মধ্যে। ঘরের হাঁটার জায়গা মাত্র তিন পা। একধারে খাট অন্য ধারে কাঠের ছোট আলমারি। একটা ছোট আলনা। অনুপ শুধু বলতে থাকে-- এত মিথ্যাবাদি তুমি-- তুমি নিজের মুখে বলেছ তোমার বাবা খামের মধ্যে শুধু কুড়ি দিয়েছিল--

অতসী মিটি মিটি হাসে।

কাল সকালে উঠেই যাব আমি ছাপান্নর তিন নীরেন রায় স্ট্রীটে। সরকারবাবুকে বলব বালি কি কম পড়ছে বাবু?

অনুপ থমকে দাঁড়ায়-- তুমি বলবে?

অতসী পেছন ফিরে বিছানায় শোয়া তিন মাসের মেয়ের শরীরে মৃদু চাপড় দেয়। অনুপ গলায় ফুটিয়ে তোলে একটু স্নিগ্ধতা--

অতসী, বলরামবাবুর বউ সেদিন অনেক করে বলতে আমি সিনেমায় গেছিলাম। বিশ্বাস কর, দাসবাবুও ছিল সঙ্গে।

অতসী সরাসরি তাকিয়ে থাকে অনুপের চোখের দিকে। অতসী অনুপের বিয়ে হয়েছে মাত্র দু বছর। এই দু বছরেই অনুপ দেখেছে অতসী সাংসারিক ছোট খাট ঝগড়া বচসাকে ঝট করে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারে।

লোক জড় করে সাক্ষী রাখে। অনুপ নরম মুহূর্তে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে বহু। অতসী নরম হয়নি। ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছে-- বাইরের সাক্ষী থাকলে ছোট ঘটনাগুলো আর বাড়তে সাহস পায় না। অনুপের মা প্রথম দিকে জানত না বউয়ের এই বিপদজনক স্বভাব। আড়ে ধাড়ে প্রায়ই বলতো-- তোমার বাবা তো জানি বেশ দুঁদে ব্যবসাদার। তবে এ ভুল করল কেন বলতো? চল্লিশের জায়গায় কুড়ি ছিল কেন?

অতসী উত্তর দিত না।

নিরুত্তর বউয়ের দিকে চেয়ে শ্বাশুড়ী ভাবল হয়তো বউয়ের আপশোষ হয়েছে, তাই একটু টিপে দিয়ে বলে-- যেও বাছা বাপের কাছে। গিয়ে বল বাকি টাকাটা যেন দিয়ে দেয়, তা না হলে মেয়ের ঘরের শান্তি থাকবে কেন? অবাক কান্ড। বিকেলে হঠাৎ পাড়ায় সাধনবাবুর শালা এসে হাজির, সঙ্গে লেবু তলা থানার ছোটবাবু। বুট পা সোজা ঘরে ঢুকে এসে অনুপের বাবার দিকে চেয়ে বলে-- কি হল? পনের টাকার জন্য বউকে গঞ্জনা দিচ্ছেন শুনছি? অনুপের বাবা মা তো হতবাক্। অনুপ ছিল না। অতসী, দিকে চেয়ে বলে-- থানার ছোটবাবু-- পনের টাকা নিয়ে আর কিছু বললেই--

অনুপের মা বাপের এই হেনস্তার সাক্ষী ছিল সেদিন পাঁচঘর ভাড়াটে।

ছাপোষা ঘরের ছেলে অনুপ। চার বোন এক ভাই। তারা বোনের বিয়ে দিতে দিতে, নিঃস্ব। একটা ছেলে আর তার বিয়েতে একটু পন না নিলে চলে? বেটা ছেলে কি এতই ফ্যাল না? তবে ঘর বাছতে ওরা ভুল করল। অতসীর বাবার অনেক পয়সা আছে ভেবে সমন্ধ করল ওরা। কিন্তু কে জানে এমন খাপু লোক। চল্লিশের জায়গায় কুড়ি ভরে খাম ভরে দিয়ে দিল বিয়ের রাতে। পাড়ার মাতব্বর নিমাইয়ের সামনে টাকার খামটা দিল অনুপের বাবাকে। খাম মেপে অনুপের বাবা কি করে বুঝবে ওতে কত আছে? চল্লিশ কি কুড়ি। কবে আর অজিতবাবু চল্লিশ হাজার টাকার ওজন হাতে নিয়েছে?

এটা সত্যি কথা, এমন এক বিদ্‌ঘুটে স্বভাবের বউয়ের সঙ্গে মন চালাচালি চলে না। মিথ্যে নয়, এটা সত্যিই। অনুপ একটু হাসিতামাশার করে বলরামবাবু বউয়ের সঙ্গে। টুকটাক ছোঁয়াছুয়ি। আড়ে ধারে কথা। এই বলরামবাবুর কারবারে ঢুকেই তো অনুপ দু চার পয়সা কামাচ্ছে হালে। কে না কামায় আজকাল? কে না একটু সুখটুক চায়?

ঘরে ওর সুখ কই? তিন ইঞ্চি দেওয়ালে দুটো ছোট ছোট ঘর চাপা। হাওয়া ঢোকে না, নীচু সিলিং। পাশের ঘরে বাবা মা থাকে। এই ঘরে ওর তিনজন। তিনমাসের মেয়েটা যবে থেকে হয়েছে তবে থেকেই ছিঁচ কাঁদুনে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। অনুপ ভাবছিল একটু পয়সা করতে পারলেই এই বাড়িটা ছাড়তে হবে। একটা আরামে করতে পারব। একটু সুখ পাব, অনুপ যখন এইটুকু ভাবতে শুরু করেছে তখন থেকেই অতসীর

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওকে জরিপ করছে। আর আজ সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে অতসী ওকে ভয় দেখাল-- আমি কালই যাব। অনুপ চেঁচাতে পারছে না। দু হাতে ওকে চড় কশিয়ে থামাতে পারছে না। অনুপ মাত্র তিন ইঞ্চি দেওয়ালের বেড়াটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বামীস্ত্রীর এই গোপন আলাপকে আর হওয়ার প্রতিক্ষনেই। অথচ অতসী দাঁতে দাঁত ঘষেই চলেছে। ওর ধিকি ধিকি চোখদুটোতে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ও বলেই চলেছে-- তোমার সেই আধা বউ, ও বলেই চলেছে-- আথা লরী, আধা হিসাব। আর শেষে ও আবার বলে-- ছাপান্নর তিন নীরেন রায় স্ট্রীট--

অনুপ নিদারুণ ভয় পেয়ে গেল। পাকা চাকরীটা যাবে আমার। জেলও হতে পারে-- সরকারবাবু-- টেবিলের ওপরে রাখা জলভর্তি স্টীলের জগটা ও তুলে নিয়ে মেরে বসল অতসীর মাথায়। ওই একটিমাত্র শব্দ-- কোঁক-আর একটু গোঙানি না, ঝটপটানি না, খাটের একধারে ঢলে পড়ল অতসী। অনুপ সভয়ে দেখল জলে ভেসে যাচ্ছে ওর মুখ, গলা, শাড়ি। আর তারপরেই চোখে পড়ল চুলের গোড়া ভেদ করে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসছে রক্ত, লাল লাল রক্ত। দিশেহারা অনুপ প্রথমেই সুইচ টিপে আলো বন্ধ করে। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে আসে। উঠোনের ধারে দাঁড়িয়ে দেখে প্রশান্তদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে পাঁচ ঘর ভাড়াটের মেয়েরা, বাচ্চারা। একটানা শব্দ নয়, আবার বাড়িটা ভলে উঠছে নানা কণ্ঠস্বরে। কাটিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে যায় ও। কিছুক্ষণের মধ্যে অনুপের বাবাও মোড়া তুলে ঢোকে ঘরে। সাড়ে দশটায় মা ডাকে-

আয় অনু, খাবি আয়। অনুপের ভেজান দরজায় আর সদর দরজার সামনেএকটু খালি জায়গা দাঁড়ালে রান্না ঘর দেখা যায়। সদর দরজা খোলা থকলে উঠোন দেখা যায়। মা বাবার ঘরের একাংশ চোখে পড়ে। দশটা থেকে সাড়ে দশটা অনুপ দাঁড়িয়েছিল ওই জায়গাটায়। অনুপের মা একবার শুধ প্রশ্ন করেছিল-- বৌমা কি বাচ্চা খাওয়ায় নাকি?

অনুপ কি ঘাড় নেড়েছিল?

মা খেতে ডাকতেই অনুপ সদর দরজার ছিটকিনি তুলে দেয়। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় মা বাবার ঘরে। ওই ঘরের মেঝেতেই খাওয়া দাওয়া সারে এরা। মা ডালের বাটিতে হাতা চোবাতেই অনুপ কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রেখে ডাকে--মা।

ওর গলা কেঁপে ওঠে। মা চমকে যায়। বাবা ভাত ভাঙতে গিয়ে থেমে যায়। অনুপ দু হাত বাড়িয়ে মা আর বাবার গলা জড়িয়ে টেনে আনে ওর ঠোঁটের কাছে। মায়ের মুখটা হাতের তালুতে পিষে রাখে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে অনুপের মা। অনুপের হাতের তলাতে কোন শব্দ নেই। অনুপের হাতের বেষ্টনীতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকে অনুপের মায়ের, অনুপের বাবার।

অতসী ঘরে গেছে।

অনুপের বাবা ছিটকে বেরিয়ে যায় অনুপের হাত থেকে শব্দ নয়, সামান্য গোঙায় ও।

অনুপ এখনও চেপে আছে ওর মায়ের মুখ। অনুপের সার শরীরটা দোমড়ায় মোচড়ায়। প্রায় মিনিট তিনেক পর শরীর শান্ত হলে অনুপ ছেড়ে দেয় ওর মাকে।

আরও মিনিট পাঁচেক কেটে যায় স্তব্ধতায়। অনুপের বাবা উঠে বসে। পর্দা ঘেরা তাকের ওপর থেকে একটা পুরনো তালা বার করে, তাকের কাগজ উঠিয়ে বার করে চাবি তারপর একটুও শব্দ না করে তালা দেয় সদর দরজায়। ভাতের থালা পড়ে থাকে। ওরা তিনজন ঢোকে ভেজান দরজা খুলে অনুপের ঘরে। ঘর ভর্তি অন্ধকার। মোমবাতি জ্বালায় অজিতবাবু কিন্তু টেবিল ফ্যানের হাওয়ার নিভে যায় মোমবাতিটা। এবার লণ্ঠনের আলোতে ওরা তিনহাত মাটিতে উবু হয়ে বসে। লণ্ঠনের শিখা কাঁপতে থাকে থর থর করে।

অতসীর শরীরের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে দেওয়ালে। অজিতবাবুর কানে কানে বলে অনুপ-- এখন কি হবে বাবা? অনুপের কানটা টেনে নেয় অনুপের মা, কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে-- বাবাকে কি বললি অনু?

তিনটে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ রাতের অন্ধকারে কানে কানে কথা বলে। দেওয়ালের কান আছে। আর তিন ইঞ্চি দেওয়ালের? কান নয়। মুখ আছে।

অজিত বাবু বলতে হবে অ্যাক্সিডেন্ট, পা পিছলে পড়ে গেছিল।

অনুপ বলে-- জগটাতে হাতের ছাপ--

আস্তে করে উঠে দাঁড়ান অজিতবাবু। হাতড়ে হাতড়ে মাটি থেকে তুলে নেন জগটা। আলনা থেকে অতসীর শাড়ি একটা তুলে নিয়ে রগড়ে রগড়ে মোছেন ছেলের অদৃশ্য হাতের ছাপ, বউয়ের রক্তের দাগের সম্ভবনা। শাড়ি দিয়ে ধরেই জগটাকে রাখে টেবিলের ওপর। মেঝের ওপর পড়ে থাকা জলে পা ফেলে ফেলে কাদা হয়ে যায়। শাড়ি দিয়ে কাদা জল মুছে ফেলেন অজিতবাবু।

অনুপের মা ছেলে আর স্বামীর দুটো কান এক করে ফিস্ ফিস্ করে-- পা পিছলে পড়ে গিয়ে বিছানায় থাক উচিত নয়। মাটিতে ফেলে রাখলে হয় না?

অনু বলে-- মাটিতে? জায়গা কই?

অজিতবাবু বলেন-- আগে চিন্তা করে দেখ আর কিছু সাক্ষী প্রমাণ থাকল কিনা?

অনু একটু ভেবে বলে-- সাক্ষী তো ছিল না কেউ?

কিন্তু প্রমাণ?

অজিতবাবু বলে-- হাত দিও না কিছুতে। এখনও সময় আছে কিছু। ঘন্টা পাঁচেক--

হঠাৎ মুখের ভেতর আঁচল গুজে ডুকরে ওঠে অনুপের মা। খিঁচ ধরে ওর হাতে পায়ে-- ভয়ে এর সারা শরীর কাঁপতে থাকে। মায়ের দিকে তাকিয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকে অনুপ। অজিতবাবু হঠাৎ খিমচে ধরে অনুপের মার হাত তারপর স্ত্রীর গলা হাতের বাঁধনে জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে-- একটা শব্দ না--

হঠাৎ চিল চীৎকারে চমকে ওঠে সবাই। মৃত মায়ের পাশে যে তিনমাসের শিশুটি ঘুমিয়েছিল এতক্ষণ ভুলেগেছিল যেন সবাই। ওরা চমকে উঠে প্রকাশেই ভেবেছিল--

জানাজানি হয়ে গেল সব। একটা অপার্থিব শব্দ তিন ইঞ্চি দেওয়াল ভেদ করে জানিয়ে দিচ্ছে যেন সবাইকে-- এই ঘরে খুন হয়ে গেছে আজ। সাড়ে নটা থেকে দশটা নাগাদ।

মায়ের দুধ খাব বাচ্চাটা। রাত্রিবেলা ও কাঁদছে কেন? খিদে পেয়েছে? পেট ব্যথা করছে? ও কি টের পেয়েছে ওর মা খুন হয়ে পড়ে আছে ওর পাশে। অনুপের মা শক্ত করে চেপে ধরে থাকে বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে। ওকে যেন পিষে ফেলে কান্না বন্ধ করবে ওরা? বোতলে করে জল খাওয়াবার চেষ্টা একটু, ও খায় না। অনুপ ওঠে এবার, প্লাস্ক থেকে জল বার করে দুধ গুলে দেয় বোতলে। এবার শান্ত হয় মেয়েটা। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে ও। বাচ্চাটাকে খাটে শোয়াতে সাহস হয় না। যদি অন্য কোনও প্রমাণ ফেলে যায়? খুনের পরেও তো কিছু প্রমাণ রেখে যাওয়া সম্ভব।

অনুপের মা তাই দাঁড়িয়ে থাকে।

পিঠে যন্ত্রণা শুরু হয়। বাচ্চা কোলে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রায় ষাট ছুই ছুই প্রৌঢ়াকে। অনুপ আর ওর বাবা তখন পরামর্শে ব্যস্ত। একবার আলোটা জ্বালাব?

না, একটু দাঁড়ায়। জগ ছাড়া আর কি বা প্রমাণ থাক সম্ভব? অজিতবাবুর কণ্ঠস্বর দুশ্চিন্তার ভারি হয়ে আসে।

শরীরের নীচ দিকটা ঝুলছে। মাথাটা ওপরে ঢলে রয়েছে-- অনুপ স্বগতোক্তি করে।

বডিটাকে খাটে রাখা চলবে না। এটাকে রান্না ঘরের চৌকাঠের সামনে ফেলে রাখতে হবে। অজিতবাবু ভাবতে ভাবতে বলে।

কিন্তু এতটা সময় আমরা দেখিনি? অনুপ বাবার কানের কাছে মুখ না নামিয়ে প্রতিবাদ করে।

আস্তে-- অজিতবাবু অনুপের মাথাটা কাছে টানে। বলব সকালে চা করতে গিয়ে পড়ে গেছে বোধহয়--

অনুপ হতাশা ঢোকায় অজিতবাবুর কানে-- কিন্তু রক্ত কি এখনও বেরচ্ছে? ঘা টা বাসি না? হাত দিয়ে দেখব? অনুপ উঠে বসতে যায়। না, না- হাত দিস না-- এবার অডিতবাবু গলায় স্বরটা একটু শব্দ ছড়ায়।

নিজেই নিজের স্বরকে গিলে নিয়ে বলেন অজিতবাবু-- একটা শুধু কাজ করতে হবে। মেঝেতে ঠুকে কপালের বাসি ঘাটাকে একুট--

অনুপ মুখ ঢাকে-- না বাবা। ওই মৃতদেহে আঘাত করা--

অজিতবাবু বলে-- ওই কপালের বাসি ঘা তোকে ধরিয়ে দেবেরে অনু-- ওটা যে সাক্ষী থাকতে তোর অপরাধের--

লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা ভরে থাকে আবছা আলোতে। ভীত কন্টকিত মা দাঁড়িয়ে থাকে শিশু কোলে দেওয়ালে ঘেঁষে। শুধু দুটি পুরুষ কানে কানে কথা বলে। মাঝে মাঝে

থেমে যায় ওদের কথা। ক্লান্ত হয়ে আসে ঘরের বাতাস। ঝিম্ মেরে বসে থাকতে থাকতেই একটা তীব্র ভয় ওদের খুঁচিয়ে তোলে। ওরা আবার কানে কানে কথা বলে--

বাবা বলে-- একটা নতুন আঘাতের দরকার। অনুপ ভাবে-- ও তাকায় ওর খুনী হাতের দিকে। ওর হাতে জোর কই? ও এই দুর্বল হাত কি করে মেঝেতে মাথা ছেঁচবে অতসীর।

ভোরের আলো ফোটার সে! সে!ই এই কাজটা করতে হবে অনুপের। কিন্তু অনুপ কি করে করবে?

অজিতবাবু বলে-- কাজটা সম্পূর্ণ না করতে পারলে বাসি ঘাটা সাক্ষী দেবে।

ভোরের আলো ফুটলেই পৃথিবী বিরাট ফাঁদ ফেলবে ওদের জন্য। বিপদের সম্ভবনা নিয়ে শুরু হবে দিনটা। তবু ওরা ভোরের অপেক্ষা করে।

অনুপের ঘাড় নড়ে। তীব্র শরীর যন্ত্রণায় অসাড়। বদ্ধ পসুর মত অজিতবাবু গুমড়ায়। অনুপ শুধু পড়ে থাকে নির্জীব। মনে হয় যা হবার তাই হোক। ওই বাসি ঘাটাই থাক।

আর কিছু আমি পারব না, পারব না, পারব না। আস্তে করে ভোরের প্রথম আলো ঢোকে ঘরে। অতসীর দেহ তুলে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় অনুপ। বাবা মা ঘরেই থাকে--

বাবা শেষ বারের মত ওর কানে পরামর্শ দেয়--আমরাও দেখব না। আমরা থাকলে তুই পারবি না। তুই যা। যা বলছি সেটা তুই দু চোখ বন্ধ করে--

অনুপ এগিয়ে যায়। আলতো করে নামায় অতসীর দেহওই এক চিলতে জায়গায়। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অতসী। দু চোখ বন্ধ করে অনুপ মনের জোর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। ওর দুর্বল শরীর শুধু কাঁপে। অনুপ চোখ মেলে। ভোরের আলো আর একটু ফুটেছে বোধহয়। অতসীর মুখটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে। ওর কপালে বাসি ঘা। জমাট বেঁধে আছে রক্ত। তির তির করে কাঁপছে ওর চোখের পাতা । অনুপ আবার তাকায়। ওর শুকনো ঠোঁট দুটোও তো একদম স্থির না। অনুপ ওর গলার কাছে আঙুল ছোঁয়ায়। প্রান স্পন্দন ঢিমেতে তালায় চলছে।

অনুপের সারা শরীরের খেলা করে বিদ্যুৎ। অতসী মরেনি ও বেঁচে আছে। অনুপ উপুড় করে শুইয়ে দেয় অতসীকে। ওর হাতে আবার ভর করে অসুরিক শক্তি। শুধু একটা আছাড় নিতেই কাজ হল। ওই বাসি ঘায়ের ওপরেই ঠিক যার একটা নতুন ঘা তৈরি হয়েছে। এবার একটা কোঁক শব্দও হয়নি। অতসীর মরে। শরীরে প্রমাণ খোঁজে অনুপ। না কোথাও নেই তির তির, বা থর থর। সটান শুয়ে পড়েছে ও এবার। অতসীকে ও যে মারতে চেয়েছিল তার সবচেয়ের বড় সাক্ষীটাই রয়ে গেছিল এতক্ষণ। সারা রাত জুড়ে এক হাত দূরত্বে বসেও কেউ টের পায়নি ওরা। অপরাধের একমাত্র সাক্ষীকে সরিয়ে দিয়ে অনুপ সোজা হয়ে দাঁড়ায়--

গরমিল

আমি মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমার বিদ্যালয়ের পরিচয়ই আমার পরিচয়। আমি বধির। বধির শব্দটা অবশ্য ভান—উপহাসের হাসি চাপা দেওয়া আঁচল। সোজা কথায় আমি বোবা। এই শব্দটাই অহরহ সারা শরীরে বিঁধছে আমার। মানুষ কি কেবল শব্দ তুলেই কথা বলে? তার চোখ কথা বলে না? মুখভাব বলে না? যারা আমাকে চেনে, তারা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার বোবাত্বের স্বীকৃতি জানায়। দিনে যদি কুড়িবারও দেখে, কুড়িবারই জানায় তারা। ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে, কপাল কুঁচকে। আর যারা অপরিচিত—অবশ্য আমি লোকের কাছে বেশীক্ষণ অপরিচিত থাকি না, আমার পরিচয় জানতে বেশী সময় লাগে না। বিধাতার ওয়ার্কশপই লেবেল সেঁটে ছেড়েছে আমায়। তাই একবাক্যে নয়, এক কথায় নয়, এক শব্দেই চিনে ফেলে সকলে আমায়। চিনে ফেলার পর কেউ কি আর তার চোখের উপচে পড়া চিকচিকে ভাবটা লুকতে পারে?

বোবা হাবা। হাবা শব্দটা বোবা শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বোবা হলে হাবা হওয়া এতটাই স্বতঃসিদ্ধ যে বোবার সঙ্গে হাবা জুড়ে আছে সব সময়। আমার হাবাত্ব কিন্তু বোবাত্বকে ছাড়িয়ে গেছে আমাদের বাড়ির লোকের কাছে। আমি যে নিদারুণ একজন হাবা সেটা ওরা জেনে ফেলেছে। মা দুঃখে ক্ষোভে খান খান, বাবা বিরক্তিতে চুর চুর।

আমি জন্মলগ্নেই বোবা। আমার যখন মাস তিনেক বয়স তখন মা-ই প্রথম টের পেলো তার এতো প্রত্যাশিত প্রথম সন্তানটি কালা। হাওয়ায় মাঝে মাঝেই দরজা দড়াম দড়াম করে বন্ধ হতো, কিন্তু আওয়াজে আমি শিশু চমকাতাম না। নিজে চমকালাম না বটে তবে চমকে দিলাম আমার মা বাবাকে। আঁতকে উঠলো তারা। —আরে এ তো। —কি কি বিশেষণ তখন ব্যবহার করেছিল তারা তখন তা আর আমি কি করে শুনবো?

শুনবো, শুনবো এই ক্রিয়াপদটি হয়তো আমার এক্তিয়ারের বাইরে। যার কানের পর্দায় বড় রকমের একটা ছিদ্র নিয়ে জন্ম হয়েছে, তার পক্ষে হয়তো শোনার অহমিকা অশোভন। ঠোকাঠুকিতে যে শব্দ তৈরি হয়, সেই শব্দ বায়ুতরঙ্গে বয়ে এসে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে আঘাত করলেই যদি শোনা হয়, তবে মানতেই হবে সেই শোনা আমি কখনই শুনিনি। ঠোঁট নাড়া দেখে কথা বুঝবার শিক্ষা আমি পেয়েছি আমার সেই মূকবধির বিদ্যালয়ে। কিন্তু সে আর কতটুকু? ছোটবেলা থেকে মানুষের মুখের সামান্য অভিব্যক্তি দেখেই আমি স্পষ্ট তার মনের ভাষা শুনে ফেলি। আমার ধারালো চোখের দৃষ্টি দিয়ে অন্য মানুষের চোখ চিরে বার করে ফেলি তার মনের অতলস্পর্শে যে কথাগুলো বুদবুদ করছিল। আমার দৃষ্টি দিয়ে, আমার স্পর্শ দিয়ে, আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে আমি পৃথিবীর শব্দ লেহন করি। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। দু'সারি লাইন পাতা। এক লাইন দিয়ে যখন রেলগাড়িটা ছুটে যায় তখন আরেক ধারের লাইনে আমি পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। গাড়িটা ছোটার সময় চাকার

তলা থেকে হাওয়ার স্তম্ভ তীর্যকভাবে পাক খেয়ে ওঠে। শুকনো পাতা চারধার থেকে উড়ে এসে ঘুরপাক খায় সেই আবর্তে। শরীরে যেন মাদকতা ছড়িয়ে যায় আমার, রক্তস্রোত শরীরে একই ছন্দে দোলা দেয়, লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দূর থেকে যখন রেলগাড়ী দেখি কই তখন তো এমনটি অনুভব করি না। তবে নৈকট্য আমার শরীরে কিসের সাড়া জাগায়? শব্দের? না, অন্য কিছুর? রাত্রিতে যখন বৃষ্টি পড়ে, আমি ঠিক টের পাই। জানলার ভেতর দিয়ে হঠাৎ গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলোমেলো করে দেয় আমার চুল। আরামে চোখ বুজে আসে। আস্তে আস্তে বৃষ্টির ছাট শরীর ছোঁয়, মুখ ভেজায়। আমার মনের ভেতরে একটা শান্ত ভাব জাগে। সারাদিনে যে রাগ, যন্ত্রণা, ক্লেদ শরীরটাকে ব্যথায় বিদীর্ণ করে, বৃষ্টির মৃদু স্পর্শ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সব। বৃষ্টির সঙ্গীতের মূর্ছনা ধরা পড়ে আমার স্নায়ুতন্ত্রীতে। এই রিনরিন করা ব্যথা, এই ভালোলাগায় টন টন করা মন কি শুনতে পায় না তবে বৃষ্টির শব্দ?

কোন শব্দটা আমি শুনি না। শোনা কথাটায় যদি আপত্তি থাকে তবে আমি পালটে না হয় অনুভব কথাটাই ব্যবহার করবো। লোহার গেট যখন ঝনঝন করে খোলে, আমার হৃদ্‌পিন্ডটা হঠাৎ ধক্ করে ওঠে। মেঝেতে বসে আছি, পিছন থেকে যদি কেউ চলে যায়, মেঝের ওপর রাখা আমার হাত কিন্তু ঠিক ধরে ফেলে পায়ের ধুপ্‌ধাপ। প্রত্যেক আওয়াজের অনুষঙ্গে ধন্যাত্মক শব্দ সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিধ্বনি হয় আমার বুকে। আলাদা নামের আলাদা শব্দগুলোর পরিচয় আমি জানি।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের শব্দ আমি শুনি, মানুষের মনের রহস্যের কথা আমি শুনি, শুধু শুনি না কোলাহল, চিৎকার আর গঞ্জনার ভাষা। প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্তে সেই না শোনার জন্য ধিকৃত হই, লাঞ্ছিত হই। আর যখনই ধিক্কার ও লাঞ্ছনা মাত্রা ছাড়ায়, তখন মূক আমি সশব্দে ফেটে পড়ি। ভাষা নয়, শুধু বিকৃত একটানা শব্দ জগতে ছিট্‌কে পড়ে নরক গুলজার করে তোলে।

জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি আমি যেন একটা মজা উপভোগের যন্ত্র। আমাকে খেপিয়ে, আমাকে রাগিয়ে লোকে বেশ মজা পায়। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসতো, ঠ্যালা দিতো। হাতও তুলতো মাঝে মাঝে। আমি যেন একটা ইয়ার্কির উত্তেজক। তাও আমি যেতাম, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গের বড়ো মোহ ছিল আমার। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই ওদের মজা করার মধ্যে ঢুকলো নিষ্ঠুরতা। তাও সহ্য হতো, কিন্তু আমার অসহ্য ছিল ওদের তাচ্ছিল্য। ওদের ইচ্ছে হলো হাসিঠাট্টা করলো আমায় নিয়ে। আবার অনীহা হলেই দূর দূর করতো আমায়। আমি সরিয়ে নিলাম নিজেকে। ইতিমধ্যে বাবা আমাকে মূকবধির চিহ্নিত ইস্কুলটাতে ভর্তি করে দিয়েছে। বেশ কঠিন পরিশ্রম করে লিখতে শিখলাম, পড়তে শিখলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বাবা আমাকে ওই ইস্কুলে ভর্তি করেছিল, সেই উদ্দেশ্যেপূরণ হলো না। স্বাভাবিক বোল ফুটলো না আমার মুখে। অথচ অনেক ছেলেমেয়ে কিন্তু আমার থেকে অল্প আয়াসেই বেশ খানিকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলো। আমি যে লিখতে শিখলাম, পড়তে শিখলাম সবই নিরর্থক হলো তাই। বাবা বললো—

হতভাগা। এই হতভাগা শব্দটা আমি বইয়ে পড়ে ফেলেছি তখন। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাবার তিরস্কারের মুখভঙ্গিতে শব্দটাকে তাই দেখলাম। আমাদের এক মাস্টারমশাই একেবারে বাতিলের খাতায় ফেললেন না আমায়। আমি যে বই পড়তে পারি এবং সেটাও যে চর্চার যোগ্য, ইস্কুলের সেই স্যার প্রথম বোঝালেন আমায়। হাত পা ঘুরিয়ে বোঝাবার প্রদর্শনীতে না গিয়ে আমার পাঠযোগ্য গাদাগাদা বই শুধু সরবরাহ করে বোঝালেন। আমি বুঝলাম। আমার খুব ইচ্ছে ছিল স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের মতো স্কুলের পরীক্ষার পাশ করি, কলেজের চৌকাঠ ডিঙাই, বিশ্ববিদ্যালয়েও উঁকি মারার স্বপ্ন ছিল মনে। কিন্তু ওই যে, গোড়ায় গলদ আমার সব ব্যাপারে। কথা বলাটা একদম স্বাভাবিক হলো না আমার। জড়ানো, বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ। তাই বাবা মা আমার সম্পর্কে সব উচ্চাশা মন থেকে উপড়ে ফেলেলো চিরকালের মতো। বছর পাঁচেক ইস্কুল ঘষটে অন্যের ঠোঁট নাড়া দেখে কথা বুঝতে শিখলাম, কিন্তু নিজের কথা বোঝাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারলাম না। বইয়ের জগতে ডুবে গিয়ে অনেক জানার রাস্তাটা জেনে ফেললাম। তারপরে তো সেই পথ ধরে শুধু এগনো। ভাগ্যের পরিহাসটা এখানেই। অন্তর্জগতে আমার যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেলো, কেউ জানলো না। আমার পরিবারের লোকেরা অর্ধশিক্ষিত। বাবার একটা বই বাঁধাইয়ের দোকান আছে। তার বিদ্যার দৌড়ে সে কলেজের দরজায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর মা? মা গৃহবধু—ইস্কুলের গোটা কতক ক্লাস বোধহয় টপকেছিল। শিক্ষাগত এই যোগ্যতা নিয়ে ওরা বোঝে শিক্ষিত হলে সে বড় চাকরি করে, অনেক মাইনে পায়। কিন্তু যে শুধু বাপের হোটেলে খেয়ে অন্ন ধ্বংস করে, ঘরের কোণে বসে বই পড়ে আর হিজিবিজি লেখে, অথচ এক পয়সা রোজগার করে না, তার মতো মূর্খ আছে নাকি জগতে দুটো? তার ওপরে বোবাহাবা। ওরা ধরেই নিয়েছে এগুলো আমার পাগলামির লক্ষণ। আমার জ্ঞানচর্চাকে দেখে ওরা আমার জড়বুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। যে দুটো লাইব্রেরী থেকে আমি বই নিই, সেখানে মেম্বরশিপ পেতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছি। আইনগত কোন বাধা নেই, ফর্মের অনুমোদনের জায়গায় সইও জোগাড় করেছিলাম আমি। তবু—এই তবুর বেড়াটা ভাঙতে সময় নিলো কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন। প্রতিবন্ধীকে একটা বাড়তি সুযোগ দেওয়া যাক্—ঔদার্য প্রকাশের এই সুযোগটাই হাতছাড়া করতে পারলো না ওরা শেষ পর্যন্ত। আমার এই মামাবাড়ির আবদারে লাইব্রেরীর কর্মচারীরা বেশ ক্ষুণ্ণ। অনিচ্ছুক হাতে বই ইস্যু করে। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। হিসাবের খাতায় আমি বাতিল। আর এইখানেই আমার জ্বালা। শুধু মানুষ কেন? ভগবানও আমাকে বেশ একটা ঠাট্টার যোগানদার ভেবেছে। যাকে নিয়ে আমি পলে পলে হিংসার বারুদে ফাটছি, জ্বলছি, পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি, আমার সেই প্রতিদ্বন্দীটিও কিন্তু আরেক প্রতিবন্ধী। হিংসা করার জন্যও আমার একজন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ জুটলো না। ও অন্ধ। হায় স্পর্শ-শব্দ-গন্ধময় পৃথিবীকে পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারি না। আমরা বঞ্চিতের দলে। সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্তে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে মুঠোমুঠো লাল আলো। সাদা, নীল, কালো মেঘ বিশাল আকাশের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তোলে মাটির প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া। কখনো ওই নীলবর্ণ মেঘপুঞ্জকে সমুদ্র ভেবে বসি,

কখনো বা পর্বত শিখরের তুষারের গায়ে সূর্যের আলোর চিকচিকানিই যেন মেঘের স্তরে স্তরে জ্বলজ্বল করে। ভাই দৃষ্টিহীন, তাই ওকে সামনে বসিয়ে প্রকৃতি ওর অজান্তেই নানা বর্ণে, নানা রূপে নিজেকে সাজায় আর মুখ টিপে হাসে। ও বোঝে না। ভাষাহীন দৃষ্টি মেলে রাখে। আর আমি? আমি শব্দ শুনি না। বিশেষ করে শুধু সেইজন্য আমার কোনোও দুঃখবোধ নেই। কিন্তু পৃথিবীর লোক আমার সেই ঘাটতির কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানিয়ে আনন্দ পায়। সেটাই আমার সব অভাববোধের মূল। জগত জানে চোখই অমূল্য বস্তু। কিন্তু এ সবই কেতাবী কথা বা শুধু কথার কথা। আমার জীবনের প্রতিক্ষণের যে মর্মান্তিক জ্বালার হিসাব আছে। মোড়ক খুলে খুলে দেখাতে ইচ্ছে করে আমার। কোথায় সেখানে দৃষ্টিহীনের মূল্যহীনতা আর দৃষ্টিবানের মূল্য?

আমাদের বাড়ির মূল যে জীবনস্রোতটি আছে সেখানে আমি সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। কারণ আমি বোকা, আমি পাগলাটে। কিছু বললেই আমি হাউ হাউ করে চিৎকার করে সমস্যাটাকে বাড়িয়েই তুলি। এগুলো ওদের বক্তব্য। অথচ আবার ছোট ভাই শান্ত, নম্র, আস্তে আস্তে মতামত জানায়। ওর যুক্তিও নাকি অকাট্য। কিন্তু আমারও যে যুক্তি আছে, ঝুড়ি ঝুড়ি ভালে কথা আছে, ধৈর্য ধরে বুঝতে চেষ্টা করলে হয়তো আমি একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হতে পারতাম। কিন্তু ওই যে, আমার সব কিছুতেই গোড়ায় গলদ। কথা বলতে শুরু করলেই যে সবাই ওরা কুকুরের ডাক শোনে। তারপরে আর কে ধৈর্য ধরতে চায়? কে গালে হাত দিয়ে অপেক্ষা করতে পারে কখন গরল থেকে উঠে আসবে অমৃত। তাই আমি ফ্যালনা, আমি অচল। অর্থনৈতিক সমস্যা, রোগ-জ্বালার সমস্যা, বাড়িওলার সমস্যার আলোচনা চলে ভাইকে ঘিরে। ও বলে, ওরা শোনে। ওরা বলে, ও শোনে। এই সত্যটা আমি সার জেনেছি যে কথাই হলো মানুষের প্রধান হাতিয়ার।

কথাবার্তার মাধ্যমেই আদানপ্রদান হয় পরস্পরের মানসিকতা, গড়ে ওঠে মানবিক সম্পর্ক। কথা যদি না থাকে তবে কিসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে সম্পর্কটা? স্বাভাবিক কথাবার্তার বিপরীত শব্দ কিন্তু নির্বাকতা নয়। কারণ নির্বাক হলে অন্তরের ভালবাসায় চোনা পড়ে দূষিত হয় না। সহানুভূতিতে ভালবাসায় হৃদয়ে হৃদয়ে টান ধরে। কিন্তু কেউ যদি কথাবার্তার জায়গায় বিকট শব্দ করে? তবে তখনই ভালবাসার সমুদ্র শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়। বিধাতার হাতে গড়া রক্তের সম্পর্কও আর্দ্রতা হারায়। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আমার নাম ভোলা। ভোলানাথ। ভাইয়ের নাম সোম। সোমনাথ। নামান্তে নামের সাদৃশ্য দেখে কেউ যদি ভেবে বসে মা-বাবা অনেক ভেবেচিন্তে দুই ভাইয়ের নামকরণ করেছিল তবে সেটা খুব ভুল করবে। আমার নামের গোড়াটা আগে এসেছে। ভাইয়ের নামকরণ হওয়ার বছর দুয়েক বাদে নাথ শব্দটা লটকে দিয়েছে ওরা আমার নামের শেষে। হাবাগোবা আর বোবার ভোলা ছাড়া আর কি নামই বা কল্পনা করা সম্ভব? তাই ভোলা। মুখটাকে ছুচলো করে তারপরে বিকট একটা হাঁ করলেই আমি আমার নামটাকে সকলের মুখে এক লহমায় চিনে ফেলি।

বোবা ছেলে জন্মাবার পর মা শিবের আরাধনা করেছিল একটা সম্পূর্ণ সুস্থ সন্তানের জন্য। ফল। অন্ধ ছেলে। অথচ আশ্চর্য অন্ধ ছেলে দেখে মা দুঃখে বিগলিত হলো, নিঃশব্দে চোখের জলে বুক ভাসালো, কিন্তু ক্ষণিকের তরেও বিরক্ত হলো না। বাবা এসে ছেলেকে কোলে নিত, আলতো করে হাত রাখতো ছেলের দৃষ্টিহীন চোখের ওপর বা চোখের জায়গায় যা শুধু অন্ধকার। আঁখিপল্লব আছে কিন্তু পল্লব দিয়ে আড়াল করার কিছু নেই। বাবা নিঃশব্দে বসে থাকতো কিছুক্ষণ, তারপর ওকে শুইয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো আকাশের দিকে। ঈশ্বরপ্রদত্ত আঘাতটা যখনই অন্তঃস্থলে গভীরভাবে নাড়া দিতো, ঈশ্বরের বাসস্থানের সীমানার দেওয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেই আশ্বাস খুঁজতো মনে হয়। বাবার বেদনাঘন সেই দৃষ্টি আমি দেখেছি। লোভীর মতো, চোরের মতো আড়াল থেকে দেখেছি, কারণ আমি জানতাম আমার দিকে চোখ পড়লেই দৃষ্টির ভাষা বদলে যাবে। আকাশ থেকে চোখ নামবে মাটিতে। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। তখন বুঝিনি, অনেক অভিমান বুকে জমিয়েছি, কিন্তু আজ বুঝি। আমাকে কাছে টানার, আদর করার কোনো উপায় ছিল না তাদের। ভালবাসবে কাকে? আদরের ডাকে যে সাড়া দেয় জানোয়ারের ভাষায়। শিশু বয়সেও আমার এমন বিদ্‌ঘুটে স্বর ছিল।

দৃষ্টিহীনতার কোনো বিকৃতি নেই। চোখের পরিবর্তে অন্ধকার ছায়া। দেখতে একটু খারাপ লাগে বটে। কিন্তু মনে ধাক্কা লেগে কোনো ঘৃণার ভাব জাগে না। মনে হয়, আহা। আর কিছু বড় হওয়ার পর থেকে তো ওইটুকু কু ও লুকিয়ে ফেললো ও। সারাদিন কালো চশমায় ঢেকে রাখতো ওর বিকল অঙ্গ। কালো চশমাটা ওর মুখমন্ডলে যেন এক আলোর সংযোজন। এনে দেয় গভীর এক মাত্রা। বড় ভালো লাগে ওকে, বড় ঐশ্বরিক। পৃথিবী অন্ধের সামনে একটা অন্ধকার গোলক। তার অন্ধত্বে কোনো মানুষের কোনো অসুবিধা নেই। চলতে গেলে ঠোকা খায় ও নিজে। হোঁচট খেয়ে রক্ত ঝরায় ওর শরীর। তাই ওর প্রতি মমতা।

কিন্তু বোবা? দেখে, স্বাভাবিকভাবে চলে, ভরপেট খায়। কোথাও কোনোও নিজের অসুবিধা নেই। শুধু কিম্ভূতকিমাকার শব্দ করে লোকের পিলে চমকানোটাই ওর কাজ। আমি এও বুঝি নিজে শুনি না বলে স্বরযন্ত্রটাকে চেপে ব্যবহার আমি করি না। করি না, নাকি করায় শক্তিই নেই আমার সেটা কোনোদিন খতিয়ে দেখিনি।

সোম খুব সুন্দর গান করে। মা বাবার মুখের প্রশান্তি সেই কথাই বলে। ওর বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আছে। ওর ওপর সহানুভূতির জন্যই ওর কাছে শেখে কিনা জানি না, তবে ওর রোজগার হয় দুপয়সা। ও রোজগার করে, সুন্দর করে, স্বাভাবিকস্বরে গুছিয়ে বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে। সংসারের দুঃখে-সুখে এক হয়। আমার জন্যও বাবা দু'একটা কাজের খোঁজ এনেছিল। কাজগুলো একজন অশিক্ষিত বোবার উপযুক্ত। আমার রুচিবোধে বাঁধল। আমি রাজী হলাম না। সোচ্চার বিকৃত সুরে অমত জানালাম। ওরা আমার 'না'টা বুঝলো, রাগে ঝলসে উঠলো। বুঝলো না প্রস্তাবগুলোই কতো অসম্মানের ছিল আমার কাছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন সন্তানের ওপর কি আর নির্ভরশীল হওয়া চলে? তাই ভাইয়ের ওপরই ওরা নির্ভরশীল।

বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে ও বেশ স্বাবলম্বী। খুব একটা বাড়ির বাইরে বেরয় না। বেরলেও পাড়ার চৌহদ্দির মধ্যে। সবাই ভালবাসে ওকে। হাত বাড়িয়ে পৌঁছে দেয় যেখানে ও যেতে চায়। এ কথা সত্যি ও খুব ধীর, স্থির, সংযত। কিন্তু আমার মনে হয় কালো চশমা দিয়ে ঘেরা ওর অন্ধ চোখদুটোই যেন ওকে আরো বেশী ভালবাসার পাত্র করে তুলেছে।

ওর উপস্থিতিই এখন আমার সারা শরীরে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়। ছোটবেলায় কিন্তু অবোধ অসহায় এই ভাইটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। আমি লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ফুল আঁকতে খুব ভালবাসতাম। আর আমার আঁকার সরঞ্জাম মানে ক্ষয় হয়ে যাওয়া কয়েকটা মোম রঙ আর সাদা দুচার টুকরো কাগজ, হাতে ধরতে পেলেই ও খেলতে চাইত। কিন্তু ও কিছুটা বড় হবার পর থেকে আমি এই সুন্দর ফুলগুলো আর কোনোদিন আঁকিনি।

সোমও ভালবাসতো আমাকে খুব। ও এখনও বাসে। আমি বুঝি । মা-বাবার কাছে খুব বকুনী খেয়ে আমি যখন অসহ্য রাগে দাপাদাপি করি, বিকট স্বরে চেঁচাই, তখন ও একাধারে চুপ করে বসে থাকে। কখনও কখনও দু'হাতে মাথা ধরে নিস্পন্দন হয়ে যায়। তখন অবশ্য ওর এই নিস্পন্দনতাকে ভালোমানুষির ভেক্ বলে মনে হয় আমার। রাগ আরো চড়ে, গলা ওঠে সপ্তমে। দুমাদুম্ চলে শব্দের গুঁতোগুতি। আমি শান্ত হয়ে গেলে ও আমার কাছে আসে। একা। আমার পিঠে হাত রাখে। ওর অন্ধ চোখদুটো দিয়ে চোখের জলের ধারা নামে। চোখদুটো সম্পূর্ণ অকেজো নয়। বহিরিন্দ্রিয়ের কাজটা করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের কাজে ও সক্রিয়। এই সময়টুকু ওকে আমি একা পাই। কারো ভালবাসায় মাখো মাখো নয়। ও তখন শুধু একজন বধিরের এক দৃষ্টিহীন ভাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে দু'ভাইয়ের চোখ দিয়ে ঝরে যায় ক্ষোভের কান্না, ভালাবাসার অশ্রু। কিন্তু পরের দিনই যখন সবাই ওকে টেনে নিয় যায় স্বাভাবিক জীবনের মূলস্রোতে যার ধাক্কায় আমি সরে যাই জীবনের একপাশে, আমার কপালের শিরা আবার দপ্‌দপ্ করে।

প্রেম ট্রেম আমি করিনি। আর করবো এমন কোনো পরিকল্পনাও আমার মনের কোণেও আসেনি কোনোদিন। কিন্তু সোমের জন্যই ঘটল ব্যাপারটা। ও তো আমার সব দুঃখজ্বালা, হিংসাদ্বেষ আর ক্ষোভের উৎস। তাই প্রেমটা আমার মোটেও মানসিক কোনো আনন্দ বা আর্তির ফলশ্রুতি নয়। প্রেমের মূলেও আমার আকণ্ঠ হিংসা।

সোমের ছাত্রীদের মধ্যে তপতী একজন। সাদামাটা। কালো, রোগা, বেশ বদখতই দেখতে। ও আমাকে করুণা করে, আমিও অনুকম্পা করতাম ওকে। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম মেয়েটা বেশ সেজেগুজে আসতে শুরু করেছে, বেশ গদগদভাব। বুঝলাম মজেছে ও সোমের প্রেমে। হল্‌কা লাগলো শরীরে। অন্ধ হয়ে ও সব পাবে, এমনকি একজন মেয়ের প্রেমও।

প্রেমটা কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একজনের রূপ বা গুণের প্রতি মুগ্ধভাবই প্রেম সৃষ্টি করে। যে সৌন্দর্য চোখে সবচেয়ে প্রিয় বা যে গুণ বা স্বভাব সবচেয়ে বেশী আমার মনোহারিত্বের কারণ, তারই কোনো কিছুর অস্তিত্ব দেখলে বা কারুর মধ্যে আবিষ্কার করলে

প্রেমে পড়ি আমরা। প্রেমে কেউ পড়ছে অর্থই হলো যার প্রেমে পড়েছে তার রুপ গুণের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিই তবে পেলো ছেলেটা? হোক না মেয়েটা কুৎসিত, হোক না মামুলি। সোমনাথের অহংকারের সৌধ গড়ে উঠলো। কিন্তু এ সৌধর আবরণ তো সে উন্মোচিত করেনি যে তখনই গুড়াতে বসবো হাতুড়ি মেরে। আর এত কুৎসিতেরও প্রেমের আবার মূল্য কি? তাও আড়েঠারে সোমের গর্ব ভাঙার তোড়জোড় করলাম আমি। সোমনাথ মৃদু স্বরে বললো একদিন- কুৎসিতের আমি কি জানি। সুন্দরই যে জানেনা সে আর কুৎসিত কি জানবে? ওর কথায় জ্বলে গেলো ভেতরটা। আরে ওর অন্ধত্বই তো জয়ের মালা দোলালো ওর গলায়। সৌন্দর্য নয়, ভালবাসার সৌরভই তো ওর প্রয়োজন। আর সহ্য হলো না। উন্মত্ত হলাম আমি। তপতীকে আমার চাই। কিছুতেই সোমকে সব পেতে দেওয়া যায় না। আমার জীবনের সব সুখের খনিগুলো ও দখল করেছে। ওকে বেদখল করবো আমি। অধিকারচ্যুত হতে কেমন লাগে দেখুক ও। বুঝুক বেহাত হবার জ্বালা। তপতী যে কুৎসিত আমি ভুলে গেলাম, তপতীর দিকে যে আগে ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে হয়নি তাও মনে রইল না। বিস্মৃত হলাম সব। শুধু মনের ভেতর তপতীকে কেড়ে নেওয়ার আকাক্ষা দাউ দাউ করে জ্বললো। তপতীকে ছিনিয়ে নেওয়া মানেই সোমকে জব্দ করা। ওর এই শান্ত, সমাহিতের খোলসটা খসে যাবে। আঁতে ঘা লাগলেই বীভৎস হবে, বিকৃত হবে ও।

চিরদিনের শত্রুর শত্রুতা করবো বলে স্থির করে ফেললাম। রাগের মাথায় ফন্দী আঁটলাম। ভাবলাম প্রেমিকের কুরুপ তো প্রেমিকা দেখতে পারে। সেদিন শনিবার ছিল। মাসখানেক হলো শনিবার বিকেলটা সোম ওকে একাই শেখায়। আমি দরজার শিকলটা তুলে রেখেছিলাম আগে। আর দরজার রাস্তায় একটা ছোট টুল। আমি জানতাম দরজায় ঠক্‌ঠক্ হবে। তৎপর থাকবো আমি। ঝট্ করে খুলে দেবো দরজাটা। আস্তে। সোম তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়ে হোঁচট খাবে। টাল সামলাতে পারবে না। ছিটকে খুলে পড়বে কালো চশমাটা। যে আবরণ ওর দৃষ্টিহীনতাকে রহস্যময় মোহময়তায় আবৃত করে রেখেছে, সেটা খুলে পড়লেই অন্ধকার গর্ভ দুটোর বিকৃত চেহারায় শিউরে উঠবে প্রেমিকা। বিকলাঙ্গের এই খামতিটুকু নির্মোহ চোখে বীভৎস হয় তো নয় কিন্তু মোহমুগ্ধ চোখ সহ্য করতে পারবে না অঙ্গের এই বিকৃতিটুকু। ঘটনার আকস্মিকতার জন্যই বড় বেশী আঁতকে উঠবে তপতী। তপতীর মনে বিতৃষ্ণা জাগানোই আমার প্রথম চাল, হয়তো বা প্রধান চাল।

ছক অনুযায়ী ঘটল ব্যাপারটা। কিন্তু শেষটাই গোলমাল করলো সব। আমার জীবনের সব ক্ষেত্রে গোড়ায় গলদ কিন্তু শেষ ঘটনাটা হলো উল্টো। গোড়া ঠিক্‌ঠাক্ কিন্তু অন্তে গলদ। সোম তাড়াতাড়ি এগলো। দরজা খুলতে গিয়ে হোঁচটা খেলো আর কালো চশমাটা ছিটকে পড়লো (যেটা নিয়ে আমার ভয় ছিল যে হয়তো নাও খুলে পড়তে পারে)। আমি দরজা তো ইতিমধ্যে টুক্ করে খুলেই ফেলেছি। তপতী ঢুকলো। আঁতকেও উঠলো। কিন্তু প্রেমিকের বিকৃত রুপটার আবিষ্কারে না। মাটিতে শায়িত অচৈতন্য প্রেমিককে দেখে। কি যে হলো হতভাগাটার। অন্ধ মানে কি তুই এতোই বেসামাল যে হোঁচটা খেয়ে পাশে রাখা আলমারীতে মাথাটা ঠুকলি আর অজ্ঞান হলি।

গোড়ায় গলদ নিয়ে আমি এতো ভুগেছি কিন্তু শেষের গন্ডগোলটা যে আরো মর্মান্তিক সেটা বুঝিনি।

কাল থেকে সোমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যে চোখদুটো আমি ওর প্রেমিকাকে দেখাতে চেয়েছিলাম, ইচ্ছে করেই যেন চোখের পাতাদুটো ঠেসে বন্ধ করে আড়াল করে রেখেছে ও সেই চোখদুটোর বিকৃতিকে।

ওর অজ্ঞান হয়ে যাওয়া দেখে মা বাবা তো দিশেহারা। আমিই তখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ছুটে গিয়ে জোগাড় করলাম গাড়ি। কারুর সাহায্য না নিয়ে একাই পাঁজাকোলা করে তুললাম ওকে গাড়িতে। হাসপাতালে ভর্তি করালাম। আর তারপর থেকে ঠায় বসে আছি হাসপাতালের বারন্দায়। যে ওষুধ, ইনজেকশন্ দরকার হচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনছি, আবার বসছি এসে বেঞ্চে। মা বাবা এসেছিল সকালে একবার। কিছুক্ষণ থাকার পর আমিই ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বাস স্টপেজ অবধি গেলাম ওদের সঙ্গে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো আমার হাত দুটো। আমি মার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলাম মার দুর্বল রোগাটে দুটো হাত। পরম নির্ভরশীলতায় মার হাত দুটো ঢিলে হয়ে নেতিয়ে পড়লো। আমার হাতের মধ্যে। যে দৃষ্টিতে ছোটবেলায় বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আমি লক্ষ্য করলাম বাবার দুটি চোখ সেই দৃষ্টি নিয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠলাম। সোম কি তবে নিজের জীবন দিয়ে আমার শরীর থেকে বাতিল মার্কাটা তুলতে চায়। ইচ্ছে হলো আমি আবার বিকৃত স্বর তুলে হাউ হাউ করে বাবা মার এই অকৃতজ্ঞতায় ধিক্কার দিই। কিন্তু কান্নায় তখন আমার গলা বুজে গেছে। আমি যে মূক আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম।

পালাবদল

এলগিন রোডের ক্রসিংটা পেরোবার পর থেকেই বাঁদিকে ঘেঁষে গাড়ীটা চালাবার জন্য ঝট্ করে শরৎ বোস রোড থেকে সার্কুলার রোডে ঢুকে যাওয়ার মুখে ট্রাফিক পুলিশের হাত এড়িয়ে গেলেন সুজয় মজুমদার। মিনিট তিনেক ধরে গাড়ীর গতি একদিকেই ছিল, যে কোনো মুহূর্তে অবরুদ্ধ হবে এই প্রবাহ। কলকাতার ট্র্যাফিক জাল ভেদ করতে হলে আইনমাফিক চলতে গেলেই বিপদ। দাঁড়িয়ে থাকো যেখানে আছো, ফ্যালফ্যাল করে দ্যাখো সবাই চললো এগিয়ে। এপাশ ওপাশ করে দুর্ভেদ্য ব্যূহ কাটিয়ে গাড়ীটা বাঁদিকে ঢোকাতে সুজয় মজুমদার টের পেলেন হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে। পুলিশটির অভয়দানের ভঙ্গিমার হাত ওঠানো।

হোটেল হিন্দুস্থানের বাঁদিকের গেট দিয়ে সুজয় মজুমদারের শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ীটা রাজহংসী চালে বাঁক নিল। নিজেই গাড়ী চালান তিনি। মাইনে করা চালক চালিত যানে কেমন যেন অনীহা বোধ করেন। কাজের ঝক্কির জন্য অবশ্য অফিসের ড্রাইভারেরা বাদেও তার ব্যক্তিগত একজন আছে, কিন্তু তার হাতে আর ছাড়েন তিনি কতটুকু। কলকাতার রাস্তায় গাড়ী চালানোতে পদে পদে ঝুঁকি আর ঝামেলা, বিরক্তিও আসে মাঝে মাঝে, তবু নিজের পথে নিজেকে চালাতে অন্য লোকের সহায়তা পছন্দ করেন না তিনি। স্বাবলম্বী পুরুষ। শশব্যস্ত দারোয়ান গাড়ীর দরজা খুলেই লম্বা সেলাম ঠুক্লো একটা। সাহেবের দরাজ হাত। বক্শীস কখনো হিসেব করে দেন না। দ্রুত হাতে গাড়ীটা লক্ করে সিঁড়ি কটা প্রায় টপকেই পার হয়ে গেলেন আটান্ন বছরের যুবক। আজ সময়ের একটু আগেই পৌঁছেছেন তিনি। অন্য দিনগুলো থেকে আজকের দিনটি স্বতন্ত্র। অন্যদিনের মাননীয় অতিথি আজ দায়িত্বশীল হোষ্ট। কলকাতার তো বটেই দিল্লী বম্বে থেকেও বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি আজ এই পার্টিতে নিমন্ত্রিত। দুচারজন বিদেশী অতিথিও আছেন। সাংবাদিকতার জগতে সুজয় মজুমদার এক ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে সাংবাদিকতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে টেনে টেনে বার করেছেন। সাংবাদিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে খুঁজে পেয়েছেন শৈল্পিক স্বীকৃতি। সাংবাদিকের এক্তিয়ার কতটুকু? প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে এসেছে বার বার। নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার? যা ঘটনা তার হুবহু বর্ণনা? অনুদার এই চিন্তাধারাকে কখনোই মানেননি তিনি। সাংবাদিকের ভূমিকা বিশ্লেষকের। ঘটনার ভাঁজ খুলে খুলে ভরে দেয় গবেষকের মন্তব্য, কলমের টানে ফুটিয়ে তোলে সামাজিক মুডটুকু। শুধু রসদের দাবি নয়, রসসৃষ্টিও চাই। কর্মজীবনে ছোট বড় বহু সম্মানে অলংকৃত হয়েছেন সুজয় মজুমদার, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে তাকে শেষ পর্যন্ত পদ্মশ্রী খেতাবটি দিয়ে ফেলবে তা অবশ্য কিছুটা কষ্টকল্পিত ছিল। টেলিভিশনে সংবাদটুকু শুনে শোনার ভুল বলে কেউ কেউ মনে করলেও পরের দিন যখন ছাপার অক্ষরে দেখা গেলো, তখন তো আর নিজের চর্মচক্ষুকে অবিশ্বাস করা যা না। অভিনন্দন জ্ঞাপনের যেন বন্যা বইল। প্রতিপক্ষ দলও স্বীকার করলো সত্যিই লোকটার ক্ষমতা আছে। দিল্লী মহলে প্রভাব খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত

আনলো বাগিয়ে বেশ ভারীসারী খেতাবটা। প্রতিপদে, প্রতিক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের ওপর সুজয় মজুমদারের অপ্রতিহত প্রভাব।

হলের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বোলালেন মজুমদার সাহেব। না, নিখুঁত করে সাজানো সব। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সামনে রাখা সোফাটিতে শরীর এলিয়ে দিলেন কিছুক্ষণের জন্য। এখনও অতিথিরা আসেনি কেউ। দু-একজন বেয়ারা ব্যস্ত টুকিটাকি কাজে। ঘড়ির দিকে তাকিয়েই ছড়িয়ে থাকা শরীরটাকে টান করে উঠে দাঁড়ালেন ভারতবর্ষের প্রচার মাধ্যমের মধ্যমণি। মনে মনে কিছুটা অস্থির হয়ে ওঠেন মিঃ মজুমদার। সময়ের দামটা কিছুতেই বোঝে না এই দেশের লোকগুলো। কার্ডে স্পষ্টই লেখা ছিল ঠিক আটটায় সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। তিনি যে আজ শিখরে উঠতে পেরেছেন তার পেছনে রয়েছে তার অসাধারণ সময়জ্ঞান। পেছন ফিরে তাকালে আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে মন। বুক স্ফীত হয় আত্মগর্বে।

আসুন, আসুন হাত বাড়িয়ে মিঃ বোসের সঙ্গে করমর্দন করেন। মিঃ বোস এক সময় তার বস ছিলেন কিন্তু সুজয় মজুমদারের উল্কাগতির শ্রীবৃদ্ধিতে আজ তিনি কিছুটা পিছিয়ে আছেন। মিসেস বোসের দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকান সুজয় মজুমদার।

সত্যিই আমার সৌভাগ্য ম্যাডাম আপনি উন্মোচন করলেন যবনিকা।

আমার অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পাইনি, তাই দেরিতে হলেও—

না, আর লজ্জা দেবেন না প্লীজ—একটু প্রায় জোর গলাতেই মিসেস বোসকে থামিয়ে দেন তিনি। ঘাড় ঘুরিয়ে সুজয় মজুমদার দেখতে পেলেন বিভিন্ন পত্রিকার কিছু উদীয়মান যুবক সাংবাদিক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। টাটকা আর তাজা এই যুবকদের সত্যিই বড় পছন্দ করে মজুমদার সাহেব।

এসো ভায়া, এসো। হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুকে কাছে টেনে নেন তিনি। তোমরা কিন্তু দশমিনিট লেট। কিন্তু ভালো নয়। সময় বেহিসাবী খরচ করো না।

স্যার, আসার সময় জ্যাম পাননি?

রাত আটটায়ও জ্যাম কলকাতায়। নিরুপমের চোখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। তোমরা জানোই তো এ অনিবার্য। কিছুটা বাড়তি সময় আলদা করে রোখো হে।

হ্যালো মিঃ বাজপেয়ী—সুজয় মজুমদার এগিয়ে গেলেন। শ্রী ও শ্রীমতী বাজপেয়ী, শ্রী ও শ্রীমতী মোহান্তি, শ্রীরাজখোয়া, শ্রীমতী মীনাক্ষী সেন, ডক্টর মুখার্জী ও শ্রীমতী মুখার্জী, গ্রেট মহিমদা, মিঃ উইলকিন্‌সন্‌, ডক্টর হাক্সলি— দেশী বিদেশী সব অতিথিই জমায়েত হলো ধীরে ধীরে। ঠোঁটে চাপা হাসি দুলিয়ে মজুমদার সাহেব সৌজন্য ও ভদ্রতা বিতরণ করে চলেন সমান মাপে।

মিসেস সেন, কি ব্যাপার? বিয়ারতো চলতো আগে, এখন হাতে শুধু নির্দোষ পানীয় যে? শুভ্র শাড়ীতে মোড়া এই ভদ্রমহিলার সামনে এলে কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করেন ব্যাচেলর মজুমদার। মিঃ সেন একজন শিল্পপতি ছিলেন। এখন মিসেস সেনই মৃত স্বামীর গড়ে তোলা ব্যবসা দেখাশোনা করেন। বছর ছয়েক আগে মিসেস সেনের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশ গাঢ়ই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জীবনের দুর্বল মুহূর্তগুলো অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছেন তিনি। মানসিক

আবেগ এড়িয়ে চলেছেন বরাবর। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থই হলো জীবনকে বরবাদ করার জন্য ইঁট গাথা। জীবনের গোড়া থেকেই সময় বুঝে গুছিয়ে রাখার ধাত ছিল মজুমদারের। পরবর্তীকালে দেখেছেন এই অভ্যাসই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। সাংবাদিকতার মূলমন্ত্র হলো চট্‌জলদি কাজ। গড়িমসি করেছ কি গেছো। টুক করে জলটুকু বাদ দিয়ে দুধটুকু তুলে নাও। বিশ্লেষণের জারকে ভেজাও একটু, পরের দিন সাজিয়ে বোরোবে টাটকা গরম সংবাদ। কাগজের কাটতি বাড়বে, বাড়বে সাংবাদিকের কদর।

কেমন বোধ করছেন স্যার? একই জীবনে এতো সাফল্যের ভার, অভিরূপের কৌতূহল আর যেন মেটে না।

খারাপ বোধ করছি না, এইটুকু বলতে পারি। খাচ্ছ না তো কিছুই। খাও দাও, তবেই তো উৎসাহ পাবে কাজ করার। জোর করে একটা ষ্টিক তুলে দেন অভিরূপের প্লেটে।

স্থূলকায় মিঃ বোস ডানহাতের কাজে ব্যস্ত দেখে সহাস্যমুখে সুজয় মজুমদার এগিয়ে গেলেন কাছে। আজকের দিনটা অন্ততঃ আপনার শরীরের চিনির কথা ভুলে যান বোস সাহেব। ফ্রাইড রাইস দুচামচ একসঙ্গে মুখে দেওয়ার জন্য একটু সময় নিলেন মিঃ বোস। আমি জানতাম মিঃ মজুমদার, আমি জানতাম। মিসেস গান্ধীর রাজনীতির যে বলিষ্ঠ সমালোচনা করেছিলেন আপনার বইয়ে। তখনি জানতাম একদিন দুনিয়া তাজ্জব হবে আপনার ক্ষমতায়। অসাধারণ প্রতিভা মশাই আপনার। আর সাহস—বইটা লিখলেন, তাও কিনা এমার্জেন্সীর সময়। দুর্দ্ধর্ষ লেখা। বইটা বাজারে কেটেছিলও খুব। আচ্ছা, সেই সময় শুনেছিলাম সি বি আই আপনাকে—

আরে মহিমদা, আপনার কাছে হাতেখড়ি আমার। সেই আপনার স!ও কি ফর্মালিটি দরকার? ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন মজুমদার সাহেব।

সত্যিই, এই মহিমদার কাছেই ফাইলিংয়ের কায়দা রপ্ত করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় তার অসাধরণ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে তখনই। হর্তাকর্তা ব্যক্তিদের জীবনের খুঁটিনাটি তার ফাইলে কুক্ষিগত। অন্য কাগজ যখন শুধু মৃত্যুসংবাদ ছাপিয়ে পরেরদিনও জীবনী ছাপাবার জন্য হাতড়াচ্ছে দিগ্‌বিদিক, তখন সুজয় মজুমদারের কাগজ প্রথম দিনেই মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাপিয়ে দেয় বিখ্যাত মৃত ব্যক্তিটির জীবন ইতিহাস সবিস্তারে।

মৃত্যুসংবাদে মানুষ তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হয়ে ওঠে মৃত ব্যক্তিটির জীবনী জানার জন্য। যে গণ্যমান্য মানুষটা পৃথিবীর মায়া কাটালো দেখিতো জীবিতকালে সে কি কি কীর্তি করেছিল? এই অদম্য কৌতূহলের জোয়ারে কিন্তু পরের দিন ভাঁটার টান পড়ে। সামান্য কয়েক ঘন্টার ব্যবধানেই মৃত্যুসংবাদটি বাসী হয়ে যায়। আগে থেকে আঁটঘাট না বাঁধলে তাই বাজারের চাহিদার সময় হাত কামড়াতে হয়। নয়তো ভাবা যায় কি অসাধারণ দূরদর্শিতায় তিনি ভারতীয় আমেরিকান নাগরিক সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী রিতু মহারাজের জীবনের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে নিলেন তার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে স্বল্প ইন্টারভিউয়ের অবকাশে। ভারতবর্ষে নৃত্য প্রদর্শন করতে এসেছিলেন তিনি সেবার। কলামন্দিরে অলৌকিক এক নৃত্য পরিবেশনের পর পরই

গ্রীনরুমে বসেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। পনেরো মিনিটে শেষ। শিল্পরী মৃত্যুর খবর যখন ঘোষিত হলো তখনো কলকাতার বাতাসে শিল্পীর ঘুঙুরের মিষ্টি বোলের রেশ। শিল্পীর শিল্পীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের এক পূর্ণা! বিবরণ ছাপিয়ে দিলেন মজুমদার। উদ্বেলিত জনতা শান্তি পেলো।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবই ক্ষণস্থায়ী। ফলটি পাকতে দেখলেই তুলে নাও। পূজার উপাচারে লাগবে কিনা ভাবার দরকার নেই। যখন যে নৈবেদ্যের জন্য যে ফল দরকার, ঝুলি থেকে বার করে দিলেই তো হয়। আড় চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন সুজন মজুমদার। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। লোকগুলোর তো উৎসব ভাঙার কোনো মেজাজ নেই মনে হচ্ছে। কাল সকালেই দিল্লীর ফ্লাইট ধরতে হবে। নিজের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকে একটি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র ও একটি সাপ্তাহিক প্রত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রটি দেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাপ্তাহিক পত্রিকাটির চাহিদা আন্তর্জাতিক। দেশের মধ্যে চরকি কাটা তো বটেই সমুদ্রও পেরোতে হয় বছরে বেশ কয়েকবার। এবার অবশ্য পুরষ্কার গ্রহণের তাগিদেই ডাক পড়েছে। উদ্‌গত হাইটাকে দাঁতে পিষে আটকে দেয় মজুমদার। আজ তাহলে আসি মিঃ মজুমদার। দুহাত জোড় করে মীনাক্ষী সেন স্মিত মুখে বিদায় চাইলেন। সে কিহ্ল এতো তাড়াতাড়ি। রাত্রি তো এখনও যুবক, নাকি যুবতী? স্ত্রীলিঙ্গ যখন। রুমালটা একবার মুখে নিলেন মজুমদার সাহেব।

আমরাও চলি মজুমদার। কালতো তোমার দিল্লী যাওয়ার কথা। ফিরছ কবে? ডক্টর মুখার্জী সিগারেট অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলেন।

ঠিক নেই। আসাটাতো আমার ইচ্ছাধীন নয়। রাজাবাদশার সংস্রব থেকে যত তাড়াতাড়ি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি ততোই ভালো। অনেক কাজ রয়েছে হাতে। সময় যেটা অপচয় হবে তা সুদে আসলে মেটাতে হবে তো—গলায় স্বরে ছলকে ওঠা আনন্দকে কিছুতেই দমন করতে পারেন না মিঃ মজুমদার।

স্যার—

দি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের একজন তরুণ সাংবাদিকের জ্বলজ্বলে বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ে মজুমদার সাহেবের। স্যার—সপ্তাহ খানেক তো লাগবেই আপনার দিল্লীতে। সুজয় মজুমদার লক্ষ্য করে ছেলেটির গলায় দৃঢ়তার আভাস।

তা তো লাগবেই মনে হয়। কেন বলো তো? সামান্য বিরক্তির ছোঁয়া তার গলায়।

সকালে এয়ারপোর্টে যদি একটু সময় দেন। মিনিট দশেক। আমি আগেই পৌঁছে যাবো। স্যার দিতেই হবে কিছুটা সময়, আপনার একটা ইন্টারভিউ নেবো।

চাপা উত্তেজনায় গলাটা সামান্য কেঁপে যায় তার। আর পারা যায় না ভায়া তোমাদের নিয়ে। খেতাবটা পাওয়ার পর তো কেটে গেলো বেশ কয়েকটা দিন। আর কেন? ঢিলে দিলে চলে না হে। কয়েকটা প্রত্রিকায় তো পরিষ্কার পাওয়ার পর আমার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ছাপা হয়ে গেছে। সেলিব্রেট করার জন্য হয়তো হাতে কয়েকটা দিন পাওয়া যায় কিন্তু খবরতো

তাজা চাই। বাসী খাবার মুখে রোচে না হে। সময়ের সঙ্গে তাল রাখবে তো? কি বলো হে রায়? সুজয় মজুমদারের কথায় ঘাড় কাত করে স্বীকৃতি জানায় মধ্যবয়সী কংগ্রেসী নেতা সত্যসাধন রায়।

স্যার, আপনার জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য কথা যদি—হঠাৎ যেন দুলে ওঠে চোখের সামনে চড়া আলোর তলায় দাঁড়ানো মানুষের মুখগুলো।

আমার জীবনী ছাপবে? মজুমদারের গলায় সুস্পষ্ট সংশয়। পদ্মশ্রী পাওয়া এমন কি ঘটনা যে লোকে আমার সম্পর্কে এতো কৌতূহলী হয়ে উঠবে? তুমি বড্ড বেশী—মজুমদারের কথা ফুরিয়ে যায় হঠাৎ।

না স্যার, ভেবেছিলাম সময় মতো যদি আপনার জীবনীটা ফাইলিং করে রাখতে পারি। আপনি সাংবাদিকতার এনেছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আধুনিক সাংবাদিকতার পত্রিকার বলা যায় আপনাকে। আপনার কীর্তি ইতিহাসে স্থান পাবে, তাই—বলা যায় না তো, আপনার বয়স—কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে বাক্যের বাকী অংশ গিলে ফেলে সে।

আচ্ছা যেও কাল। দেখি যদি সময় করতে পারি। নিরুত্তাপ গলায় শব্দকটি উচ্চারণ করেন তিনি।

একে একে সকলে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অবসন্ন সুজয় মজুমদার কম্পিত হাতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। দুচোখ যেন বুজে আসে ক্লান্তিতে।

সিগ্‌নেচার প্লীজ—হাত বাড়িয়ে স্টুয়ার্ডের হাত থেকে বিলটা নিয়ে সই করে দেন মজুমদার সাহেব। ক্রেডিট কার্ড আর বিলটা স্টুয়ার্ডের দিকে বাড়িয়ে দেন। বিলের হিসেবে আর চোখ বোলাতে ইচ্ছে হয় না। রাত অনেক হলো বোধহয়। হাত উলটে ঘড়ি দেখতেও আর উৎসাহ খুঁজে পান না। মাপা সময়ের ভান্ড উপছে পড়েছে নিশ্চয়ই।

উঠতে গিয়ে পাটা সামান্য যেন টলে যায়। না, ডাক্তারের কাছে গিয়ে শরীরের কলকব্জাগুলোর অবস্থা জেনে নেওয়া দরকার। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেন একটু।

সিঁড়ির ধাপকটা নামতে নামতে রাস্তার দিকে চোখ পড়ে সুজয় মজুমদারের। রাস্তার আলো পড়ে পিচের কালো রাস্তাটা সরীসৃপের শরীরের মতো মসৃণ মনে হয়। বড় নির্জন চারিধার।

আমার মেয়াদসীমা আমিই জেনে নেবো। ক্লান্ত হাতে গাড়ী চালাতে চালাতে মনের ওপর বিঁধে বসা কাঁটাকে ওপরাতে চেষ্টা করেন তিনি।

তালিকা আর বাড়ালে চলবে না, এবার ছেদ টানতে হবে। বুকভরে নিঃশ্বাস টেনে নিতে ইচ্ছে হয় বার বার। ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁই ছুঁই। রাতের কলকাতা শান্ত, উদ্বেগশূন্য। ফাঁকা রাস্তায় ট্র্যাফিকের সিগ্‌ন্যালের ঝামেলা নেই। নেই ওভারটেকের সমস্যা। নির্ভার নিশ্চিন্ততায় গৃহাভিমুখে গাড়ীটা চালিয়ে নিতে নিতে মজুমদার সাহেব ভাবেন কাল থেকে ড্রাইভারের হাতেই ছাড়তে হবে স্টিয়ারিং।

উত্তরণ

বাবু

হুঁ

বাবু, লোটিশ ঝুলেছে গো বাবু বস্তিতে, বড় কড়া লোটিশ। আমাদের বাঁচান বাবু গো, আমাদের বাঁচান—

নোটিশ— কিসের?

উচ্ছেদ, বাবু গো, উচ্ছেদ, কোথায় যাই বাবু? ছেলেপিলে নিয়ে—

আহ, নোটিশ কি তোমায় একা দিয়েছে?

না—সবাইকে।

তবে?

বাবু গো, আমার ছয়টা মুখে ভাত জুটাতে হয় গো বাবু। ওদের হাত। ধরে যাই কই বাবু?

হ্যালো...

...ব্যস্ত আছি বড্ড, সেশন চলছে—

...মন্ত্রীর টেবিলে উঠেছে শুনেছি...।

...স্ক্রুটিনি হোক, দেখা যাক্...।

বাবু গো—

কি বলছিস কি?

টেলে টেলে উঠাবে গো সকলারে—

সকলকে ওঠাবে, তোকে একা না তো?

বাবু—

বেশ তো তোরা। রাস্তা চওড়া হবে, কত সুবিধে হবে। একটু সবার কথা ভাববি না? শুধু নিজেরটা।

লোটিশটা কি রদ হয় না?

দূর পাগল। আমি কি সরকার? যা, পালা।

স্যার—

বলুন।

ওই জমির ব্যাপারটায়—

কোন জমি?

ওই যে স্যার, ওই যে, যে জমিটা জবরদখল করেছে চাষীরা। বলছে দু পুরুষ ধরে চাষ করছি।

তো? সুশান্ত— জনা দশেকের বেশী না কিন্তু আজ।

স্যার, স্যার, ওদের ওঠাবার কোন বন্দোবস্ত—

পুলিসে খবর দিন। কেস করুন। এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি। আচ্ছা নমস্কার।

দাদা ভালো আছেন।

হ্যাঁ।

আমার মেয়ে দাদা।

ও আচ্ছা। পল্টু— গুপ্তকে পাঠিয়ে দাও তো আমার কাছে।

দাদা, ওর একটা ইস্কুলের চাকরী হয় না?

হবে না কেন? কি পাশ? পল্টু—

বি এ। এবার বি এড দিয়েছে। কি করব?

এ্যাপ্লাই করুন।

কোথায়?

কাগজে এ্যাডভারটাইসমেন্ট দেখে।

তারপর?

ইন্টারভিউ কল পাবেন।

সিওর?

যদি কমিটি মনে করে। গুপ্ত, চিঠিগুলো কটা কপি করিয়েছেন?

দুটো। না না— চারটে করান। অন্তত দুটো কপি ফাইলে রাখবেন।

আচ্ছা স্যার।

...তারপর?

মানে?

এ্যাপলিকেশন করলো, তারপর?

ইন্টারভিউ দেবে, সিলেকশন হলে চাকরী পাবে।

না, মানে—

কি?

কোন, মানে, আপনি যদি—

ফেভারিটিসম?

না, মানে ঠিক তা নয়, মানে—

আচ্ছা— এত মানুষের মধ্যে শুধু নিজের মেয়ের কথা ভাবছেন? যোগ্য প্রার্থী পাবে না কাজটা? সকলের দিকে তাকান। নিজের চিন্তাকে ছড়ান একটু ছড়ান।

সকাল সাড়ে আটটা থেকে দশটা অবধি এই দৃশ্য বৈঠকখানায়। দর্শনপ্রার্থীরা শুধু প্রার্থীর ভূমিকায়। সংলাপের অদলবদল হয় কিছুটা, কিছুটা রকমফের। কিন্তু প্রত্যেকেই কিছু না কিছু একটা পাওয়ার জন্য দলে দলে ভিড় করে রোজ আনন্দমোহন মিত্রের বাড়িতে। রোজই যে সকলে দেখা করতে পারে তা নয়। যারা পারে না, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায় শুধু সেই দিনটার জন্য, আবার পরের দিন সকালেই এম এল এ সাহেবের বাড়ির সামনে সূর্য আকাশে ফুটতে ফুটতেই হাজির হয়। যাতে আজ আর সুযোগটা না ফস্কে যায়। বাইরের গ্রীল দেওয়া বারান্দায় যখন উপচে পড়ে ভিড় তখন বাড়ির সামনের টুকরো জমিতে লোকজন দাঁড়ায়।

বাড়িটা এল শেপের। তাই দোতলার পাশের ঝোলা বারান্দা দিয়ে নীতের এই ঘেরা বারান্দা আর বাগানের অংশটুকু সুজাতা দেখতে পায় না। দোতলার বারান্দাটা শোবার ঘরের সামনের দিকের দেওয়ালটা থেকে একটু ছোট, তাই আড়াল পড়ে গেছে। শোওয়ার ঘরের একদম সংলগ্ন দোতলার এই ঝোলা বারান্দা। এই বারান্দাতে সকালে রোদ আসে আর সারাদিন ছায়া। শোওয়ার ঘরের পেছনে একটা ভাঁড়ার ঘর। ভাঁড়ার ঘর দিয়েও আসা যায় বারান্দায়।

সুজাতার দিনের অধিকাংশ সময় কাটে, এই বারান্দার। এক অদ্ভুত আকর্ষণ ওর। শোওয়ার ঘরের বিছানায় আলস্যে গা ভাসিয়ে, ডাইনি টেবিলে বসে চা খেতে খেতে বা হলঘরের ডিভানে শরীর এলিয়ে ওর মন আর মানেনা। আকুলিবিকুলি করে। ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আগের বাড়িতে সামনের দিকে বারান্দা ছিল। ছোট। একতলার দরজায় বেল বাজলে বারান্দা দিয়ে উঁকি দিতো। সকালে যখন লোকের পর লোক ঢুকতো, বারান্দা থেকে ওর চোখে পড়তো। ওই সময়টা অবশ্য বেল বাজতো না। উমাশঙ্কর দরজা সকাল সাতটাতেই খুলে দিতো, আর তারপর লোকের পালা। বাইরের পাঁচিল আর বাড়ির মাঝখানের চাপা গলিতে সকালের দিকে উপচে পড়তো লোক। ডাক পড়লে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতো। ভেতরে জায়গা অকুলান। কখন কার ডাক হবে ঠিক নেই। তাই স্লিপে নাম লিখে শুধু অপেক্ষা। রাস্তার ওপর বাড়ি ছিল। সারাদিন লোকজন, গাড়ি। একটা রুটের মিনিবাসও চলতো। রাস্তা পেরিয়েই ছিল একটা বিরাট বাজার। বাজার মানে বাজারের পেছন দিকটা। নোংরা আর জঞ্জালের ডিপো। ওই তল্লাটে সবচেয়ে বড় বাজার। তাই নোংরার ঢিপিও পর্বততুল্য।

বৌদি—সুজাতা পেছনে মুখ ঘোরায়। স্বপ্না দাঁড়িয়ে।

কি হয়েছে? সুজাতা মুখ ঘুরিয়ে জানতে চায়।

বাবুর জলখাবারটা—সুজাতা ধীর পায়ে ঘরে ঢোকে।

আনন্দমোহন মিত্রের এই এক বিচিত্র অভ্যাস। সকালে স্নান করে নিয়ে জলখাবারটা কখনই ডাইনিং টেবিলে খান না। খাওয়ার ঘরের পাশে ফাইল, কাগজপত্র ভর্তি ঘরটাতে বসেন খেতে। গুপ্তবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফাইলপত্র দেখায়। গুপ্তবাবুই নিম্নস্বরে কথাবর্তা বলে বেশী।

কখনও সামান্য ভ্রুভঙ্গী করে অথবা কখনও দু-চার কথায় আনন্দমোহন মিত্র নির্দেশ দেন। গুপ্তবাবুর সঙ্গে ওর সম্পর্ক অনেকদিনের। প্রথম যেবার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সময় থেকেই গুপ্তবাবুর সঙ্গে পরিচয়। সেই পরিচয়ই এখন গভীর সম্পর্ক। প্রায় অচ্ছেদ্য বলা চলে। বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া গুপ্তবাবু সর্বক্ষণ আনন্দমোহনবাবুর ছায়া। এই ছায়া স‍ীর স! তাই নিত্য গোপন আলোচনা।

ইনকামের সার্টিফিকেট দেখে ছেড়েছি অ্যালোটমেন্ট।

অনিলবাবু বললেন ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ করো, লো ইনকাম ক্যাটাগরির ফ্ল্যাটগুলো যাতে তারাই পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার হুমকী দিচ্ছিলেন। গুপ্তবাবু কাজটা কিভাবে এগোচ্ছে তার সম্পূর্ণ চিত্রটা এগিয়ে দেয় আনন্দমোহনবাবুর দিকে। লিষ্টটা আনন্দমোহন মিত্রের সামনের টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখে। মিত্র হাপবয়েল ডিমটা চামচ দিয়ে টেনে নিয়ে খেতে খেতে বলেন—

মুড়ি মুড়কির মতো বিলি করছেন তাহলে—

না স্যার, না, গোটা আঠেরো আটকে রেখেছি। অনিলবাবু বলছিলেন—

গুপ্তবাবুর ব্যস্ত স্বর থামিয়ে দেন আনন্দমোহন মিত্র।

টেন্ডারগুলো খোলা হয়েছে? লোয়েস্ট কোটেশন কার?

না খুলিনি এখনো। খুবলবো স্যার? ছুটে আর একটা ফাইল আনতে যায় গুপ্তবাবু।

বাড়িতে আনলেন কেন? বোর্ডের অফিসেই রাখবেন। আর—এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মিঃ সেনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আচ্চা স্যার—স্যার, সোসাল ওয়েলফেয়ার, ওই যে ওই কুঁদঘাটায়, ওরা অনেক সইটই যোগাড়— ট্রাস্টের কাছে একটা সাহায্য—মানে প্রতিবন্ধী গরীব শিশু—

প্রতিবন্ধী? আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বছর নাকি এটা?

ফলের রসের শেষটুকু পান করে উঠে দাঁড়ায় আনন্দমোহন মিত্র। সুজাতার হাতে এলাচের দানা আর মালটিভিটামিন ক্যাপসুল একটা। হাত বাড়িয়ে ক্যাপসুলটা নিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেলেন উনি।

পঞ্চান্ন বছরের মধ্যবয়সী আনন্দমোহন মিত্র মালটিভিটামিন ক্যাপসুল খান। হার্টের ওষুধ। প্রেসারের ওষুধ, সুগারের ওষুধ, এমনকি হজমের ওষুধও খেতে হয় না ওকে। জলখাবারের পরেই নীচে দরবার। নীচের থেকেই বেরিয়ে যান। তবে সময় বার করতে পারলেই একটা নাগাদ ফিরে আসেন। লাঞ্চ সেরে একটু ঢিলে ঢালা হয়ে দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নেন টানা দু ঘন্টা। বিয়ের পর থেকেই দেখছে এটা সুজাতা। এই ঘুমটা নাকি টনিক। জীবনের প্রথম দিকে রাজনীতি করতে প্রচুর খেটেছেন। নাওয়া খাওয়া ছিল না। সেই পরিশ্রমের ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে। ইলেকশনে জিতে এম এল এ হয়েছেন। মাঝখানে একবার হারলেও

বরাবর জিতেই এসেছেন কলকাতার প্রান্তবর্তী এই এলাকা থেকে। এই বারই মন্ত্রী হবেন সবাই ভেবেছিল, তবে পরের বার যে হবেনই তা সন্দেহাতীত। অনেক ক্ষমতা ওর। রাজনীতির নেশায় মত্ত আনন্দমোহনবাবু বিয়ে করেছেন যৌবন চলে গেলে। তাই সুজাতা ওর জীবনে দেরিতে এসেছে। আসা থেকে শুধু দেখে আসছে একজন অপ্রতিহত ক্ষমতাবান মানুষকে। যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। জীবনে নিজস্ব কোনোও মুহূর্ত নেই, গোটা সময়টাই পাবলিক। নিঃসন্তান সুজাতা নিঃসঙ্গ। ষোলো বছরের বিবাহিত জীবনের এই একাকীত্বের অভ্যাস ওর রক্তে মিশে গেছে। বিয়ের পর থেকে রক্ত কখনও ছলকে ওঠেনি ওর, হৃদপিন্ডের গতি হয়নি বেয়ারা। রক্তের স্রোত শুধু বয়ে গেছে। চল ছলাৎ, ছল ছলাৎ। হৃদপিন্ড নিঃশব্দে সচল। ঢিপ্‌ঢিপ্ করেনি কখনও অথবা ধক্‌ধক্। প্রতিক্ষণের এই স্বাভাবিকত্ব ওর জীবন থেকে মুছে দিয়েছে জীবনের স্পন্দন, জীবনের রোমাঞ্চ।

দীর্ঘ ষোলো বছরের এই বিস্বাদ জীবনটা হঠাৎ পালটে গেছে সুজাতার। স্বাদটা হয়তো মধুর নয়। কিন্তু মানুষ কি কেবল মধুরতার আসক্ত? অম্ল, নোনতা, তিক্ত কি রসনাতৃপ্ত করে না?

নোংরা বাজারের কাছে থাকতে ভালো লাগছিল না বলেই আনন্দমোহনবাবু নতুন বাড়িটা করেছেন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে। জায়গাটা খোলামেলা। বাজার দূরে। চওড়া রাস্তা সামনে। ওপারে ছোট একটা পার্ক। বড় মনোরম পরিবেশ। গৃহপ্রবেশের সময় বাড়িটা অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সময় ওরা যখন তিনরাত্রি এ বাড়িতে কাটিয়ে গেছে, সুজাতা খেয়াল করেনি। রাত্রিবেলা এসেছে, রাত্রিটুকু কাটিয়ে চলে গেছে। আশেপাশে বাড়ি আছে ছড়ানো-ছেটানো, সামনে পার্ক। এইটুকুই দেখেছিল। থাকতে এসেই প্রথম দিনই চোখে পড়ল ওর। ওর ঝোলা বারান্দার পাশে একটা গলি। গলির পরে টিনের শেড দেওয়া কয়েকটা ঘর। একটাতে দর্জির দোকান। যেটা সব সময়ই বন্ধ থাকে। দোকানটা যে দর্জির সেটা শুধু সাইনবোর্ড দেখেই বোঝা যায়। আর একটা বাড়িভাড়ার অনুসন্ধানের অফিস। আর ওর ঝুলন্ত বারান্দার একদম মুখোমুখি একটা মাংসের দোকান।

বৌদি—আবার স্বপ্না এসে দাঁড়িয়েছে সুজাতার পেছনে। মগ্ন ছিলো সুজাতা। চমকে উঠলো। রাশ রাশ বিরক্তি ভেসে উঠলো ওর ভ্রুতে।

কি হলোটা কি?

বিকেলের জলখাবার কি করবো? বাবুর জন্য? স্বপ্নার গলায় কুণ্ঠা।

লুচি কর— না থাক্। যা ইচ্ছে হয় কর। ঠাকুরকে বলনা। সব সময়ে আমার পেছনে। সুজাতা হাত নেড়ে চলে যেতে বলে।

বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। আজকাল ও বিকেলের চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এই সময়টা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় ওর অগোচরেই।

সাড়ে চারটায় উঠে আনন্দমোহন ওর অফিস ঘরে চলে যান। পার্টির লোকজন আসে। চা-টা ওখানেই খায়। যেদিন একটু দেরিতে বেরোন, সেদিন জলখাবার খান। বিকেলের

জলখাবারটা ও ডাইনিং টেবিলেই খান। খুব বেশী না। সময়টা কম থাকে। তার ওপরে বেশীর ভাগ দিনই ওকে সভা সমিতিতে যোগ দিতে হয়। প্রধান অতিথি বা সভাপতি। এই সময়টাতে সুজাতার গিয়ে আর দাঁড়াতে হয় না।

আগের বাড়িতে থাকতে সুজাতার ওখানে ও কিছু করার ছিল না। বারান্দাতে তো দাঁড়াতেই মনই চাইত না। বাইরে তাকালে শুধু এক টুকরো নোংরা ছবি, গা গোলানো, বিশ্রী। সকালের দিকে নীচে তাকালে দেখা যেতো মানুষের মাথার বিভিন্ন রকমের চুল। টাক, ঝাঁকড়া, তেল চিটচিটে, ঢেউ খেলানো, কদম ছাঁট অদ্ভুত লাগতো সুজাতার। রোজই আলাদা আলাদা দর্শনপ্রার্থী আসে কিন্তু, রোজই এক এক চুলের ছাঁদের সমাবেশ। এক, অভিন্ন। শুধু ছুতো খোঁজে লোকগুলো, কোনোমতে একটা পেলেই এম এল এ সাহেবের কাছে ঘ্যানঘ্যানানি। এরা তার স্বামীকে ত্রাণকর্তা ভাবে। তাই আসতেই থাকে। বৈচিত্র্যহীন চুলের জটলা দেখতে দেখতে একঘেঁয়েমির হাই উঠতো মুখে। দলা দলা ক্লান্তি ছেয়ে ফেলতো ওর মন। নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ সুজাতা তাই বারান্দায় কম যেতো। যখন ও শুনলো ওদের বাড়ি হবে নতুন গজিয়ে ওঠা বেশ ধনী পাড়ায়, তখনও ও খুব একটা আকর্ষিত হয়নি। পনরো বছর এই বাড়িটাতে কাটিয়ে ও কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। ভোঁতা, নির্মোহ, অনুভূতিহীন। কিন্তু এই বাড়িতে পা রাখতেই ওর মনের সংবেদনশীলতা চিড়িক দিয়ে ওঠে। রক্তস্রোত তোলপাড় করে।

পৃথিবীর এক ভাগ স্থল থেকে এক টুকরো নিজস্ব জমি চাই—আনন্দমোহন মিত্র হাসতেন আর বলতেন।

কেন স্যার, এ জমিটাও আপনার আর বাড়িটাও। গুপ্তবাবু তখন মিত্র সাহেবের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, সেটা ঠিক, কিন্তু এটা ঠাকুর্দার বাড়ি। আমি নিজের চাই।

আসল ব্যাপারটা অবশ্য সুজাতা পরে জানতে পারে। বাড়িটার দাবীদার ছিল কিছু। শরিকী বিবাদটা মামলার পর্যায়ে যেতে পারে কোনো সূত্রে জানতে পেরেই আপদটা চুকিয়ে দিলেন আনন্দমোহন। অবশ্য দামটাও ভালো পেয়েছিলেন। বাজারের নোংরায় কলুষিত, গাড়ির ধোঁয়া ও দূষিত বাতাস থেকে মুক্ত এই বাড়িটা করে, আনন্দমোহন মিত্র বেজায় খুশি।

সুজাতা প্রথমদিন বলেছিল—আমাদের বাড়ির পাশে মাংসের দোকান আছে একটা, ছোট।

ক্লান্ত আনন্দমোহন চোখ দুটো বন্ধ রেখেই বলেছিল—বাজার তো না, ভালোই তো, মাংস কিনে আনা যাবে যখন তখন।

অবশ্য ওই দোকান থেকে যখন তখন মাংস কিনে আনা হয়নি সুজাতার। দূরের সুপার মার্কেট থেকে আনায়। আর অত্যন্ত সতর্কতায় নিজে ছেড়ে দিয়েছে মাংস খাওয়া। অবশ্য সতর্ক না হলেও চলতো। দিনে একা খায়। সারাদিন জীবনটাকে খাবলে দেখতে দেখতে সুজাতার চোখ দুটো ভারি হয়ে থাকে। নিজের প্লেট ছেড়ে আর সুজাতার প্লেট অবধি দৃষ্টি এগোয় না। তাই সুজাতার আপ রুচি খানা।

ও বাড়িতে সপ্তাহে দুবার মাংস কেনা হতো সামনের বাজার থেকে। মাংসটা খেতে কোনোদিন অরুচিও বোধ করেনি ও। বিরাট বাজার ছিল। তিন চারটে মাংসের দোকান। বাজারের পেছনে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক পাঁঠা একটা বিরাট নারকেল দড়িতে একসঙ্গে বাঁধা থাকতো। বেশ কয়েকটা পাশাপাশি খুঁটিতে নারকেল দড়িটা বাঁধা। প্রায়ই চোখে পড়তো সুজাতার—দুটো পাঁঠাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা লুঙ্গি পরা লোক। কখনোবা তিনটে কখনোবা—। আবর্জনার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতো পাঁঠাগুলো, মিলেমিশে জড়িয়েমড়িয়ে। পাশেই বোধহয় কাটার ঘর ছিল। দু'তিনদিন ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটা পাঁঠাকে দুটো লোক লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসতো বাজারে। সাদা, কালো, ছোট, বড়, মোটা, শীর্ণ পাঁঠার দলটার কিন্তু এক চেহারা। অনবরত যে মরছে, আসছে, মরছে, আবার আসছে বোঝার উপায় নেই। রোজ সকালে বারান্দার টবে জল ঢালতে গিয়ে সুজাতার চোখে কখনও কোন বৈচিত্র্য ধরা পড়েনি। তাই দুবার আর সেই আবর্জনার স্তূপের ওপর, এক দ.ল পশুর ওপর চোখ ফেলেনি ও। নতুন বাড়ির ঝুলন্ত বারান্দার পাশের এই মাংসের দোকানটা কিন্তু ছোট। লাল মেঝে। মেঝের ওপর গাছের গুঁড়ি, গোল। সামনের জায়গাটায় একধারে টিনের একটা বালতি আর মগ। টিনের শেড দেওয়া একফালি দোকান। মাংস বিক্রি হয়। দু'চারটে লোক আসে। ভিড় হয় না কখনই। দোকানদারটার বোধহয় মোটামুটি বাঁধা খদ্দের। বিকেল চারটে নাগাদ একটা লোক এসে একটা পাঁঠা দিয়ে যায়। প্রথমে পাঁঠাটাকে দোকানে রাখে না। সামনের লাইট পোস্টের নীচে বেঁধে রাখে। সকালে টাইম এতদম বাঁধা। ঘুম থেকে পাঁচমিনিট দেরি করে উঠলে দেখেছে পাঁঠাটা পাঁচমিনিট আগে এসে গেছে। কোনোদিন কালো, কোনোদিন সাদা, কোনোদিন কালোয় সাদায় আবার সাদায় কালোয়। সকালে এই দোকানে সামান্য বিক্রি। দুঃস্থ লোকেরাই আসে বেশী। আগের দিনের বিক্রি না হওয়া মাংসের অবশিষ্টাংস, ছিটছাঁট বিক্রী হয়। শালপাতার ঠোঙ্গায় মুড়িয়ে। বিকেলে বিক্রী বেশী। টাটকা মাংস। শালপাতার ওপরে তখন থাকে খবরের কাগজ। সুজাতা শুনেছে ভালো মাংস এ দোকানের। সহজ সেদ্ধ হয়। স্বপ্না বলে— কচি পাঁঠা। কিন্তু সুজাতা জানে রোজই পাঁঠা কচি থাকে না। বেশ ধাড়ী পাঁঠা প্রায়ই আসে সকালে ভোরের ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়ায় লাইটপোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁঠা। একা একা। ওর কি পা ধরে যায় না? ও মুখ বাড়িয়ে কচি ঘাসের সন্ধান করে। নটা নাগাদ যখন দোকানে আর মাল থাকে না, তখন ভৃত্য দোকানদার পাঁঠাটার দড়ি খুলে নিয়ে যায় মালিকের কাছে। মালিককে একটা খাটিয়া পেতে দেয় দোকানের সামনে। দোকানের পেছনে কিছু জিনিষপত্র রাখার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই খাটিয়াটা থাকে। খাটিয়ায় বসে মালিক পাঁঠাটার সারাশরীরে হাত বোলার। পেটের দিকে টিপে টিপে দেখে। আলতো হাতে হাত বুলিয়েই চলে হাতে ছোলা নিয়ে খাওয়ায় পাঁঠাটাকে। মালিকের সোহাগে পাঁঠাটার ভেলভেটের মতো চামড়াটা কখনও আরো টানটান হয়? কখনো কুঁচকে কুঁচকে যায়। পরমনিশ্চিন্তে পাঁঠাটা পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। মালিকের গায়ে গায়ে একটা কালোটে সাদা গেঞ্জি। লুঙ্গি। লুঙ্গি তোলা হাঁটু অবধি। গেঞ্জী বৃহৎ উদর থেকে গোটানো। অনেক বেলা পর্যন্ত মালিক ও তার সাকরেদটা দোকানেই থাকে। পাশে কর্পোরেশনের কল আছে। বালতি করে জল টেনে টেনে আনে কর্মচারী। ভালো করে ধোয়। রক্তের দাগ, মাংসের উচ্ছিষ্টাংশ সব পরিষ্কার করে।

এগারোটা নাগাদ কালকের কাটা পাঁঠার চামড়া নিতে আসে সাইকেলে করে একটা লোক। লোকটা চামড়া নিয়ে গেলে কর্মচারী টিপকলের নীচে বালতি পেতে, সারা গায়ে প্রচুর সাবানের ফেনা তুলে স্নান করে। মালিক তখন চা খায়। ঝাঁপ ফেলবার আগে পাঁঠাটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে যায় কর্মচারী দোকানের মধ্যে। এই সময়টা আর কিছু ঘটে না। বন্ধ ঝাঁপের আড়ালে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত প্রাণীটাকে দেখা যায় না। বাইরে থেকে ছোট একটা পুরনো তালা দেওয়া। হু হু করে সময়টা বেরিয়ে যায়। আর সুজাতা ছটফট করে। সকাল থেকে পাঁঠাটাকে ও ওকে ঠিক আলাদা করে চিনতে পারে। প্রত্যেকটি পাঁঠার মুখের গঠনে বৈশিষ্ট্য আছে, ভাবপ্রকাশের ভন্নি ভিন্ন। ওর কষ্ট হয়, ওর প্রচণ্ড কষ্ট হয়। একটা হাতুড়ি দিয়ে তালাটা ভেঙ্গে পাঁঠাটাকে ছেড়ে দেবার দুর্বার ইচ্ছে ওকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে। রোজ সারা দুপুর ও ঘরবার করে। ও শাওয়ার ঘরে আনন্দমোহন শুয়ে থাকে বলে নিঃশব্দ পদচারণায় ও বারান্দায় আসে, ভাঁড়ার ঘরে ঢোকে, ডাইনিং টেবিলে বসে খায় কোনো রকমে, আবার বারান্দায় গিয়ে বসে। বারান্দার মেঝেতে বসে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়েও চোখদুটো মেলে রাখে।

সদা ব্যস্ত আনন্দমোহন মিত্রেরও চোখ এড়ায়নি ওর এই তন্ময়তা, অস্থিরতা ও বারান্দায় দীর্ঘ সময় যাপন।

কি হলো তোমার? কিশোরী কিশোরী ভাব যে—একদিন হাল্কা মুডে মিত্র বলে।

কেন, কি দেখলে? সুজাতার গলায় কিছুটা উন্মোচিত হওয়ার ভয় খেলে যায়।

প্রেমিক জুটিয়ে আবার ডুবিয়ো না আমায়। পাবলিক ইমেজটা যাবে আমার। রসিকতাটায় ঝাপটা মারে সতর্কবাণী। সুজাতা চুপ করে থাকে।

সুজাতার এই আলগা ভাবে সংসারের খুব একটা অসুবিধে হয় না। সংসার চলে সুষ্ঠুভাবেই। লোকজনতো কম রাখেননি আনন্দমোহন। ওর এম এল এ সাহেবকে ভয় করে যমের মতো। এদিক ওদিক করার সাহস নেই ওদের। ভাবী মন্ত্রী উনি রাজ্যের, চাট্টিখানি কথা নাকি?

প্রতি মুহূর্তে সুজাতা উত্তেজিত, প্রতিক্ষণে দুরু দুরু বক্ষ। নিঃশ্বাসে চাপ, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, আঙুল অবশ। হত্যা হবে একটা। একটা হত্যা... কয়েক ঘন্টা ধরে খুঁটিয়ে দেখা একটি অসহায় প্রাণীকে জোর জবরদস্তি মারবে ওরা—যতো মায়া হয় ততো মনটা টান টান হয়—আমি পারি, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছি না ওকে। তীব্র স্পর্শকতার এই মানসিকতার ওপর আরোও প্রচণ্ড চাপ পড়ে যখন আনন্দমোহন জেগে থাকে, বাড়িতে থাকে ও সুজাতার কাছে থাকে। মনটাকে বাগ্ মানিয়ে রাখতে হয়। ও জানে মানসিক বিহ্বলতা আনন্দমোহনের দু চোখের বিষ। আবার তাও কারণ ছাড়া। শোক দুঃখ বিপদ আপদ যখন চারিদিকে কিছু নেই। ওর বিহ্বলতা আনন্দমোহনের চোখে কিছুটা তো পড়েই গেছে। ওর অস্থিরতার কারণটা কোনোভাবে প্রকাশ হয়ে গেলে বলা যায় না ওকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে পারেন চিকিৎসার জন্য। তাই সুজাতা সংযত থাকে আনন্দমোহনের সামনে। তবে

আনন্দমোহনের সামনে খুব একটা ওকে থাকতে হয় না। কলকাতায় থাকলে হয় ও বাড়ির বাইরে থাকে তা না হলে লোকজন পরিবেষ্টিত সব সময়। একা হওয়ার অর্থ হলো বিশ্রাম করা। সুজাতার সময়টা তাই বেশীরভাগটাই নিজের। তার ওপর মাসের মধ্যে সপ্তাহখানেক ও কলকাতার বাইরে যায়। বাড়িটাতো তখন নিঝুম।

বৌদি—আবার স্বপ্না।

বেলা তখন এগারোটা হবে। আজকের পাঁঠাটা মিশমিশে কালো, চক্‌চকে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। সুজাতার বুকের শিরা উপশিরাগুলো এই সময়টা টনটন করে।

কেন? একাত্মতার সুতো একটানে ছিঁড়ে গেল।

বৌদি—একটা মেয়ে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বপ্না বলে।

কে মেয়ে? কি চায়? সুজাতা অবাক হয়। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অনেক করে বলছে। স্বপ্নার গলায়ও অনুনয়।

কি জন্য? সুজাতা জানতে চায়।

বাবুর কাছে এসেছিল। অনেকক্ষণ এসেছে। বাবু...কলকাতায় নেই শুনে দারোয়ানকে বলে ভেতরে ঢুকছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। সুশান্তদারাও বাইরের ঘরে নেই। আপনার সঙ্গে একটিবার ও দেখা করতে চায়। কি যেন বলবে বলছিল, খুব বিপদে পড়েছে।

ও, রোজকার সেই চুলের প্রদর্শনী। কোনটা?

কোঁকড়ানো, ঢেউ খেলানো না ম্যাড়ম্যাড়ে পাতলা?

প্রখর আবেগপূর্ণ মনটা শুকিয়ে শুকিয়ে ওঠে। নিস্পৃহ গলায় বলে— চল্।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়ানো মেয়েটার চুলটা জরিপ করে সুজাতা ওপর থেকে। বাঃ। মেয়েটার চুলটা তো বেশ, লম্বাবিনুনী। মেয়েটা সিঁড়ির সবকটা ধাপ উঠে আসতে আসতেই সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো সুজাতা ওকে সম্পূর্ণ দেখে ফেলে। রোগাটে গড়ন, কালো, ভাসা ভাসা দুটো চোখ, হাতে দুটোতে লাল পলা আর শাঁখা, লোহাও আছে। গলায় পুঁতির মালা। লালের ওপর সবুজ ছাপা শাড়ি, কালো ব্লাউজ। কপালে লাল ছোট একটা টিপ। মুখটা নজর কাড়ে, মিষ্টত্বের ছোঁয়া।

কি ব্যাপার? সুজাতা ভ্রু কুঁচকায়।

বৌদি, আমি নেতাজী নগরে থাকি। মেয়েটার গলাটা সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

কেন এসেছ? সুজাতার ভ্রু তখনও বাঁকা।

বড় বিপদে পড়ে এসেছি বৌদি। আমার স্বামীকে পার্টির ছেলেরা মারবে বলে শাসিয়েছে। ওরা বলছে, ও নাকি ওদের শত্রু পার্টির লোক।

মেয়েটার গলা বুজে যায়। পার্টি? পার্টির কথা আমি কি জানি? সুজাতা ল্যান্ডিং-এ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

বৌদি, আমরাও পার্টি বুঝি না বৌদি। কিছু বুঝি না। আমার স্বামী বড় ভালোমানুষ, হয়তো না বুঝেই মিশেছে কারও সঙ্গে। ও কাপড়ের দোকানে কাজ করে, একটা মেয়ে আছে আমাদের। বুড়ো শাশুড়ী, একটা আইবুড়ো ননদ। ওর কিছু হলে বৌদি—মেয়েটা কথা আর শেষ করতে পারে না।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি করতে পারি? সুজাতা ব্যগ্র গলায় বলে।

বৌদি—বাবুর কাছে এসেছিলাম আমি। বাবু নেই শুনে বড় ভয় পাচ্ছি বৌদি। কে বাঁচাবে এখন আমাদের বৌদি। ওরা বলেছে যখন, মারবেই ওরা ওকে। খুন করবে ওরা।

মেয়েটা এবার কেঁদে ফেলে।

দেশে আইন নেই? একজন মানুষ পারে আর একজন মানুষকে মারতে? একজন মানুষ পারে আর একটি প্রাণীকে হত্যা করতে? সুজাতা আপন মনে বিড় বিড় করে।

বৌদি আপনি যদি বাবু এলে আমার হয়ে বলেন। আপনার মায়ার শরীর বৌদি। আপনি না দেখলে বাঁচবো না গো বৌদি। সবাই মিলে ভেসে যাবো। আপনি বাবুকে বলবেন বৌদি ওকে বাঁচাতে। মাথার ওপর যে আমার খাঁড়া ঝুলছে বৌদি—খাঁড়া ঝুলছে।

মেয়েটা চোখের জলে ভেসে যায়। সুজাতা নিজের চোখের জলের আর্দ্রতাকে সামলাতে পারে না। আহা বেচারী। কি নিদারুণ আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে বেচারা। ওর হয়ে একটা কিছু করতেই হবে। ওর স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে আমাকে। আজ যদি ও কলকাতার থাকতো, মেয়েটির জন্য আমি তক্ষুণি বলতাম। হঠাৎ মনে পড়ে সুজাতার ও যদি কলকাতায় থাকতো তবে কি মেয়েটির দুঃখ আলাদা করে জানতে পারতাম আমি। অনেক মাথার সঙ্গে ওর মাথাটাও মিশে যেতো।

আজ দুপুর থেকে সুজাতা ভীষণ উত্তেজিত। ও ঠিক করে ফেলেছে, তালাটা ভেঙ্গে বার করে আনবে টিনের চালের ভেতরে আটকানো মৃত্যু পথযাত্রী পুশুটীকে। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ যে নিষ্ঠুর দৃশ্যটি ও রোজ দেখে আজ আর দেখবে না ও। সোয়া তিনটেয় দোকান খুলে পাঁঠাটাকে বার করে কর্মচারীটা। বেঁধে দেয় লাইট পোস্টটাতে। দোকানের পাশে যে ছোট গলিটা আছে, সেটাতে ঢুকে কিছু প্রস্তুতিপর্ব সারে। এবার আসে স্থূলকায় মালিকটা। এসে দাঁড়ায় পাঁঠাটার পাশে। আবার পেটে, পিঠে আঙুলের চাপ দেয়। মাঝে মাঝে হাত বোলায় গায়ে। এরপর হ্যাংলা কর্মচারীটা আসে। দড়ি খোলে। টানে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘন্টা আড়াই ওই ছোট ঘরটায় প্রায় দমবন্ধ হওয়া পরিবেশে থেকে পাঁঠাটার যেন সত্যের উপলব্ধি হয়ে গেয়ে। ও স্পষ্ট চেনে মৃত্যুর টান। চারটে পায়ের খুর মাটির সঙ্গে সেঁটে যায়। অনড়, শক্ত। শুধু ওর টানাটানা, ভাসাভাসা দুটো চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। এবার কর্মচারী টান মারে সজোরে, কিন্তু একচুলও নড়াতে পারে না। মনে হয় মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে পাথরের মতো কঠিন

শীতল শরীরটা। ধরিত্রী যেন মাধ্যাকর্ষণে আটকে রেখেছে একটা জড় শরীরকে, যাকে মানুষের সাধ্য নেই যে উপড়ে ফেলবে।

ও কি তবে বুঝতে পেরেছে ওর গোটা শরীরটা মূল্যহীন? এক কিলো হাফ কিলো, আড়াইশো গ্রাম, দশগ্রামের মূল্য ছড়িয়ে আছে ওর সারা শরীর জুড়ে? সমবেদনায় বিদীর্ণ সুজাতা শুধু সাক্ষী থাকে।

মালিকের হাতে খইনি। বাঁ হাতের তালুতে সশব্দে চপেটাঘাত করতে করতে মালিক মধুর স্বরে বলে—যা বেটা যা, ডরো মৎ—যা, চুক্ চুক্, যা। মালিকের সেই স্নেহভরা ডাকে পাঁঠাটা বিচলিত হয় না। মৃত্যু জেনেছে ও জীবিতকালে। জড়বুদ্ধি প্রাণীটির দুটি চোখে শুধ টলমল করে বোধি। হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিয়ে যায় ওকে। মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে। পাঁঠার গভীর দৃষ্টি জোড়া শিহরণ জায়গা মনে। ভয় লাগে। চোখ নত হয়ে আসে। সম্মোহক দুটি চোখ। সত্যের আলোকে ভাস্বর। লুঙ্গি পড়া কর্মচারীর নিষ্ঠুর হাত দুটোর পেছনে হেলতে দুলতে আসে মালিক, চোখ দুটো তখনো স্নেহভরা, প্রশ্রয় মাখানো। ভেতরে ঢুকেই ও দা-তে হাত দেয়, সাগরেদটা বোধহয় চেপে ধরে। ছোট দরজা, তাই সবটা না হলেও আংশিক দৃশ্য চোখে পড়ে সুজাতার। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে পাঁটাটা ব্যা ব্যা করে খুব। মৃত্যুর কোপ যখন গলায় নামে, তখন বোধহয় সকলেই মরীয়া হয়ে বাঁচতে চায়। পরম উপলব্ধিকেও গ্রাস করে আতঙ্ক।

নিষ্করুণ এই দৃশ্যটা আজ বন্ধ করতেই হবে। সুজাতা বেপরোয়া আজ। সময়টা কাটছে দ্রুত। ঘড়ির কাঁটা সরছে অনবরত।

বৌদি, বাবু এসেছে। স্বপ্না ছুটে এসে খবর দেয়। আ-আজ-আজ তো আমার কথা নয়। তবে? এই তবের উত্তর সুজাতা পায় না। ঘরে ঢোকে আনন্দমোহন মিত্র। মালদা জেলায় গেছিলেন। একটা বাই-ইলেকশন ছিল পঞ্চায়েতের। ওদের পার্টির হয়ে ইলেকশনের শেষপর্বের যাবতীয় কাজে ও-ই নেতৃত্ব দেয়।

শোনো—সুজাতার কাছে সরে আসে আনন্দমোহন। খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম নিতে ঢুকেছেন ও। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। আজকে আর বারান্দায় দাঁড়ায়নি ও। আনন্দমোহন মিত্রের কাছাকাছি থাকা দরকার ওর। মেয়েটির জন্য। করতেই হবে। ও মেয়েটাকে দেখেছে, জেনেছে ওর দুঃখ। মনটা তাই বিক্ষিপ্ত। ওর স্বামীকে বাঁচাতেই হবে।

শোনো—সুজাতা আনন্দমোহন মিত্রের বুকের ওপর হাত রাখে।

বলো—আনন্দমোহনের মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। বেশ ঝরঝরে লাগছে ওকে। সুজাতা অনেক কষ্টে উত্তেজনাকে গলার নীচে রেখে মেয়েটির কথা বলে।

তোমাকে কিছু করতেই হবে। বাঁচাতেই হবে ওর স্বামীকে। আনন্দমোহনের মুখের হাসি দেখে ও থমকে যায়, বলে—

দেখো, তোমার কতো ক্ষমতা, বড়ো আশা করে, তুমি একবার বললেই যখন—সুজাতার কথা শেষ হওয়ার আগেই ওর স্বামী ওকে থামায়।

ক্ষমতা থাকলেই করতে হবে। দেশের প্রত্যেকটি লোকের কতো সমস্যা। প্রত্যেকের সমস্যা কি আমরা দূর করতে পারি? সমস্ত দেশটার সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় যে আমাদের, একজনকে দেখলে চলবে কেন? আনন্দমোহনের গলা শান্ত, সংহত।

সকলের কথা বলছি না আমি তোমায়। শুধু ওর কথা বলছি। ওর দুঃখের কথা আমি একান্তে জানলাম তো। ওর দুঃখটা সবার থেকে আলাদা। সুজাতা ছাড়ে না।

রোজ যে এতো দর্শনপ্রার্থী আসে আমার কাছে; প্রত্যেকে তো আলাদা আলাদা করেই জানায় আমাকে তাদের সমস্যা, তাদের দুঃখ। অনেকের বিপদ এই মেয়েটির থেকে বেশী। তা বলে কি আমাদের গলে গেলে চলে? সকলের দুঃখই আলাদা আলাদা, সকলের বিপদই যথেষ্ট। সমষ্টির জন্য ভাবতে হয় ব্যক্তির জন্য ভাবলে কি চলে? হয় কি কোনোও সুরাহা? নাকি সেটা সম্ভব।

আস্তে করে সুজাতার হাতটা নিজের বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দেয় আনন্দমোহন মিত্র।

এবার সুজাতা বোঝে। এত বছর ধরে খেলাটা দেখেছে ও সেই খেলার দক্ষ খেলোয়াড়ের মনোভাবটা বুঝে ফেলে ও। আনাড়ীর সমষ্টির প্রতি নিস্পৃহতা গলে যায় ব্যক্তির উষ্ণ সান্নিধ্যে। উতলা হয়, সমব্যথী হয়। পাকা যে সে, নিরাসক্ত। প্রতিটি ব্যক্তিগত ব্যথায় সে নির্বিকার। মানসিক এই উত্তরণই তার সাফল্যের বুনিয়াদ। রক্তমাংসে গড়া ব্যক্তি নয়, অবয়হীন এবং সমষ্টিকে দিতে নিতেই তো ও খেলায় নেমেছে।

মাইক্রোস্কোপ

অনেক ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলে শ্রীমতী। বহুদিন ধরে বলবো বলবো করেও বলতে পারেনি ও, কিন্তু আজ আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। শ্রীমতী ভেবেছিল উদয়ণ আকাশ থেকে পড়বে। শ্রীমতীর ভাবনাটা ঠিক হল না, উদয়ণ একটুও আশ্চর্য হলনা, ওর মুখটা কেমন যেন কোমল হয়ে উঠল, ও সামান্য ভারি গলায় বললো— দেখি।

আজ প্রায় নবছর বিয়ে হয়েছে ওদের, কিন্তু বিবাহিত জীবনের এই দীর্ঘ মেয়াদে কোনও সন্তান আসেনি। মনের ভেতরে অনেক আশা গড়েছিল ও, ভেবেছিল ভগবান নিশ্চয়ই একবার মুখ তুলে চাইবে। কিন্তু চায়নি ভগবান। দিন রাত একটা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ওর মনে ভারি হয়ে চেপে রয়েছে। ছোট্ট একটা প্রাণ, ছোট্ট একটা মানুষ। বিয়ের বছর পাঁচেক পর শাশুড়ির কথাতেই কলকাতার দুজন গায়নোকলেজিষ্টকে দেখিয়েছিল ও। উদয়ণই নিয়ে গেছিল। কিউরেটও করা হয়েছিল একবার। তার ওপর ওষুধ-বিষুধ, এক কোর্স ইন্‌জেকশন। না, সন্তান আসেনি। উদয়ন নির্বিকার আগাগোড়া। সুস্থ এক দম্পতির মধ্যে সন্তান আসা যে একটা স্বাভাবিক ঘটনা, উদয়নকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিলনা, ওর মনে দুঃখ আছে চাপা তো—

শ্রীমতীর শাশুড়ী রুবি দেবী অত্যন্ত মার্জিত মহিলা। শিক্ষিতা। সারাজীবন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। এখন রিটায়ার করেছেন, পেনশন পান। শ্বশুর মশাই মারা গেছেন শ্রীমতীর বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই। শাশুড়ী ভেঙে পড়েন নি। সুন্দর গুছিয়ে সংসার চালিয়ে গেছেন। বড় ছেলে উদয়ন তখন বিবাহিত, চাকরী করে কিন্তু ছোট ছেলে তখনও পড়তো। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল ইয়ার। একমাত্র মেয়ে ঊর্মিলা তখন কলেজের ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রী। রুবি দেবি দেরি করলেন না। উঠে পড়ে লেগে, পাত্র দেখে, একবছরের মাথায় বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের। ব্যাঙ্কের টাকা গড়িয়ে যেতে কতদিন? বিয়ের খরচের পর যে টাকাটা বাঁচলো, সেই টাকাতে শেয়ার কিনে, কম্পানি ডিপজিট দিয়ে সুরক্ষিত করে রাখলেন নিজেকে।

শ্রীমতী বরাবরই একটু বোকা ধরণের, রুবি দেবী অবশ্য বলেন— বউমা একটু সাদাসিধে, তাই সংসার ঠিকপথে চালিত করার পেছনে অবশ্যই রুবী দেবীর নিপুণ হাত ছিল। উদিত চাকরী পেয়ে গেল পাশ করার মাস তিনেকের মধ্যে। উদিত মায়ের মতো ক্ষুরধার কোনও কাজে গড়িমসি নেই, ও একদম উদয়নের বিপরীত। উদয়ন সব সময় শ্লথ, উদিত চটপটে। উদয়ন ফেলে ছড়িয়ে চলে, উদিত আঁটসাঁট। চাকরী পাওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই বিয়ে করলো ইন্দ্রাণীকে। ইন্দ্রাণী সুন্দরী, শিক্ষিতা। উদিত স্মার্ট, ভালো চাকরী করে, বুদ্ধিমান, ওর তো ভালো বউ হবেই। উদয়ন সাধারণ চাকরী করে, তাই শ্রীমতীর মতো সাধারণ গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে বউ করে এনেছেন রুবি দেবী। উনি বলেন— একটা যুক্তিবাদী মন থাকা উচিত প্রত্যেকের।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যালেন্স তো থাকা উচিত।

এতো সব রুচিপূর্ণ কথাবার্তা। মাপাঝোকা চলাফেরার মধ্যে এসে বোকা শ্রীমতী যেন আর একটু বেশী বোকা বোকা হয়ে গেছে। সন্তানহীনতার হীনমণ্যতা ওকে আরো কোণঠাসা করেছে। সারাদিন তাই সংসারের কাজে জুড়ে রাখে ও নিজেকে।

বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই ইন্দ্রানী মা হল। সুন্দর, মিষ্টি মেয়ে। উদয়নই লাফাতে লাফাতে খবরটা নিয়ে এলো।

কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে, মা কি সুন্দর।

উদয়নের হাসিভরা মুখটার দিকে তাকিয়েই মা একবার চকিতে শ্রীমতীর দিকে তাকালেন। বুকটা কেঁপে উঠেছিল শ্রীমতীর। উদয়ন হাসছে, উদয়নের আনন্দ হচ্ছে, তার মানে ওর যদি একটা সন্তান হতো, কতো খুশি হতো ও, কতো ইচ্ছে ছিল ওর, কত আশা।

উদিত এসেছিল কিছুক্ষণ পরে। ওকে এককাপ চা দিলেন তাড়াতাড়ি রুবি দেবী। । বললেন—

ইন্দ্রাণী ভালো?

হ্যাঁ।

বাচ্চা?

ভালো।

নাতনী হওয়ার পর বাড়ীর সবাইকে ভালো করে খাওয়ালেন রুবি দেবী। কিন্তু নাতনী নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি কখনও। কোনও বিষয়ে আদেখেলোমো করা স্বভাব নয় ওর। শ্রীমতীর মন কিন্তু আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল। ইন্দ্রানী মা হবে— যেদিন থেকে জানতে পেরেছিল শ্রীমতী, সেদিন থেকেই একটি শিশুর আশায় দিন গুনছে ও। তিরতির করে কেঁপেছে ওর বুকের শিরা। ছোট্ট নরম দেহটাকে কোলে নেব আমি। ওর শরীরের গন্ধ শুঁকবো। পরম মমতায় তৃষিত মাতৃত্বে ওকে কাছে টানতে চাইত শ্রীমতী। কিন্তু উদিত ইন্দ্রাণীর মানুষ করার পদ্ধতি আধুনিক। বাচ্চা সেই আধুনিক পদ্ধতিতেই মানুষ করে ওরা। শ্রীমতীর বঞ্চিত মাতৃত্বের বুভুক্ষা মেটানোর অবকাশ মেলেনা তাই।

বছর দুয়েক পরেই আবার সন্তানসম্ভবা হল ইন্দ্রানী। শ্রীমতী দেখতো ছেলে, ছেলের বউয়ের সংগে কি নিয়ে আলোচনা চলে মায়ের। সকলে উদ্বিগ্ন, ইন্দ্রণীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল একদিন উদিত। বেশ রাত করে বাড়ি ফিরল ওরা। রুবি দেবী বললেন— কি হল? এত দেরি?

উদিত ধপ্ করে বসে পড়ে সোফায়। ইন্দ্রাণী ঢুকে যায় নিজের ঘরে।

খুব ভীড়।

এত ভীড় কেন? রুবি দেবী প্রশ্ন করে?

সব জায়গায় তো ব্যবস্থা নেই। তাই মনে হয় এখানে এত ভীড়।

উদিত কিছুটা ক্লান্ত বলে মনে হয়।

আজকাল বুঝি সবাই করাচ্ছে? রুবি দেবীর স্বরে কৌতূহল।

না, না, সবাই না। আমাদের দেশে যদি সবাই এতো সচেতন হত তবে আর ভাবনা কি ছিল। প্ল্যানিং জিনিষটাই বোঝে না এরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রুবি দেবী বলেন—

পরীক্ষাটা কি খুব সায়েন্টিফিক?

হানড্রেড পার্সেন্ট-ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে উদিত। রুবি দেবী তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে। ওর দুচোখ জুড়ে অসীম আগ্রহ খেলা করে।

ইন্দ্রানীর অ্যামনিয়টিক স্যাক থেকে অ্যামনিয়টিক ফ্লুইড টেনে নেবে প্রথমে—উদিত বোঝায়।

কষ্টকর? রুবি দেবী সোজা হয়ে বসেন।

না, না। লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দেবে।

তারপর?

সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে ফ্লুইডটাকে মাইক্রোসকপিক টেষ্ট করবে।

তারপর?

ব্যাস্। তারপর রিপোর্ট।

কতদিন পরে রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

কতদিন আর, এই দিন দুয়েক হবে।

কোন হ্যাজার্ডস? রুবি দেবীর গলায় তখনও জিজ্ঞাসা।

খুব সাবধানে করতে হবে। আনস্কিলড্ হ্যান্ড হলে ঝামেলা হতে পারে। তবে ডক্টর সেন তো, এ ব্যাপারে এক নম্বর।

কান পেতে ওদের কথাবার্তা শোনে শ্রীমতী। মানে বোঝে না কিছুই। শুধু এটুকু বোঝে ইন্দ্রানীর একটা কঠিন ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। আরো দুদিন ইন্দ্রানীকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে গেল উদিত। বাড়ি জুড়ে এক চিন্তার ছায়া। না পেরে উদয়নকে জিজ্ঞাসা করে ও—কি হয়েছে গো?

কেন? উদয়ন বলে।

ওই যে সবাই যেন কি আলোচনা করছে, কি সব বলছে। ইন্দ্রানীর শরীরটা কি ভালো না?

ওরা মেডিকেল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে।

মেডিকেল রিপোর্ট, মানে?

সেক্স ডিটারমিনেশরেন জন্য একটা পরীক্ষা করা হয়েছে।

সেটা কি? শ্রীমতী অবাক।

ইন্দ্রানীর সন্তান ছেলে না মেয়ে সেটা পরীক্ষা করে ডাক্তার আগেভাগেই বলে দেবে—

দিলে কি হবে?

কি আর হবে, ছেলে হলে রাখবে।

আর মেয়ে হলে? শ্রীমতীর বুক দুরদুর করে।

মা বলছিল আজকাল তো আর অনেক সন্তান হয় না। তাই এবার ছেলেই নেবে।

মেয়ে হলে?

মেয়ে হলে, মেয়ে হলে বলছ কেন তখন থেকে? মেয়ে তো হবে না।

হবে না।

ধর যদি—

ওরা তবে অ্যাবর্শন করবে।

অ্যাবর্শন করাতে হল ইন্দ্রানীকে। ঝড় চললো যেন বাড়িতে। সেক্স ডিটারমিনেশন টেষ্টের রিপোর্ট পেয়ে মন খারাপ। ভ্রূণটি কন্যা। উদিত গম্ভীর। ইন্দ্রানী মলিন। খাবার টেবিলে, সবাই চুপচাপ। অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায় ভুগছে সবাই। নার্সিংহোমে ব্যবস্থা হল। দুদিন নার্সিংহোমে কাটালো ইন্দ্রানী।

মাস দুয়েক পর আবার সন্তান সম্ভবা হল ইন্দ্রানী। এবার টেষ্টে ধরা পড়ল ছেলে। আশ্বস্ত হলো সবাই। খাওয়ার টেবিলে উদিত আবার খোলামেলা। ইন্দ্রানী ভরপুর। রুবি দেবী সংহত।

সব জিসিষেরই একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ থাকা দরকার।

কি বলিস দাদা? আর তা না হলেই অবাঞ্ছিতের—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তো সায়েন্সের যুগ।

উদয়ন কেমন যেন বাধাধরা, বই মুখস্থ করা ভাষা বলে। অথচ উদিতের কথা কত ছলবলে।

নাতি হল রুবি দেবীর। ইন্দ্রানী উদিতের ছেলে। ইন্দ্রানীর শরীরটা ভালো নেই। এবার আয়া রেখেছে ওরা।

সারাদিন সংসারের অনেক কাজ বেড়েছে শ্রীমতীর। রান্নাবান্না, ইন্দ্রানীর মেয়েকে স্কুলে পাঠানো। খুঁটিনাটি কত কি। ইন্দ্রানীর ঘরে আর তাই বেশি যাওয়া হয় না ওর। ইন্দ্রানীই একদিন ডেকে পাঠালো ওকে।

কি দিদিভাই, একদম আসছ না?

এতো কাজ।

আমার শরীর খারাপ বলে তোমার কাজ বেড়ে গেছে, তাই না?

না, না কি যে বল—

আসলে জানো তো খুব ধক ল গেল। বড্ড টানাহ্যঁচড়া। শরীর কুরে কুরে গেলাম আমি। কত রক্ত গেল—

সামান্য থামে ইন্দ্রানী। আস্তে আস্তে ওর মুখে ফুটে ওঠে আত্মপ্রসাদের প্রশান্তি।

বিজ্ঞানের কি উন্নতি বলো তো? কষ্ট হলো ঠিকই, কিন্তু ইচ্ছে মতো জিনিষটা—

উঠে দাঁড়ায় শ্রীমতী।

উঠলে নাকি?

হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে।

রুবি দেবীর সংসার আজ পূর্ণ। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরাট ইন্দ্রানী। একটা প্রশ্ন শুধু খোঁচা মারে শ্রীমতীকে আমার কি আছে? আমার কেন শূন্য সব?

ধীরে ধীরে একটা ক্ষোভ জন্মায় মনে। জেদী হয়ে ওঠে ও ভেতরে ভেতরে। সংসারে কাজের চাপে দিন কেটে যায় শ্রীমতীর কিন্তু মনটা বড় ফাঁকা লাগে। বুক মোচড়ানো একটা যন্ত্রণা ওর সা্ী। শূন্যতায় ছেয়ে থাকে মন। কি জানি কেন একদিকে প্রবল এক অনাসক্তি ওকে চেপে ধরেছে। সংসারের প্রতি চরম আলগাভাব। অন্যদিকে মনের ভেতর জেগে উঠেছে আর্তি। ওর সারামন ছটফট করছে নিজের বুকের মধ্যে কিছু চেপে ধরার আকাঙ্খায়। এই ইচ্ছে জেগেছে ওর মন বহুদিন। ইচ্ছেটাকে নাড়াচাড়া করে উঠিয়ে রাখতো ও এতকাল। এখন ও আর পারে না মনে হয় আমিও চাই। ও তাই বলে ফেলে উদয়নকে—

আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি না? টি ভি তে দেখায়—

উদয়ন বলে দেখি।

দেখাটা উদয়ন অবশ্য খুব তাড়াতড়িই করে। এক মিশনারী প্রতিষ্ঠান থেকে বাচ্চা দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। বাড়ির লোকেরা সম্মতি দিল। উদিত লিখে দিল যদি কোনও কারণে উদয়ন ও শ্রীমতীর মৃত্যু হয় তবে বাচ্চার আঠারো বছর বয়স অবধি উদিত সব দায়িত্ব নেবে। প্রতিষ্ঠান থেকেই চেয়েছিল এটা। গাইনোকলেজিষ্ট থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট নিতে হল। শ্রীমতীর ইনফার্টিলিটির কথা লিখে ভরতি করলো। উদয়ন অর্থনৈতিক ভাবে কতটা শক্ত পোক্ত তাও জানাতে হল। ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখাতে হল, সেলারি সার্টিফিকেট জমা দিল উদয়ন। ওরা বাচ্চাটির ছেলে নিতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। ছেলের জন্য লম্বা কিউ।

শ্রীমতী বলে না, না, মেয়েই নেবো।

রুবি দেবীও বলেন—সেই ভালো, মেয়েই ভালো। ব্যাপারটা বাইরে বাইরেই থাক।

এতসব করতে করতেই লেগে গেল মাস খানেক। শ্রীমতী ভেতরে ভেতরে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকে। একটা শিশুর আশায় উন্মুখ হয়ে আছে ওর মন। দিন পনেরো পরে হোম স্টাডির জন্য মিশানারি সংস্থা থেকে একজন সোশাল ওয়ার্কার পাঠানো হল শ্রীমতীদের বাড়ি। বাড়ি-ঘর ভালো করে দেখলেন উনি, তারপরে প্রশ্ন শুরু করলেন শ্রীমতীকে।

মা হওয়ার জন্য এখন মানসিক প্রস্তুতি আছে তো আপনার?

শ্রীমতী চুপ করে থাকে। মানসিক প্রস্তুতি? এখন? কবে, কোন কাল থেকে শুধু প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি আমি।

বলুন—ভদ্রমহিলা জানতে চায়।

শ্রীমতী নীরবে মাথা নাড়ে।

নিজের সন্তান মনে করতে পারবেন তো? নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতে পারবেন। সেইরকম স্বার্থহীন, উজাড় করা ভালবাসা।

শ্রীমতী তাকায় উদয়নের দিকে।

উদয়ন বলে—হ্যাঁ ও পারবে।

ওনাকে বলতে দিন। সোশাল ওয়ার্কার শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্রীমতী তখন বিভ্রান্ত। সে বুঝে নিতে থাকে শরীরজ সন্তানের প্রতি মার ভালবাসা কতখানি স্বার্থশূন্য? কতখানি অন্ধ?

শ্রীমতী বলে—ওকে আমি বুকে করে রাখবো।

শেষ পর্যন্ত বাচ্চা দেখল শ্রীমতী। সাদা পোশাক পরিহিতা সন্ন্যাসিনী চলে গেলেন বাচ্চা আনতে। অনাথ, অসহায় পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয় দেয় ওরা। শ্রীমতী অপেক্ষা করে। সামনের দেওয়ালে টাঙানো মাতা মেরীর ছবি। চারিদিক নিস্তব্ধ। জানলার বাইরে বিশাল বড় গাছ। হাওয়া নেই, নিষ্কম্প পাতা। অদ্ভুত থম ধরে আছে পরিপূর্ণ পৃথিবী। সামান্য হাওয়ার দোলায় মনে হয় উপচে পড়বে সব। দু চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে শ্রীমতী—আমার বুকটা জুড়িয়ে দাও ঈশ্বর। তুমি দয়াময়। আমাকে তুমি দাও ঠাকুর। ফিরিয়ে দিও না। আমার দুহাতে তোমার দয়ার দান—বুকের ওপর বাচ্চাটিকে চেপে ধরেই সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকায় শ্রীমতী। আঃ! ধক্ ধক্ করে বাচ্চার হৃদপিন্ড শ্রীমতীর বুকের মধ্যে। গলে পড়তে থাকে শরীরের ভেতরটা। অনাস্বাদিতপূর্ব এক তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। একেই নেবেন তো? সন্ন্যাসিনী জানতে চায়।

শ্রীমতী অবাক চোখে চায়।

ফিরিয়ে দেওয়া যায় নাকি?

শ্রীমতী ভেবেছিল সেইদিনই ও পাবে বাচ্চাটিকে। কিন্তু না, অনেক ফর্মালিটিস আছে। ডাক্তার আসবে, বাচ্চা দেখবে, সার্টিফিকেট দেবে। তারপর লিগাল প্রসিডিং। সলিসিটরের কাছে সব পেপারস যাবে। কোর্টের একটা অর্ডার পেলেই রেজিস্ট্রেশন হবে।

শ্রীমতীকে হতাশ হতে দেখে সিস্টার বলে—অপেক্ষা না থাকলে কি মা হওয়া যায়? এই অপেক্ষাতেই জন্ম নেয় সন্তানের প্রতি আকুতি।

থর থর করে কেঁপে ওঠে শ্রীমতী। বহুদিনের সেই স্বপ্নকে হৃদয়ের উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরে। বাইরে বেরিয়ে শ্রীমতী বলে—

আরে না না। সব ঠিকটাক আছে কিনা ডাক্তার একটু দেখবে। ও সব তুমি বুঝবে না।

দিন সাতেক পর বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গেল ওরা। বাচ্চাটিকে আনা হল। পরম তৃপ্তিতে বাচ্চাটিকে কোলে নেয় শ্রীমতী।

দিন মিসেস্ বোস, বাচ্চাটিকে দেখি।

ওজনের যন্ত্রের ওপর শোয়ানো হল বাচ্চাকে।

ওজনটা খুবই অল্প।

টেপ নিয়ে বাচ্চার দৈর্ঘ্য মাপা শুরু হলো। সে বড় কঠিন কাজ। যতবার বাচ্চাটিকে টেনে লম্বা করা হচ্ছে, ও কেঁদে উঠছে প্রাণপণে। শক্ত হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর। ডাক্তার গলদঘর্ম। উদয়ন, ডাক্তার, উদিত সবাই মিলে জোর করে একরত্তি শিশুকে সোজা রাখতে পারছে না।

লম্বাটা ঠিক মাপা গেল না, তবে একটু শর্ট মনে হয়। বুকে স্টেথিস্কোপ বসালেন ডাক্তারবাবু। খস্ খস্ করে লিখে দিলেন কি কি টেস্ট করাতে হবে। রক্ত পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবোরেটারীর লোক পাওয়া গেল ওখানেই।

সিরিঞ্জ নিয়ে এলা লোকটা।

উদিত বললো—দেখুন ভাই। সবরকম টেষ্টই করিয়ে নেবেন। রটিন টেষ্টটা তো হবেই, এ ছাড়া জেনারেল ডিজিজ বা এইচ আই ডি—সেগুলো দেখে নিতে হবে।

লোকটা রক্ত টেনে নিল কিছুটা। শিশিতে ঢোকাল। তারপর বলল— তবে তো রক্ত টানতে হবে বেশ কিছুটা।

টানুন তবে— অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উদিত। কেঁদে কেঁদে মেয়েটা আকুল হয়ে পড়ে। ওর শরীর থেকে আবার রক্ত টানার জন্য সুঁচ ফোটায় লোকটা, বিহ্বল হয়ে পড়ে শ্রীমতী। বিচলিত স্বরে ও কিছু বলতে যায়। কিন্তু এতো ব্যস্ততার আড়ালে চাপা পড়ে যায় সব কিছু। বাইরে বেরিয়ে শ্রীমতী বলে—এগুলো কেন হল?

টেষ্ট করার জন্য। আবার কি? উদিত আশ্চর্য হয়।

তুমি বুঝতে পারনি?

না—বুজে আসে শ্রীমতীর স্বর।

টেষ্ট তো করাতেই হতো, তাই না? বোকার মতো প্রশ্ন করে উদয়ন।

করাবে না' যদি জালি কিছু বেরিয়ে পড়ে—উদিতের বিস্ময় মাত্রা ছাড়ায়।

তাই তো, তাই তো—তবে বাচ্চাটা কাঁদছিল তো খুব—উদয়নের মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

উই আর হেল্পলেস—একটা সাইনটিফিক পয়েন্ট অফ ডিউটিতে দেখা দরকার সব।

সারা রাস্তা কচি মুখটা ভাসতে থাকে মনে। শ্রীমতী ডুবে যেতে থাকে। ওর হাত চলে যায় অনেক দূরে। হাত বোলায় ও শিশুটির শরীরে। ধরা গলায় বলে— আমরা বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর।

শ্রীমতীর দিনগুলো কাটে না। প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে অপেক্ষায়। চোখ বুজে আসে আবেশে। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে হৃদপিন্ড। কবে আসবে ও আমার কাছে? সুঁচ ফোটানো ওই জায়গাটায় আমি মলম লাগিয়ে দেবো। দুঃখী প্রাণ, ছোট্ট প্রাণ, ওকে আমি জড়িয়ে রাখবো আমার এই ফাঁকা বুকে। শ্রীমতীর যখন খুব কষ্ট হয়, মন আর বাগ্ মানে না। ও নিজেকে সামলায়। মনে মনে বলে— বড় কষ্টের জিনিষ, তাই তো দামি, তাই তো অপেক্ষা।

হার্টের একটা গন্ডগোল ধরা পড়ল। ডাক্তারবাবু বলেন—সন্দেহটা আমি আগেই করেছিলাম। রিপোর্টটাতে নিঃসন্দেহ হলাম। বাচ্চাটা হার্টে একটা জন্মগত ত্রুটি দেখা গেছে। ভেন্ট্রিকিউলার সেপটাল ডিফেক্ট। উদিত বললো—হয় এটা, জন্মের সময়ই হৃদপিন্ডে ফুটো নিয়ে জন্মায়। উদয়ন ম্লান মুখে বলে—হবে না তবে? বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে শ্রীমতী। উদিত বলে—ভাগ্যিস টেষ্টগুলো করানো হলো।

যদি ওরা বলে ওকেই নিতে হবে? উদয়ন আস্তে বলে।

বললেই হলো। রিপোর্ট রয়েছে না? পালটে ওদের দিতেই হবে। এইসব টেষ্ট ফেষ্ট গুলোই, বুঝলি দাদা, কনজিউমার প্রটেকশন। জালি কিছু আর গছাতে হচ্ছে না কাউকে। পরে কোর্ট কাছারী করতে যাওয়া ঝামেলা। কাউকে ঠকতেই হয় না। ঈশ্বরের জুয়াচুরি, মানুষের জুয়াচুরি, প্রকৃতির জুয়াচুরি ধরে ফেলা যাচ্ছে। মানুষ আর ঠকছে না।

হু হু করে ওঠে শ্রীমতীর মন। ও রুদ্ধস্বরে বলে—

ফিরিয়ে দেবো?

অসুস্থ বাচ্চা নিয়ে ভুগবে নাকি? উদীত শক্ত গলায় বলে।

শ্রীমতী বুকের মধ্যে বাচ্চাটির হৃদপিন্ডের শব্দ পায়। ওই প্রাণস্পন্দন ওকে তোলপাড় করে। বন্ধ্যা শ্রীমতী অসহায় ভাবে জড়িয়ে ধরে উদয়নের হাত। উদয়ন গভীর দৃষ্টিতে চায় শ্রীমতীর দিকে।

শ্রীমতী বলে— আমি ফিরিয়ে দেব না। শ্রীমতীর চোখে টলমল করে জল। উদয়নের দুচোখে ছলকে পড়ে মায়া।

ও শুধু বলে— কেউ যে তোমায় ঠকতে দেবে না শ্রীমতী।

পালাশেষের পালা

মহাষ্টমীর সন্ধ্যেবেলায় মারা গেলেন প্রীতি সেন। ঠিক দুটা চল্লিশে। চারিদিকে যখন মন কেমন করা ঢাক বাজতে শুরু করল, ঠিক তখনই নার্সের এমার্জেন্সী কল পেয়ে ডাক্তার মজুমদার ছুটে কেবিনে ঢুকেছিলেন, বেরুলেন সাতটা পাঁচ নাগাদ। ডাক্তারবাবুকে ক্লান্ত লাগছিল। সারাটা দিন আজ যা গেছে ওর। কেবিনের দরজা থেকে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে তখন একলব্য। একলব্য সেন। প্রীতি সেনের একমাত্র সন্তান। তার বুকে বাজছে দ্রিম দ্রিম, দ্রাম দ্রাম।

টিমের প্রত্যেক ডক্টরই অপারেশন সাজেস্ট করেছিলেন, কিন্তু ব্লিডিং হয়ে হয়ে পেশেন্টের হার্টের যা অবস্থা—

কেবিন থেকে বেরিয়েই একলব্যর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে ডক্টর মজুমদার দুপা এগিয়ে এসে, কথাগুলো বলেন।

দো শি ব্লেড প্রফিউস্‌লি, উই ডক্টরস, উই নেভার গেভ আপ।

একলব্য তাকিয়ে থাকে ডাক্তার মজুমদারের মুখের দিকে। লক্ষ্য করে ওর মুখের পেশীর প্রতিটি কুঞ্চণকে, দৃষ্টির প্রতিটি আলোছায়া। কথা টপকে ও আসল কথাটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। একলব্য বুঝতে পারছে দীর্ঘ এই একমাসে ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে মানবিক এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে, উনি তাই পুরোপুরি পেশাদারী হয়ে উঠতে পারছেন না। আর তাই একলব্য হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে যাচ্ছে ডাক্তারবাবুর ঠিক কোন পেশী সংকোচনে লুকিয়ে আছে আসল কথাটা, ঠিক কোন চাউনিতে।

আজ দুপুরেই আমরা আলোচনা করছিলাম, মে বি দা কজ ইস ক্যানসার, মে বি আদার ওয়াইস। যাস্ট নাউ, শার্প এট সিক্স ফরটি শী হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।

কথাটা পড়ে নেওয়ার জন্য একলব্য তখন ডাক্তারবাবুর প্রতিটি কথার ওধারটা দেখতে এত নিবিষ্ট ছিল যে হঠাৎ বুঝতে পারেনি কখন সব আড়াল ভেঙে দিলেন উনি। মা নেই— শোক নয়, দুঃখ নয়, কোনও জ্বালা নয়, যন্ত্রণা নয়, শুধু ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করলো দুটো কান। মা নেই— মা নেই— মা চলে গেল, মা মারা গেল। নিজের মনে একলব্য বলে চলে। একমুহূর্ত থামলেই বুকখালি করা শুষ্ক অনুভূতিতে দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। হঠাৎ গলাটা ভারি হয়ে যায়। থর থর করে কেঁপে ওঠে কপালের শিরা। নার্সিং হোমের আলোগুলো ভেঙেচুরে যায়।

নার্সিংহোম থেকে মাকে মামাবাড়িতে নিয়ে এসেছে মামারা। পিন্টুই জোগার করল একটা টেম্পো। ও না থাকলে মামাদের সাধ্য ছিল না কিছু সংগ্রহ করার। একলব্যর কথা তো বাদই। কলকাতার কিছুই বিশেষ জানে না ও। মার অসুখের জন্যই প্রায় টানা আড়াই মাস ও কলকাতায় আছে। সন্ধ্যে থেকে ছোটাছুটি করতে করতে প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ জোগাড় হল

টেম্পো। পিন্টুই জোগার করল একটা টেম্পো। ও না থাকলে মামাদের সাধ্য ছিল না কিছু সংগ্রহ করার। একলব্যর কথা তো বাদই। কলকাতার কিছুই বিশেষ জানে না ও। দূর্গা পুজার অষ্টমীর সন্ধ্যা, কিছু পাওয়া যাওয়ার উপায় আছে নাকি? নার্সিং হোমের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একলব্য অসহায়ের মতো। পাশে ছোটমামা। পিন্টু শুধু দু চারজন বন্ধু ঘনঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে পিন্টু প্রায় অস্থির হয়ে নিতে হবে, এমার্জেন্সী— এত দেরি করছে—

আরে, আজ টেম্পো কোথায়? ছোড়দার গ্যারাজে নাকি আছে একটা। ওটাই ভরসা— পিন্টুর বন্ধু পাদুটো দুপাশে ছড়িয়ে হাত দুটো ওপরে তুলে শরীরটাকে ছা া করে নিল। আচ্ছা, আজ টেম্পো কেন পাওয়া যায় না?

চকিতে মুখ ঘোরাল পিন্টুর বন্ধু। প্রশ্নটা করেই বুঝেছিল একলব্য মাতৃশোকের মত এতবড় একটা অজুহাতেও এইরকম বোকার মত প্রশ্ন করা যায় না। পিন্টুর বন্ধুর ঠাণ্ডা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ও দমে যায়।

প্রশ্নটা বোঝা গেল না— পিন্টুর বন্ধুর গলা থম্‌থমে।

মানে, আজ তো বিসর্জন নয়। একলব্য কোনমতে বলে। বিসর্জনের সঙ্গে কি? লোকজন ঠাকুর দেখবে না? দলে দলে যাচ্ছে, টেম্পো ভাড়া করছে। ও, আচ্ছা, আচ্ছা।

বহুপ্রতীক্ষিত টেম্পোটা এলা। মাকে নিয়ে মামাবাড়ির দরজায় পৌঁছল যখন ওরা তখন দশটা বেজে গেছে। নার্সিংহোম থেকে মাকে টেম্পোতে তুলেই মামারা ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিয়েছিল। একলব্য খাটিয়ার একপাশে মার বুকের ওপর হাত রেখে বসেছিল। সেই থেকে ও ঠায় বসে আছে। মামীদের অনেক অনুরোধেও ও এককাপ চা খায়নি জন্য ডেড্‌বডি। সজল চোখে মামীরা চন্দনলিপ্ত করলো মায়ের কপাল। বুকে লিখে দিলো হরিনাম।

কত বড় পুণ্যাত্মা, অষ্টমীর সন্ধ্যায় মৃত্যু—

বহুজন্মের পুণ্যফল, তা না হলে অষ্টমীর রাতে—

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একলব্য। ওর কানে শুধু ভেসে আসছে টুকরো ঠুকরো সংলাপ। রোগে পাথর শ্যামলা মায়ের মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়েই থাকে একলব্য।

মা, মাগো—

মামারা তাড়া দিল। আর রাত করা ঠিক হবেনা।

অষ্টমীর রাত। কোথায় আটকে যাবে গাড়ী।

হরি বোল হরি। চাপাস্বরে কেউ বলে উঠল।

দুগ্গা মাইকি জয়— চমকে উঠলো একলব্য। কে বললো? কে দিল এই ধ্বনি? চারিদিকে দৃষ্টি বোলায় ও। কে জানে, কে বললো। আজ তো বিসর্জন নয়। মহাসমারোহে মন্ডপে মন্ডপে চলেছে দুর্গা মায়ের আরাধনা। বিসর্জন যাত্রায় চলেছে শুধু একলব্য। আলো ঝলমল অষ্টমীর রাতে দু হাঁটুতে থুতনী ডুবিয়ে মায়ের শবযাত্রায় চলেছে একলব্য, একাকী।

ইঞ্জিন স্টার্ট হলো। উৎসবের আগুনে গনগন করে জ্বলছে রাতের কলকাতা। মাইকে মাইকে গানগুলো জড়াজড়ি করে এক বিচিত্র শব্দের ঢেউ তুলেছে। উৎসবের সেই প্রাণস্পন্দনে মুখরিত কলকাতানগরী। দলে দলে নারীপুরুষ শিশু রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আজ, আজই যেন শুষে নিতে হবে উৎসবের সবটুকু নির্যাস, যেন এ এক মরণপন লড়াই।

আলোয় আলোয় ছয়লাপ কলকাতা মহানগরী, বর্নাঢ্য উজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে টেম্পো এগিয়ে চলে। মায়ের মৃত বুকের ওপর হাত রেখে বসে থাকে একলব্য। প্রেম নগরী বুঝি আজ উল্লাসে ফেটে পড়ছে। জ্যামে আটকে রইল বেশ কিছুক্ষণ টেম্পোটা। মামাতো বোন রুমি কাঁধে হাত রাখল একলব্যর।

দ্যাখ্ লবদা, চারিদিকে কত আলো, কত আনন্দ, মনে হচ্ছে মহান মৃত্যু হল মেজপিসীর। দুঃখের নয়, শোকের নয় ঢাকঢোল পিটিয়ে বিদায় দিচ্ছে সবাই।

উৎসবে মুখরিত শহরের দিকে দৃষ্টি ফেরায় একলব্য। মহান কেউ চলে গেলে শোক হয়না নাকিরে রুমি, বলতে গিয়েও বলতে পারেনা, গলা বুজে আসে। একান্ত নিজের জনের মৃত্যু ফালাফালা করে মন। একলব্য এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। চারিদিক থেকে ওকে যেন ঠেসে ধরে বোঝাতে চাইছে সবাই, এক অভূতপূর্ব মৃত্যুই ঘটেছে তোমার মায়ের। অষ্টমীর পুণ্যতিথিতে তোমার মা মরেছে, মহিয়সী সেই মায়ের জন্য গর্ব কর, গর্ব কর।

কিন্তু গর্বানুভূতি কিছুতেই আসছে না একলব্যর। বরঞ্চ এক হীনমন্যতা ছেয়ে ফেলছে ওর মনকে। হয়তো সে দিনের মাহাত্ম্যটুকু বুঝতে পারছে না। পারছে না বুঝতে এক মহাতিথিতে মৃত্যু কত গৌরবজনক।

আনন্দে উল্লাসে কলহলমুখর ও অফুরন্ত আলোকসজ্জায় সজ্জিত মহানগরীর রাস্তায় আনন্দের তালে তালে ভেসে চলেছে একলব্যর মা। গভীর বেদনায় বুকটা ভে! যাচ্ছে একলব্যর। আনন্দমুখরিত শহরের মধ্যে দিয়ে চলছে টেম্পোটা। দুছোখ বন্ধ করে রাখে একলব্য। ওর শোকস্তব্ধ। হৃদয়ে ফুটে উঠছে একটা গুরুগম্ভীর শান্ত শোকযাত্রার ছবি।

ছোট শহরটার চারিদিকে পাহাড়। শহরের একপ্রান্তে ছোট পাহাড়ী নদী। বড় বড় পাথর। নদীর ধার দিয়ে উঠে গেছে মস্ত পাহাড়। গাছে গাছে ভর্তি। নিঃসীম শান্ত সেই পাহাড়ঘেরা নদীর ধারে ছিল শ্মশান। হাজারীবাগের বোকারো থারমলে চাকরী করতেন বাবা। হঠাৎ মারা গেলেন পার্থ সেন। বুকে একঝাঁক কষ্ট নিয়ে মায়ের হাত ধরে ধীরপায়ে হেঁটে গেছিল সেদিন শ্মশানে। সে! ছিল বাবার গুটি কতো কলিগ। পাহাড়ের গা বেয়ে ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছিল। একটা বড় পাথরে বসে ছিল প্রীতি সেন। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। বিশাল প্রকৃতির কোলে বাবার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল ও। নদী, পাহাড়, পাথরের নুড়ি, নিষ্কম্পগাছগুলো সেদিন ছিল শোকে স্তব্ধ। বুকভরা বেদনার মাধুর্য নিয়ে একলব্য শেষ করেছিল অন্তেষ্টিক্রিয়া।

টেম্পোটা হঠাৎ ঝাঁকনি দিয়ে থেমে গেল। কি হল? একলব্য ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

এসে গেছে, এসে গেছো, নামো, নামো, মা মতো ভাই পিন্টু ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে এসেছে।

দুধারে বাগান। মাঝখানে পিচের রাস্তা। লোহার একটা গেট পার হয়ে ঢুকছে ওরা। একলব্য চারিদিকে চায় আলোয় ঝলমল করছে। হৈ হৈ রৈ রৈ বর। শ্মশান, এটা তাহলে শ্মশান। একলব্যকে প্রায় এক হেচকা টানে নামায় পিন্টু।

চল চল তাড়াতাড়ি। প্রচুর বডি এসেছে। লাইন লাগাতে হবে। জলদি। হুড়মুড় করে বডি নিয়ে ছুটল চারজন।

একলব্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খায়। ছোটমামা আর মেশো আবার গেটের দিকে ছুটছে তখন।

ও মামা, মামা, ওদিকে কোথায়? একলব্য মামাদের পেছনে যায়।

রেজিষ্ট্রী অফিসে যাচ্ছি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে না? যা, যা, তুই যা, পিন্টুদের সঙ্গে যা।

একলব্য ছোটে।

গণ্ কেস্। পিন্টুর বন্ধু রনি কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেন? কি হল? একলব্য ভয় পেয়ে যায়।

আসল চুল্লীগুলো বন্ধ। বাইরে এই নতুন যে দুটি চুল্লী হয়েছে, সেগুলো খালি চলছে। আর বডি দ্যাখ্— যেন আজই মরার ছিল সবার।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে একলব্য। দুটি চুল্লী চলছে। চুল্লীর সামনে চাতাল। সার সার ডেডবডি শোয়ানো রয়েছে। মা, মা কোথায়?

পাগলের মত চারিদিকে দৃষ্টি ঘোরায় একলব্য। চাতালের একপ্রান্তে শোয়ানো মায়ের মৃতদেহ।

লোকের ভীড় ঠেলে কোনমতে একলব্য মায়ের পাশে উবু হয়ে বসে।

প্রায় মিনিট পয়তাল্লিশ পর ছোটমামারা ফিরে এল। হাতে কিছু জিনিষপত্র। তার মধ্যে একটা বাঁশের মাচা মেরে ফুলগুলো সরিয়ে দিল। খাটিয়াটা টেনে নামিয়ে নিয়ে পুরুত? পুরুত কি এখনই শুরু করবে? পিন্টুর বন্ধু রনি শ্মশানযাত্রী হয়ে হয়ে এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট।

আরে দেখছেন না, আপনাদের আগে কত বড় লাইন। একটা একটা করে বডি ছাড়বে। সব হবে, তাড়া করবেন না— লুঙ্গির ওপর শার্ট পরা একটা লোক বিরক্তি নিয়ে কথা বলে।

অবসাদে যেন প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে একলব্য। মায়ের শরীরের ওপর হাত রেখে ও মাচার পাশে বসেই থাকে। বসে থাকতে থাকতে একলব্য হঠাৎ টের পায়, স্থির হয়ে ও একমিনিটও বসতে পারছে না। চারিদিকে অসংখ্য মানুষের পা ওকে সমানে ঠেলা মারছে। এপাশ ওপাশ করে কোনমতে নিজের জায়গায় খামচে বসে থাকতে হচ্ছে ওকে। হঠাৎ মায়ের শরীরটা কেঁপে উঠলো ওর হাতের নীচে।

কি হল? একলব্য চমকে তাকায়। একটা লোক মায়ের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বহু মানুষের জটলা দেখে ও চমকে ওঠে। কোনমতে উঠে দাঁড়ায়।

লোকে লোকারণ্য শ্মশান। সামান্য একটু এগিয়ে ও গেটের দিকে তাকায়। পিলপিল করে লোক ঢুকছে। নতুন জামায় সজ্জিত, মেয়েরা নানারঙের শাড়ী, কপালে টিপ, হাতে চুড়ি। ছোট ছোট বাচ্চা, নতুন জামা পরা। কোলের শিশুরাও নতুন জামা পরেছে। মায়ের কোলে ঘুমিয়েও পড়েছে অনেকে। নতুন প্যান্টশার্ট পরা পুরুষ। কারো মুখে পান, কারো হাতে জ্বলছে সিগারেট।

এরা কারা? এরা এখানে কেন? এদের কি কেউ মারা গেছে? এরা কি বিরাট একটা দল? কেন, কেন এরা আসছে কেন? কি হয়েছে এদের?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন একলব্যর মাথায় খেলে যায়। ও শুধু তাকিয়েই থাকে।

লব চা খাবি একটু— একলব্য মুখ ঘোরায়।

ছোটমামা।

মামা, এত লোক? এরা কারা?

শ্মশান দেখতে আসছে সবাই।

শ্মশানে দুর্গাপূজা হয় বুঝি?

আরে না না, শ্মশানে কালিপূজা হয়।

তবে?

পূজা দেখতে না, শ্মশান দেখতে আসছে সবাই।

হ্যাঁ রে, দুর্গা পূজাতো, মনে ফূর্তি। তাই ঘুরে ঘুরে দেখছে সবাই দ্রষ্টব্যস্থান।

দ্রষ্টব্যস্থান?

ও, প্রতিমা দেখতে নয়, দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে আসছে ওরা। একলব্য বিকল। শ্মশানের মাহাত্ম্য তো রাত বাড়লেই, মহাষ্টমীর গভীর রাত— রনি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কখন। গা ছম্‌ছম্‌ করে একলব্যর।

চাতালের ওপর প্রায় খান পাঁচেক বডি পড়ে রয়েছে। নতুন এই চুল্লীদুটির সামনে জায়গা খুব কম। আর তারই ওপর উঠে আসছে মানুষের পর মানুষ। শ্মশানের গেট দিয়ে গলগল করে মানুষ ঢুকছে। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে একলব্য দেখে মাথা শুধু মাথা। মানুষগুলো সিঁড়ির কাছে এসে জড় হচ্ছে। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে একলব্যর। ও চাতালের দিকে চেয়ে দেখে। মানুষের গতি মন্থর ওখানে।

মা ওখানে একা শুয়ে আছে বাঁশের মাচায়। পড়িমড়ি করে একলব্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

দয়া করে একটু জায়গা দেবেন। আমার মা আছে ওপরে—

প্লীজ একটু যেতে দিন—প্লীজ।

মন্থর গতি থেমে যায়। এতগুলো লোকের চোখ ওর দিকে ঘোরে। একলব্য দুহাত দিয়ে লোকদের সরাতে সরাতে ওপরে এসে মায়ের পাশে দুপায়ের পাতায় ভর দিয়ে বসে। মায়ের মাথায় হাত বোলায়। হঠাৎ একঝলক চোখের জলে ওর গাল ভেসে যায়। দু হাতে মুখ মুছে একলব্য লোকগুলোর দিকে তাকায়। অদ্ভুত এক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকগুলো। ওদের চোখ মৃতদেহগুলোর ওপর খেলে বেরাচ্ছে। কখন বা ওরা শোকে বিহ্বল আত্মীয়স্বজনের দিকে তাকিয়ে থাকছে। একলব্যর সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হয় কিন্তু ওরা চোখ ফিরিয়ে নেয় না। অপরিচিত মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না কিন্তু উৎসবমগ্ন মানুষগুলো আজ মৃত্যুলীলা দেখছে, তাই ওদের দৃষ্টি কাঁপে না।

মৃতদেহ, শোকার্ত আত্মীয় বা গনগনে চুল্লীর মধ্যে মৃতদেহ চালান (শেষ দৃশ্যটা অবশ্য কতিপয় ভাগ্যবানের কপালেই জুটছে) দু চোখ ভরে দেখছে ওরা। পালা দেখতে দেখতে এক যুবতী খিলখিল করে হাসছে। পেছনে দাঁড়ানো যুবতীটি বোধহয় কিছু রসিকতা করেছে। বাচ্চা কোলে মায়েরা, বাচ্চার হাতধরা মায়েরাও দাঁড়িয়ে পড়ছে চাতালে উঠে। ডেডবডির সঙ্গে আসা কোন লোক হয়তো কিছু নালিশ জানিয়েছে, তাই শ্মশানের দুটো যন্ডামার্কা লোক হঠাৎ একলাফে সিঁড়ি বেয়ে চাতালে এসে লোকগুলোকে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে।

কি দেখছেন এ্যাঁ? যান যান— পিছু হটুন—

দর্শকদের মধ্যে দুটি মস্তান ছেলে পেছু হটে না।

মারমুখী হয়ে এগিয়ে আসে।

ধাক্কা মারছেন কেন? আঁ— ধাক্কা মারছেন কেন?

এটা কি মগের মুললুক— না শালা তোমার জমিদারী।

এ্যাই শালা, খিস্তি করবি না, ক্যওড়া শালা—

এটা কি ডেডের কেনা সম্পত্তি?

মরার লোকজন দাঁড়াবে কোথায়?

সে শালা গর্মেন্ট বুঝবে।

তোরা সরবি কিনা বল—

পূজার দিন একটু ফূর্তি মারবো না?

ফূর্তি মারার জায়গা পেলি না আর?

ইলেট্রিক চুল্লী দেখব না? ইলেট্রিক চুল্লী কি আজ হয়েছে?

হয়েছে, তবে সব সময় কি দেখা হয়?

দু তরফের বচসা চলতেই থাকে। ঠেলা খেয়ে একটু সরে লোকগুলো আবার আসে, আবার ঠেলা খায়।

একলব্য হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। দু হাত জোড় করে এগিয়ে যায় লোকগুলোর দিকে।

প্লীজ আপনারা একটু সরে যান। বড় দুঃখের দিন আমাদের। শেষ কাজটা একটু শান্তিতে করতে দিন ভাই—

ফট্ শালা— বাড়ি গিয়ে শান্তি কর। এটা পাবলিক প্লেস্।

ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির মধ্যে মায়ের মুখাগ্নি করে ও। পুরুতের মন্ত্র কানে আসে না। থরথর করে কাঁপে দুটি ঠোঁট।

ও বলে চলে— মা, মাগো।

মা মা ডাকতে ডাকতে একলব্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কাতরকণ্ঠে বলে— একটু নির্জনতা মা, একটু শান্তি।

যন্ত্রচালিতে মত মায়ের পায়ে একবার হাত রাখে একলব্য। আলতো স্পর্শ করে উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় চাতালের শেষ প্রান্তে। হঠাৎ এক প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে ওর অন্যমনস্ক চোখ সজাগ হয়ে ওঠে। আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মৃদু বাতাস মুহূর্তের মধ্যে উত্তাল হয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে একলব্যর হাতে। মিনিট পাঁচকের মধ্যে প্রবল বৃষ্টি নামে। শ্মশানের গাছপালাগুলো আছাড়ি পিছাড়ি খায়। মামাদের বারণ অগ্রাহ্য করে একলব্য সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টির ছাঁটে ওর শরীর ভিজে যায়। গেটের দিকে চোখ পড়ে ওর ফাঁকা। বৃষ্টির জলের আস্তরণে ঝিরঝির করে কাঁপতে থাকে দূরের আলোকমালা। গভীর মনোনিবেশে একলব্য তাকায় গাছগুলোর দিকে। গাছের নীচে অন্ধকারের বৃত্ত। মনে হয় অনেকগুলো লোক বুঝি জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে গাছের নীচে। গেটের বাইরের দোকানের শেডগুলো অস্পষ্ট, আচ্ছা, কালো কালো ওগুলো কি মানুষের মাথা? হঠাৎ বাধা পেয়ে ওরা কি দাঁড়িয়ে পড়েছে। একলব্য আবার চোখ ফেরায় গেটের দিকে। না, একদম ফাঁকা। বৃষ্টি বাড়তেই থাকে। গুম হয়ে পড়ে থাকা প্রকৃতি এখন দুর্বার, দুর্দমনীয়।

অঝরে বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। জল জমে গেছে বেশ। অষ্টমীর রাতে মহাপ্রলয়-কে একজন মন্তব্য করে।

খুব অমঙ্গল, দেবী এবার ডুবিয়ে দেবে সব।

চারিদিক ফাঁকা, কয়েকজন দর্শক শুধু আটকে পড়েছে চাতালে। কৌতূহলের বদলে ত্রাসের ছায়া পড়েছে মুখে। মাকে চুল্লীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একলব্য বসে পড়ে সিঁড়িতে। বৃষ্টিতে স্নাত হয়ে ওর চোখ, সুখ, সম্পূর্ণ শরীর। বিদ্যুতের গর্জন শোনা যাচ্ছে আর বৃষ্টির একটানা শব্দ। দু হাঁটু মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে দেবার আগে, একবার আকাশের দিকে তাকায় একলব্য, বলে— ঈশ্বর, তুমি দয়াময়।

প্রতিবিম্ব

চেম্বার যখন জোর কদমে চলছে তখনই ঘটনাটা ঘটল। এত অপ্রত্যাশিত যে সবাই প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিল। অবশ্য তার জন্য চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়নি। সং! সং!ই ডাক্তার এসেছে, সং! সং!ই অ্যাম্বুলেন্স। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেছে নার্সিংহোমের চত্বরে। দিব্যি কোর্ট সেরে বাড়ি ফিরে রোজকার মতো চেম্বারে এসে বসেছিলেন মিঃ রজত রায়। বাড়িতেই ওঁর চেম্বার। জুনিয়রদের বকাঝকা, মক্কেলদের সং! কনফারেন্স, যেমন চলে আর কি রোজ। কিন্তু কি যে হল মিঃ রায়ের। রক্ষিত এ্যান্ড রক্ষিতের মতো সলিসিটর ফার্মের একজন সিনিয়র পার্টনার মিঃ সিনহার সং! হঠাৎ বচসা শুরু করে ফেললেন। ইস্যু কিন্তু খুব সামান্য। মিঃ রায়ের ভাষাতেই বলা যায়, নেগলিজেবল। একটা সেকেন্ড অ্যাপিলের ব্রিফ নিয়ে এসেছিলেন মিঃ সিনহা। বেশ কয়েকটা জটিল ল পয়েন্ট ইনভলব্ড। আলোচনা চলছিল অনেকক্ষণ ধরে। মিঃ রায়ের বন্ধুস্থানীয় মিঃ সিনহা। কাজ করতে করতে তাই বোধহয় কিছুটা হাল্কা হওয়ার জন্য বলেছিলেন— একটু সময় দিও হে। এই মামলাটা যেমন তেমন করে করা যাবে না। সুশোভন সেনকেও মাথা ঘামাতে হতো কেসটাতে।

হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন অ্যাডভোকেট রায়— সুশোভন সেনকেও মাথা ঘামাতে হতো— কথাটার মানে? তার মাথা কি ঘামাবার মাথা নয়? মিঃ সিনহা হেসে ফেললেন— সত্যিই, লোকটার কী আছে বল তো ওই মস্তিষ্কটায়। সব সময় কেমন ঠাণ্ডা। আদার সাইড যখন গলা ফাটায়, ভদ্রলোক কেমন ঋষির মতো বসে থাকেন। আর — আর উঠে যখন বলেন একেবারে জব্বর। দুটো কথা, কিন্তু অমোঘ।

থামো থামো। বড্ড বেশি মাথায় তুলেছ তোমরা ওকে— তখনও মিঃ রায় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিলেন। মাথায় তোলার মতোই যে। ব্রিফ নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, টু জেন্টলম্যান ফর দিস প্রফেসন— মিঃ সিন্‌হার ওপর তর্ক করার জেদটা যেন চেপে বসছিল। উনি বলেই চলেন— আইনটা এত ভালো বোঝে। হবেই না বা কেন? কত বড়ো ব্যারিস্টারের ছেলে, কত বড়ো—

আরে ওটাই তো ওর মুলধন। বাপের পয়সা আছে, তাই ওসব ভান— মিঃ রায় যেন এতক্ষণে একটা জুতসই জবাব খুঁজে পেয়েছেন।

এটা বলো না। বাপ বড়ো উকিল তো অনেকেরই। তারা মামলা পাওয়ার জন্য হা পিত্যেশ করে না? আসলে লোকটার জাতটাই অন্য, আলাদা— ব্যাপারটা আলাদা। মিঃ সিনহাকে বেশ রূঢ়ভাবেই থামিয়ে দেন রজত রায়— তবে গেলে না কেন হে তার কাছে।

তর্কটা যে বাঁকাপথ ধরেছে সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেই মিঃ সিনহা কথা কাটাকাটি থামাবার জন্য বলেন — প্রত্যেক মাসে আমাদের ফার্ম থেকে ও ছটার বেশি মামলা নেয় না।

চার চারজন জুনিয়র ঘরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, তাদের সামনেই ব্লাডপ্রেসারের পেশেন্ট মিঃ রায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ফেটে পড়েন—

ও, সে নেয়নি বলে আমার কাছে এসেছ? আমরা সব ফালতু, না? কুড়িয়ে খাবো এঁটোকাঁটা— আরে, আরে — একজন ভদ্র, সভ্য, সমাজের মাথা, অ্যাডভোকেটের মুখে একি ভাষাহ্লু ওর ভাষায় চমকে উঠতে গিয়ে, মিঃ সিনহা চমকে গেলেন হঠাৎ রজত রায়কে ঢলে পড়তে দেখে। আর তখনই — ধরো, ধরো— সকালবেলা এসির সুইচটা অফ করে দিয়ে পর্দাটা টেনে দিতেই, এক চিলতে বালক রোদ টুক্ করে ঢুকে পড়ে ঘরে। বিছানায় ওম্ ছড়িয়ে পুরো ঘরটাকে মুড়ে দেয় সোনালি আভায়। সারারাত এসিটা চলেছে। হাত পাগুলো তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মেশিনটার একটানা ঝিম ধরা শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই এক ঝটকায় ক্লান্তিটা দূর হয়ে যায় রজত রায়ের। চন্‌মন্ করে ওঠে মনটা, তরতাজা লাগে। মুখটুখ ধুয়ে, ব্রাশ করে, চুলটুল আঁচড়িয়ে ও এখন একদম সতেজ। সকালবেলাই মণিদীপা ঘরের ফুলটা পালটে দিয়ে গেছে। একসেট বেডসিট, পিলোকভার, তোয়ালে নার্সের হাতে দিয়ে মণিদীপা ওর মাথায় যখন হাত রেখেছিল তখন সকাল ঠিক সাতটা। আর আটটার মধ্যে রজত রায়ের বাসি শরীর ও বাসিঘরকে টাটকা করেই নার্স এসিটা বন্ধ করে পর্দাটা টেনে দেয়। আরও একরাশ টাটকা বাতাস দরজা খুলে ঘরে ঢোকায় সুনন্দ।

কেমন আছেন?

কেমন দেখছ বলো? স্মিত মুখে তাকান মিঃ রায়। ভালো, খুব ভালো। কার্পেটের ওপর চেয়ার শব্দ তোলে না। তবুও সুনন্দ চেয়ারটা আলগোছে টেনে বসে।

ফাইন, এক্সট্রিমলি-ফাইন। ঝরঝরে গলায় বলেন রজত রায়।

আরও কটা দিন রেস্ট নিন স্যার। আমরা তো আছিই, কোন চিন্তা করবেন না। সুনন্দর আশ্বাসে কোনও কাজ হয় না। বহুদিন পর আজ কিছুটা ছাড় পেয়েছেন কথা বলার। নার্সিংহোম থেকে মুক্তি পেয়ে মোটে দুদিন হলো বাড়ি ফিরছেন। জুনিয়র সুনন্দকে কাছে পেয়ে আজ আর উনি থামেন না—

বল, বল, লিস্টের মামলাগুলো কী করলে? প্রশ্ন করতে করতেই মিঃ রায়ের গলা কিছুটা চড়ে যায় উৎকণ্ঠায়।

অ্যাডজরনমেন্ট করিয়ে নিয়েছি স্যার আপনার অসুস্থতার গ্রাউন্ডে — সুনন্দ একটু নার্ভাস। স্যার, আপনি টেনসড্ হবেন না। সিক্স উইকস্ অ্যাডজরনমেন্ট পেয়েছি। আবার করিয়ে নেব। প্রত্যেকটা কোর্টরুমেই আমরা চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছি সবসময়।

সুনন্দ দরজার দিকে তাকায়। স্যারের স্ত্রী এসে গেলেই এখন বিপদ, তার ওপর স্যারও বেশ রেগে উঠেছেন।

তোমরা বড্ড সহজে সমস্যার হাল করে ফেল বলেই কিছু হয় না বুঝলে। অ্যাডজরনমেন্ট নিলে যখন এইট উইকস্ চাইলে না কেন। দু সপ্তাহের মধ্যে সেরে যাব আমি? এক মাসের বেশি তো হয়েই গেল আমি বিছানায়। দশবারো দিনে যাব মামলা করতে? পারবে, পারবে তোমরা ডাক হলে হিয়ারিং করতে? যদি ফারদার অ্যাডজরনমেন্ট না পাওয়া যায়?

ফুঁসে ওঠেন রজত রায়।

ঘরের কোণ থেকে নার্স ছুটে আসে— আর কথা বলবেন না আপনি। এবার কিন্তু বৌদিকে ডাকতে হবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সুনন্দ, মোটামুটি মামলাগুলো পড়েশুনে রেডি থেকো তুমি আর জয়ন্ত। সুপর্ণাকে অরিজিনাল সাইডটা দেখতে বলো। আর রঞ্জন— থাক্, ওটা একটা অপদার্থ।

আচ্ছা স্যার, ঘর থেকে প্রায় পালিয়ে বাঁচে সুনন্দ।

রজত রায় জানেন একদম রাগারাগি করা উচিত নয় ওঁর। একটা অ্যাটাক হয়ে গেল ছোট মতো। তিনসপ্তাহে নার্সিংহোম থেকে যে ছাড়া পেয়েছেন সেটাই বাঁচোয়া। আরও যদি থাকতে হতো? কার্ডিওলজিস্ট বাড়িতে এসে দেখে যাচ্ছেন। দু শিফটে দুজন নার্স। মণিদীপার তদারকিতে চিকিৎসা ভালোই চলছে। কাল থেকে নিয়মের কড়া বাঁধন একটু শিথিল হয়েছে। কালই ডক্টর সেন বলেছেন— কমপ্লিটলি আউট অফ ডেনজার।

রাগারাগি করে একটু ক্লান্ত লাগছে। সকালবেলার তাজা ভাবটা চলে গিয়ে ক্লান্তিটা চেপে বসছে অল্প অল্প। কাজ, কাজ আর কাজ। রোববার সকালে চেম্বারে না বসে, বিছানায় শুয়ে আছেন উনি, ভাবা যায়?

সকাল সাতটা থেকে বারোটা অবধি একটানা ডুবে থাকতেন কাজে। এক মুহূর্তের জন্যও মানসিক কোন শৈথিল্য অনুভব করেছেন কি? কই, মনে তো পড়ে না। দেহ কখনও কখনও বিগড়ে উঠলেই মন চাবকে সিধে করে দিয়েছে। আবার চলেছেন নিরলস, একটানা কাজ না করলে চলবে কেন এই প্রফেশনে? প্রতি মুহূর্তে এখানে টিকে থাকার সংগ্রাম। এক পলের জন্যও অসাবধান হওয়ার উপায় নেই। জীবনে এত খেটেছেন বলেই না আজ এতগুলো সিঁড়ি টপকেছেন। প্রতিটি মক্কেলের মামলাকে নিজের মনে করে লড়েছেন। কখনও ড্রাফটিং সম্পূর্ণভাবে জুনিয়রদের হাতে ছাড়েননি। ড্রাফটিং হয়ে গেলে সেটা সেটল করার নামে প্রায় পুরো পিটিশনটাই হয়ত ডিকটেশন দিয়ে দিয়েছেন। ক্লার্ক অ্যাফিডেভিট করতে যাওয়ার আগে ক্লারিকাল কাজগুলো ঠিকঠাক হয়েছে কি না খুঁটিয়ে দেখেছেন। একটা ঘরে মামলা করছেন, অন্য ঘরে মামলার ডাক হতে পারে। তাই জুনিয়র আছে বলার জন্য হি ইজ অন হিজ লেগস্। তবু মামলা শেষ করেই ছুটতে ছুটতে গেছেন সেই কোর্টে— কী হল? নট টুডে করিয়ে নিয়েছ তো মামলাটা? তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল কখন। হালকা একটা ঘুমের আস্তরণ ওঁর চেতনার ওপর ছড়িয়ে ছিল। একটা চাপা স্বরে চোখ মেললেন।

ভালো আছো? দুটো চেনামুখ সামনে।

ঘাড়টা সামান্য কাত করেন রজত রায়।

সুদীপ দে, নিখিল বাগচী।

ওনার একদম কথাবার্তা বলা বারণ। ডাক্তারবাবু কালও বলেছেন। নার্স ওর সাবধানবাণী আওড়ায়।

আরে বাবা, হেড অফিসের পারমিশন নিয়ে এসেছি। পারমিটে বলা আছে ইউ ক্যান স্পিক, বাট হি ক্যানট। বলো ব্রাদার বলো, আছো কেমন?

সুদীপ একটা পা আর একটা পায়ের ওপর দিয়ে বসে। নিখিলকে একটু দূরে বসতে হয়। রজত রায়ের পায়ের দিকটাতে ওর চেয়ার।

ভালোই তো। তখনও মাথার ভেতর একটা ভোঁ ধরা অনুভূতি।

কী হল বল তো হঠাৎ—

সুদীপ কৌতূহলী।

হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার, বুকে চাপ।

তারপর?

আর কিছু না। তাও এই শাস্তি।

আস্তে আস্তে মাথার চাপটা ছাড়তে শুরু করেছে মনে হয়।

বেশ দুর্বল হয়ে গেছ তো— নিখিল এতক্ষণে কথা বলে।

আরে হবে না? শুধু রোজগারের ধান্দা। মক্কেলের পেছনে ছোটা। সুদীপের বিদ্রূপের বেশ কাজ হয়। মানসিক অবসাদের চাদরটা এক লহমায় সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়।

সুদীপ, জেলাসিটা ছাড়তে পারছ না হে, আমাকে রোগশয্যায় দেখতে এসেও। রজত রায়ের বন্ধ দুটো ঠোঁটের একটুকরো হাসির নিচে কথাগুলো খেলে যায়। একই ইয়ারে সুদীপ দে, নিখিল বাগচী, আর রজত রায়ের এনরোলমেন্ট। অথচ কোথায় ওরা আর কোথায় মিঃ রজত রায়। তরতর করে উঠে গেছেন মিঃ রায় সাফল্যের তুঙ্গে। বড় হতে হবে, অনেক বড় অ্যাডভোকেট। ভেতরের এই তাগিদটা ওঁকে তাড়না করেছে সব সময়। পশুর মতো খেটে, নিজের সুখ শান্তি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু কাজ করে গেছেন। রজত রায় নিজেকে কখনও প্রশ্রয় দেননি, কখনও নিজেকে সহানুভূতির চোখে দেখেননি। আত্মসমালোচক মিঃ রায় নিজের পিঠে কশাঘাত করে চালিয়েছেন নিজেকে। অথচ হিংসে কত ওদের। কোনও কিছু না দিয়েই যেন হাতিয়েছেন রজত রায় ওঁর সাফল্যের ভাণ্ডটা।

মাস দেড়েক আগে একটা খুব জটিল মামলায় জিতে বেরোবার মুখেই সুদীপের সঙ্গে সামনাসামনি। কোর্টরুমেই ছিল সুদীপ। আড়চোখে সেটা আগেই দেখেছেন মিঃ রায়। কিন্তু মামলাটা শেষ হতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। রজত রায়ের অসামান্য বাগ্মিতা ও আইনের অগাধ জ্ঞানটা যে দেখে ফেলেছে সেটাই অস্বীকার করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রজত রায় ছাড়ার পাত্র নয়।

কি হে? পালাচ্ছ নাকি? মিঃ রায় বেশ হেসে হেসে বলেন।

পালাব কেন? মামলা আছে তাই— তখনও সুদীপ ওঁকে এড়াতে চাইছিল।

মামলা? অন্যঘরে? তবে এখানে এতক্ষণ কী করছিলে? রজত রায়ের গলায় অবাক হবার ভান।

ও, তুমি ভাবো শুধু তোমারই মামলা। আর কারও নেই, তাই না? ইউ আর বিটিং ইয়োর ওউন ড্রাম।

সুদীপ দে'র গলায় তখন মুঠো মুঠো ঈর্ষা।

ইফ আই ডোন্ট, হু ইজ গোয়িং টু বিট মাই ড্রাম। উইল ইউ?

সুদীপ আর নিখিল অবশ্য খুব বেশিক্ষণ বসেনি। মণিদীপা চলে আসাতেই সুদীপ খুব একটা হালে পানি পায়নি। নিখিল তো এমনিতেই চুপচাপ। এত চুপচাপ, ম্যান্দামারা লোক কি আর এ লাইনে কিছু করতে পারে? তবে লোকটা ভালো। বেশ নির্ভেজাল ভালোমানুষ। ওকে খারাপ লাগে না।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ রজত রায়ের গা স্পঞ্জ করার জন্য নার্স সব তোড়জোড় শুরু করতেই সুদীপ আর নিখিল উঠে দাঁড়াল।

রজত রায়কে বলল সুদীপ— চলি তাহলে। তারপর মণিদীপার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বলে— ওকে এবার টাকার লোভটা ছাড়তে বলুন ম্যাডাম।

টাকার লোভ? টাকার লোভের জন্য কি রজত রায় খেটে মরছে সারাদিন। না, টাকা না, প্রফেশনাল সাকসেস। উনি প্রফেশনাল সাকসেস চান। কিন্তু সাকসেসটা এমন যে যত সাকসেস, তত টাকা। সবাই তাই ভাবে রজত রায় টাকার পেছনে ছুটছেন। একদিন প্র্যাকটিসে শিখরে উঠবেন। সবাই একবাক্যে বলবে— রজত রায় এক নম্বর। রজত রায় সেরা। এই সেরা শব্দটাকে নিজের নামের সঙ্গে জোড়ার জন্যই তো ওঁর এই সাধনা। কিন্তু হঠাৎ এই শরীর খারাপ দিল ওঁকে পেছন দিকে এক ধাক্কা। যখন দশ কদম এগিয়ে যাওয়ার কথা, গেলেন দশ কদম পিছিয়ে। ছুটন্ত অবস্থাতেই ওঁকে জালে বন্দি করে ছটফটিয়ে মারছে নিয়তি। কিন্তু নিয়তি মানেন না মিঃ রজত রায়। পুরুষকার দিয়ে ছিনিয়ে নেবেন সেরা উপাধিটা। উঠে বসবেনই একদিন উঁচু সেই আসনটাতে যেখানে বসে থাকলে মুখে খেলা করে শুধু দীপ্তি, অনাসক্তের ছটা, প্রশান্তির আলো।

যে মামলা পাচ্ছেন সেই মামলাই মনোযোগ দিয়ে করছেন রজত রায়। মক্কেল ছাড়া কি এ স্টেজে পোষায় ওঁর? আর মক্কেল বেশি নিচ্ছেন বলে কি কাজ ঠিক করে করছেন না? সব করছেন। সব করছেন চরম আন্তরিকতার সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, ওই নির্লোভের অভিনয়, নির্লিপ্ততার ভান এখনও করতে পারেন না। কিন্তু ওটাই ওঁকে পারতে হবে, পারতেই হবে একদিন।

সব সময় ওঁর মুখে আঁকিবুঁকি, টেনশনের ছাপ। এত চেষ্টা করেন মনটাকে বাগে রাখতে, কিন্তু কী করে সম্ভব সেটা? এত চাপ কাজের। মামলার চাপটা আবার না থাকলেই তো করিডোরে গুজব চালু হবে শালা ব্রিফলেস। মামলার বোঝা ঘাড়ে নিয়েই পৌঁছতে হবে সেই লক্ষ্যে, যখন মুখে ঝুলবে প্রশান্তির প্রলেপ, নির্মোহতার ছাপ।

কোনও মক্কেলকে বিমুখ করেন না রজত রায়। গরিব, বড়লোক সব মক্কেলের মামলা করেন একই মনোনিবেশে। রজত রায় জানেন কোর্টে যখন মামলাটা আর্গুমেন্ট করেন তখন সবাই ওঁর দক্ষতা দেখে, মক্কেলের পকেটের হিসেব কষে না।

ওঁর এই সদাব্যস্ত মনোভাব ওঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই সাফল্যের চূড়ার দিকে, কিন্তু উনি এও বোঝেন ওঁর এই উত্তেজনা, ইনভলবমেন্ট যতদিন থাকবে ততদিন ওঁকে কেউ সেরা বলবে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে একটা সতেজ মুখ দেখার আশা করেন কারণ শরীরটা তখন ঝরঝরে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে মুখটা হয়ত বা লাগেও তাই। কিন্তু দেখতে দেখতে নানা আবেগের কম্পন খেলা করতে শুরু করে প্রতিচ্ছায়ায়। বিরক্ত লাগে। ভীষণ বিরক্ত লাগে। আর তখন? আর তখন কাচে ভাসে ভুরু কোঁচকানো, কঠিন অশান্তির বক্ররেখায় কণ্টকিত একটা মুখ। স্নান করার সময়, চুল আঁচড়াবার সময়, জঘন্য ওই মুখটা সাক্ষী থাকে মিঃ রজত রায়ের অন্তঃস্থলের বিক্ষোভের, যন্ত্রণার, হতাশার। মামলা যখন করেন, তখনও ওঁর হাত ঘামে। উত্তেজনা হয় ভেতরে ভেতরে। উনি বেশ বোঝেন কোর্টরুমের প্রত্যেকটা লোক আয়নায় প্রতিফলিত সেই কদর্য মুখটাই দেখছে।

সারাদিনে বহুবার নিজের সামনে এই প্রশ্নটা রাখছেন মিঃ রজত রায়। কিসের ভিত্তিতে সুশোভন সেন বড়? কিসের ভিত্তিতে সেরা? রজত রায় জানেন, মুখে শুধু এক নির্লিপ্তের মুখোশ এঁটে লোকটা সেরার আসনে সেঁটে বসে আছে। ওর ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাকাউন্ট ক্লিন। ওর প্রতিটি মামলা সলিসিটর ব্রিফ। বড় বড় হিয়ারিং করেন উনি। সারাদিন ধরে চলে মামলা একটা ঘরে। আজ পর্যন্ত কোনও দিন করিডোরে কেউ দেখেনি এক কোর্টরুম থেকে আর এক কোর্টরুমে উনি ছুটে চলেছেন। ঠিক দশটা পঁচিশে কোর্টে ঢোকেন। গাড়ি থেকে নামেন যখন তখনই সম্পূর্ণভাবে গাউন, কলার ও ব্যান্ড পরে তৈরি। পেছনে আর্দালি, হাতে বড় ফ্লাস্ক, টিফিন ক্যারিয়র। একজন বেয়ারা বইয়ের গুচ্ছ একটা বড় ব্যাগে নিজে আসে। ব্রিফগুলো আর একট ব্যাগে। সব কিছু গোছানো, ছিমছাম। সুশোভন সেন আস্তে আস্তে হেঁটে যান। একটা হাতে পাইপ ধরা, অন্য হাতটা পেছনে। লিফটের জন্য দাঁড়ান। লাইনে না, পাশে দাঁড়ান। লিফটের দরজা খুললে প্রথমে ঢোকেন। লিফটের লাইনে এগোতে এগাতে যখন রজত রায় এই দৃশ্য দেখেন ওঁর সারা শরীর জ্বলে যায়। রাগে মাথার শিরা দপদপ করে দিনের শুরুতেই।

রজত রায়ের দুটো গাড়ি, সুশোভন সেনেরও দুটো। শুধু সুশোভন সেনের বাড়িটা সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড আর রজত রায়ের ড্রইং রুম, বেডরুম ও চেম্বারে তিনটে দেড় টনের মেশিন। এইকুটুই যা তফাৎ। কিন্তু লোকটাকে দেখো— তীক্ষ্ণ একটা ঘৃণা ক্ষতবিক্ষত করে রজত রায়কে। লোকটা যেন সবকিছু ওপর থেকে দেখছে। আসক্তিহীন, নির্বিকার দৃষ্টি। ভণ্ড, এক নম্বরের ভণ্ড আর ধড়িবাজ। রজত রায়ের চারটে জুনিয়র, সুশোভন সেনের একটা। একটা অ্যাপেলেট সাইডের ক্লার্ক। দুটো ক্লার্কই রাখতে হয় রজত রায়কে। সুশোভন সেনের একজন। ওর নাকি বেশি ক্লার্কের প্রয়োজন নেই। সবকিছু গুছিয়ে সলিসিটর ফার্ম মামলা তুলে দেয় ওঁর হাতে। মামলাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেন, সম্ভাব্য সব কেস সাইট করে সুশোভন সেন আর্গুমেন্ট করেন। প্রশস্তির ফিরিস্তি আর কিছু শুনতে না চাইলেও শুনতে হয়। বাড়তি সবকিছু ছেঁটে ফেলে শুধু নাকি মামলাতে মনোনিবেশ করেন। ড্রাফটিং, টাইপ,

অ্যাফিডেভিট নোটিস সার্ভিস— সব ঝামেলা সলিসিটর ফার্ম মিটিয়ে দেয় ওঁর হয়ে। মূল মামলাটা দেয় ওঁর হাতে। নারকেলের শাঁসটুকু বার করে দিয়ে দাও ওঁকে, উনি পাক দেবেন আইনের রসে, বুদ্ধিমত্তার ইন্ধনে। নারকেলের ছোবা কার কাজে লাগছে, পাতা চেঁছে কে ঝাঁটা বানিয়ে রোজগার করছে, সেদিকে দৃকপাত করেন না।

এত গাওনা সহ্য হয় না রজত রায়ের। রাগে থমথমে মুখ নিয়ে উনি একদিন বলেছিলেন— ফালতু ঝামেলাগুলো যে ভাই আমাদের করতেই হয়। সলিসিটর ব্রিফ হলে না হয় ওরা ঝামেলাগুলো সারে, কিন্তু নিজস্ব মামলার বেলায়— বেয়াড়া গোছের একটা উত্তরও পেয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই— আরে তাই তো ওর সব সলিসিটর ব্রিফ। রজত রায় দিনে কত মামলা করে তার হিসেব রাখতে হয়! আর সুশোভন সেন ধীর গলায় বড় কম্পানির একটা সুটের হিয়ারিং চালিয়ে দেয় প্রায় দিন চারেক। প্রফেশনালি মোর সাক্সেফুল কি কিছুতেই বলা যায় না রজত রায়কে?

প্র্যাকটিস যতই জমাও না কেন, প্রফেশনাল জেলাসি অনবরত চেষ্টা করে জমানো প্র্যাকটিসটাকে বানচাল করতে। এই অ্যাডভোকেট বেশ ভালো করছে, ল্যাং মারো ওকে। কাজে না পারো, কথায় তো পারো। তাই — ও আইন কী বোঝে? শুধু লাইনবাজি জানে। ওটা একটা গণ্ডমুখ্য।

দ্যাখো কত কথা লাইব্রেরিতে, যেন ধরে রাখা যাবে না। আর্গুমেন্ট করতে দাও, তখন ল্যাজে গোবরে। করিডোর থেকে টুকরো টুকরো আড্ডাতে এসব কথা চলে। কিন্তু সুশোভন সেন যখনই হেঁটে যান, চুপ করে যায় সবাই। উনি ব্যস্ত নন, বড়। বড় বড় হিয়ারিং করেন, বড় বড় সুট। আইনের সমুদ্রে ওঁর অবগাহন, গভীর অতলস্পর্শী। ডানা ঝাপটানো নেই। ওঁর অভিধানে নেই কাকস্নান নামে কোনও শব্দ।

অথচ লোকটা মোটে এনরোলমেন্ট অনুযায়ী দুবছরের সিনিয়র রজত রায়ের থেকে। দুবছর আগেও তো রজত রায় খেটেছে কম না, দুবছর আগের সুশোভন সেনের আসনটি পাওয়ার আশায়। কিন্তু কোথায় কী? দুবছর পর দেখলেন মামলা ওঁর অনেক বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু সুশোভন সেনের গদিটা আবার লাফ মেরে এগিয়ে গেছে দুবছর।

মিঃ রায়ের জুনিয়রগুলোই কি কম নাকি? একটু আস্কারা দিলেই মাথায় চড়ে বসে। এক রোববার চারজনের সঙ্গে বেশ হালকা মুডে চেম্বারে চা খাচ্ছিলেন বিকেলের দিকে। হঠাৎ ওই গাধা রঞ্জন বলে উঠল— প্রফেশনের চূড়ান্ত সাক্সেসের মাপকাঠি হল সেটাই যখন একজন অ্যাডভোকেট ব্রিফ রিফিউজ করতে পারে।

রজত রায়ের ইচ্ছে হয়েছিল একটা চড় কশান হারামজাদার গালে। ওর ইঙ্গিতটা উনি ঠিক বুঝেছেন। সেদিন সকালেই এক মক্কেল একটা মামলা নিয়ে এসেছিল। মক্কেল কথায় বলল সে নাকি একবার গেছিল সুশোভন সেনের কাছে একটা মামলা নিয়ে সুশোভন সেন এক কথায় মামলাটা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন— আই অ্যাম নট ইন দ্যা রেস।

মাসখানেক আরও বিছানায় থাকার পর মিঃ রায় আর একদম বিছানায় পড়ে থাকতে রাজি হলেন না। যদিও বা রাজি হতেন আরও দিন কয়েক বিশ্রাম নিতে, কিন্তু সুনন্দর কাছে নিদারুণ খবরটা শোনার পর আর কিছুতেই বিছানায় থাকা সম্ভব হল না। এই ভয়টাই ছিল ওঁর। বেশিদিন অ্যাডভোকেট কোর্ট, চেম্বারের বাইরে থাকলেই মক্কেল অধৈর্য হয়ে পড়ে। এতদিনের পুরনো মক্কেল মিঃ দুবে কিনা অ্যাডভোকেট গুপ্তকে দিয়ে সেলস ট্যাক্স মুভ করিয়েছে। সুনন্দ খবরটা শুনেই ছুটে এসেছিল মিঃ রায়ের বাড়িতে। কোর্ট থেকে সোজা। রজত রায় প্রথমটায় চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিলেন। নিজের পিঠেই হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে সুনন্দকে বলেন সবাই তো কেড়ে নেওয়ার জন্যই বসে আছে।

মিঃ দুবে। যার ইনকাম ট্যাক্সের ক্রিমিনাল প্রসিডিংগুলো আমি স্টে করিয়ে দিলাম বেইমান, সব বেইমান।

ভেঙে অবশ্য পড়েননি উনি। শুধু রাত্রিবেলায় দৃঢ়গলায় মণিদীপাকে জানিয়ে দিয়েছেন— কাল থেকো চেম্বারে বসব, পরশু থেকে কোর্ট। সন্ধ্যায় চেম্বারে আসার আগে দুর্বল হৃদপিণ্ডটাকে বাগ মানাতে বেশ কষ্ট অনুভব করেছিলেন মিঃ রায়। এতদিনে কর্মক্ষেত্রটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। জোর সঞ্চয় করে একটা বিরুদ্ধ পরিবেশ মোকাবিলা করার ভাবনা মাথায় নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন মিঃ রায়। সন্ধ্যে ঠিক সাতটায়।

চেম্বারে ঢুকে উনি হতবাক। মক্কেলদের ঘর ভর্তি। উনি ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সবাই।

কেমন আছেন স্যার?

ভালো, ভালো, বসুন আপনারা।

মিঃ রায় অবাক হন দেখে যে ভিড়ের মধ্যে মিঃ দুবেও আছেন।

হ্যালো মিঃ দুবে? মিঃ রায়ই আগে কথা বলেন।

দুবে বোধহয় সংকুচিত একটু? নাকি না? মিঃ রায় একনজরে জরিপ করার চেষ্টা করেন।

রায়বাবু, আপনি আমাদের মা বাপ, একটা দারুণ ক্ষতি করে দিল আমার গুপ্তবাবু। যতবার যত বিপদেই পড়েছি আমি, আপনি বাঁচিয়েছেন। রায়বাবু, আপনি এত অসুস্থ হলেন আর তখনই কিনা আমার এত বিপদ এল যে ছুটতে হল অন্য আরেক জনের কাছে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে, মিঃ দুবে— অ্যাডভোকেট রজত রায়ের দুটি হাত তখনও কলুটোলার ঝানু ব্যবসায়ী দুবের দুহাতে জড়ানো। হাতের তেলোটা বেশ গরম হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। এবার অন্য মক্কেলদের দিকে ঘুরে দাঁড়ান রজত রায়।

কী যে ভয় পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের যে কী হত যদি—

ওদের গলার স্বর কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। একটা চমৎকার ভরা মন নিয়ে নিজের ঘরে ঢোকেন রজত রায়। তিনজন জুনিয়র আছে, রঞ্জন খালি অনুপস্থিত।

আসুন স্যার, আসুন। নিজের চেম্বারেই সবাই অভ্যর্থনা করা ওঁকে।

সুপর্ণা বলে— কেমন লাগছে স্যার চেম্বারে এসে? নতুন নতুন, তাই না?

রজত রায়ের স্বর প্রায় শোনাই যায় না, বলেন— আই অ্যাম ওভারহুইল্মড।

চেয়ারে বসে স্লিপ দেখে পরপর মক্কেল ডাকতে থাকেন মিঃ রায়। পুরনো মক্কেলের পাঠানো নতুন মক্কেল, ওঁর সুখ্যাতি লোকমুখে শুনে আসা সম্পূর্ণ অপরিচিত মক্কেল। মক্কেল আসতেই থাকে। রাত প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ হালকা হন কিছুটা।

আর না স্যার, বৌদি আমাকে পার্সোনালি অনুরোধ করেছেন, সাড়ে নটার মধ্যে আপনি যেন চেম্বার বন্ধ করেন সেটা দেখতে।

সুন্দর গলায় অনুনয়।

খুব কষ্টে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল মক্কেলরা ওদের মামলাগুলো। কতটা ঝুঁকি নিয়েছে ওরা আমার জন্য।

রজত রায় যেন স্বগতোক্তি করেন।

স্যার, কাল কোর্টে যাচ্ছেন তো? সুপর্ণা বলে।

হ্যাঁরে ভাই, যাব। যাব না? এতগুলো লোকের দায়িত্ব। দ্যাখো তো ব্রাদার কতগুলো ম্যাটার হতে পারে কাল? জুনিয়রদের দিকে না তাকিয়েই বলেন রজত রায়।

গোটা সাতেক হবেই স্যার। সুনন্দ জবাব দেয়।

পৌনে দশটা নাগাদ জুনিয়রদের চলে যেতে বলেন রজত রায়।

যাও তোমরা এবার, আমিও উঠব। দু একটা কাগজ গুছিয়ে শুধু বাড়িতে নিয়ে যাব।

যাওয়ার সময় তিনজনই ফিরে চায় সিনিয়রের দিকে। ওদের চোখে কাতর অনুরোধ।

এবার হেসে ফেলেন মিঃ রায়।

যাও তোমরা, কোনও ভয় নেই। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উঠছি।

পাঁচ নয় মিনিট পনেরো কাগজপত্রে চোখ ডুবিয়ে বসে রইলেন মিঃ রায়। দশটার ঘন্টা পড়তেই চমকে চোখ তুললেন। বেয়ারা অতুল দাঁড়িয়ে দরজার কাছে।

কি রে, কিছু বলবি?

স্যার— অতুল এগিয়ে আসে। বাড়ি যাবেন? আপনার শরীর এখনও সেরে ওঠেনি। অতুলরে উদ্বেগ হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

যাব এবার উঠব।

রজত রায় উঠতে যাবেন, ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, রজত রায় হিয়ার।

(৯২)

রায়, আমি মজুমদার।

বলো ভাই— রজত রায়ের আবছা স্বর।

তুমি আজ থেকে চেম্বারে বসছ এইমাত্র জানলাম সিন্‌হার কাছে — ওপাশ থেকে মজুমদার বলেন।

হ্যাঁ—

একটা মামলা ছিল ভাই। তোমাকে দিয়ে করাব বলে রেখে দিয়েছিলাম। শোনো মামলাটা ইন আ নাটশেল বলছি— মজুমদার একটানা বলতে শুরু করেন।

মজুমদার, শোনো মজুমদার, মামলাটা তো ভাই আমি নিতে পারছি না।

রজত রায়ের শান্ত স্বর মজুমদারের ব্যস্ত স্বর থামিয়ে দেয়। পরমুহূর্তে মজুমদারের বিস্ময় ওপ্রান্ত থেকে এপ্রান্তে ছুটে আসে।

সেকি? কেন?

কিছু না, আই অ্যাম নট ইন মুড।

রাত আরও বাড়ল। পৌনে এগারোটা বাজল ঘড়িতে। নিজের চেয়ারের পেছনে মাথা রেখে বসে আছেন রজত রায়। মস্তিষ্কটা আজ ভারহীন। শুধু হৃদয় জুড়ে অনুভব করছেন একঢাল ভালোবাসার উত্তাপ, নির্ভরতার স্পন্দন। চাহিদার জড়পিণ্ডটা যেন হঠাৎ সরে গেছে ঘাড় থেকে। পরিতৃপ্ত দেহমন তাই হাল্কা হয়ে ভেসে চলেছে নির্ভার এক শান্তির জগতে। অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতির প্রাবল্যে বুজে এসেছে দুটি চোখ। অথচ চোখদুটি খুলে উনি যদি একবার এই মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়াতেন—

ইউনিফর্ম

আরে হেই শুটকিমাগী, খ্যাংড়াকাঠি, আবাগীর বেটি, ঝ্যাঁটা খাবি? নুড়ো জ্বালাবো মুখে শালী, বেরো— দুর হ, মর্ মর্ তুই উঁচকপালী ছাই হ—

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সেদিন ভানুমাসী। চাপা সরু গলিটার ওপর শব্দগুলো ছিটকে এসে পড়ছে। সুবর্ণ দরজার সিঁড়ির কাছে, কোনরকমে দাঁড়িয়ে টাল সামলাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে ভানুমাসীর এক ভারি হাতের ধাক্কা ওকে চিৎপাত করে ফেলে দিতে পারে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুবর্ণ বুঝতে পারছে না কি করবে। ধাক্কা লাগলেই হয়তো ও পড়তে পারে আবর্জনার ঢিপিটার ওপর। দুর্গন্ধময় এই আবর্জনার স্তূপ প্রায় দিন দশেক পরিষ্কার হয়নি। দু'চারটে ঘেয়ো কুকুর অনবরত ঝগড়া করে এই স্তূপটাকে ঘিরে। গলির দুপাশের বাড়িগুলো থেকে দিনরাত কাগজে মোড়ানো নোংরা এসে পড়ছে এই জঞ্জালের স্তূপে, তাই বাড়ছে দুর্গন্ধ, বাড়ছে ঢিপি।

মাসী গো, এ আমার কথা নয় গো মাসী, বড়ো বড়ো সাহেবসুবোর কথা, গণ্যিমান্যি লোক তারা—ভানুমাসীর মুখ ক্লান্তিতে একটু থেমে যেতেই সুবর্ণ সুযোগটা নেয়।

মর মর তুই মাগী, আখাড়ের ভস্ম খা, কটা সাহেব—কটা গণ্যি লোক ঢোকে লো তোর ঘরে—ওরে ও শেফালী, শুনছিস, শুনে যা নীলি, পাপড়ি, সীতু—ছিবড়ে পোকার কথা শোন—বাঁ হাতে শাড়িটা হাঁটুর ওপর টেনে, ডান হাত শূন্যে তুলে ভানুমাসী ডাকতে থাকে মেয়েদের। সকাল দশটাতে ভানুমাসীর মুখে পান। মোটা শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে মাসী, শরীর গলে ঘাম ঝরছে। কিন্তু কোনোদিকেই দৃকপাত নেই তার। তীক্ষ্ণ গলার চীৎকারে ছুটে আসতে থাকে মেয়েরা নিচে—শেফালী, নীলি, পাপড়ি, সীতু, রুপালী, শুভলক্ষ্মী, রেবা। সকলের চোখ ঘুম জড়ানো, চোখে পিঁচুটি, শুকনো খসখসে চামড়া, নিষ্প্রভ, আস্তরণবিহীন। মুখের লালা গড়িয়ে চাপ বেঁধে আছে ঠোঁটের কোণ জুড়ে, শাড়ী বেসামাল, চুল রুগ্ন। দুহাত দিয়ে নিজেদের শরীর সামলেসুমলে এসে দাঁড়ায় ওরা।

কি হলো গো মাসী? সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য চোখ পড়ে ওদের সুবর্ণর দিকে, সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলে— সাত সকালেই এলি তুই জ্বালাতে?

সদ্য ঘুম থেকে ওঠার জন্যই বোধহয় ওদের গলাটা একটু নরম ছিল, তাই সুবর্ণ একগাল হেসে বলে— তোদের ভালর জন্যই বলছি রে মনা—কতগুলি আইন খালি মেনে চলবি ব্যাস্, তা না হলেই সেই মহামারী—

আবার, আবার শুরু করলি, হারামজাদী, শতেকখাকি ভানুমতী তেড়ে ওঠে।

তুই কি আমাদের পথে বসাবি সুবর্ণ, ওসব আইন মানলে আসবে কোনও খদ্দের— একটা পয়সা খসাবে কেউ—পাপড়ি এগিয়ে আসে। ফুর্তি মারবে বাবুরা, মদ খাবে, দুঃখ ভুলবে, চলে যাবে—তখন পাঠশালার পাঠ করবে কেউ—না না সুবর্ণ, তুই যা— ব্যবসাটা মাঠে মারিস না আমাদের।

ব্যবসা মরবে না— শুধু শরীলটা—সুবর্ণ মরীয়া।

দ্যাখ সুবর্ণ নিজের ব্যবসা তোর উঠতে বসেছে, ছিল ভাল তোর শরীর, বেশ ডবকা ডুবকা। কিন্তু তুই মাগী ওই সমাজসিবি সমাজসিবি করে উচ্ছন্নে গেলি, দেহটারে কাঠ করলি— কিন্তু আমাদের কাঠি দিচ্ছিস্ কেন বলতো? পাপড়ি বোধহয় ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্থা, কয়েকটা দিনই হাতে রয়েছে ওর, আর এখন যদি কিছু গুছিয়ে না নেয় তবেই দফারফা। গালাগাল দিয়ে নয়, ও বোঝাতে চায়।

তোর হাতের ওই থলেটা নিয়ে তুই ওই পাশের পাড়াটায় যা রে সুবর্ণ—আমাদের এদিকটা রেহাই দে। খদ্দেররা যদি শোনে কেলেঙ্কারী হবে, বদনাম হয়ে যাবে গলির—আর কেউ আসবে না। পাপড়ির গলায় সকাতর অনুরোধ।

আমার কথাটা তোমরা যদি জানতে, যদি জানতে মহামারী রোগটার জ্বালা—

জানি রে রোগে রোগে ভুগে ভুগেই মরব আমরা। তবু যে কদিন বাঁচি।

যাবি মাগি তুই— নাকি ন্যাংটো করে ছাড়বো তোকে—ভানুমাসী একদলা থুতু ছুঁড়ে দেয় সুবর্ণের মুখে। মুখে না লেগে লাগে ওর কাঁধে। এত গালাগালিতে যা হয় না, একটু থুতুতে সে কাজটা হয়, ও পিছিয়ে যায়, নেমে পড়ে গলিতে।

সবগুলো মেয়ের পেছন থেকে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে মুখ বাড়ায়, সামান্য গলা তুলে বলে রোগটির নাম জানো?

কান্নায় গলা বুজে যার সুবর্ণর, মেয়েটির প্রশ্নে মুখে ফোটে অপ্রস্তুতের হাসি, বলে— কেমন ধারা খটমটে নামটা যেন—

এবার হুংকার ছাড়ে মাসী—ব্যামোর নাম জানিস না, তাই নিয়ে আদিখ্যাতা। যক্ষ্মা না, কুষ্ঠু না—একি তবে যৈবন জ্বালার রোগ?

মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার সিঁড়ির পাশে। সকাল দশটাতেও যেখানটা জমাট কালো।

রোগের নামটা কিছুতেই ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না সুবর্ণ। লজ্জা লাগে বাবুদের মতো করে বলতে। সংঘের ফরসামতো বাবুটা ওকে পাখিপড়া করে শেখাবার চেষ্টা করেছে, রোগটার নাম বড্ড বেয়াড়া—ওই যে আরো কত নাম আছে গেরনি, শিফিলিস্, কি কি যেন আর—তবে সাদাকাপড়ে মিনাদিদি বলেছে, এর মধ্যে এই ব্যামোটাই মহামারী। পেলেগ একদম পেলেগ। আর ওদের পাড়াতেই নাকি হয় এসব। ভগবান সব রেখেছে শুধু ওদের জন্য। কষ্ট, দুঃখু, রোগজ্বালা।

মিনাদিদি বলে—দ্যাখো সুবর্ণ, তোমার ছেলে আছে, ওকে হোমে পাঠিয়েছ তুমি, মানুষ হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, ভালো কথা। এই ধর তুমি যদি সমাজসেবা করো, এই রোগের বিরুদ্ধে লড়তে পারো, তোমার বোনদের বোঝাতে পারো কি করে রক্ষা করবে নিজেদের, তবে কত ভালো হবে। ছেলে বড় হলে তোমার জন্য গর্ব করবে।

দিদিমনির এই শেষের কথাটাই বলে বড় মায়ার গো, বড় ভালো কথা।

বড় দুঃখ ভরা গলায় মিনাদিদি— বড় কড়া আইনের ব্যবসা তোমাদের।

সুবর্ণ মাথা নাড়ে— বয়ে, আইন মেনে মেনেই গেল ওরা। ভাঙলেই পুলিশের হ্যা!স রোগের জজুড়ি।

সে! অনেক আলোচনা হয়।

পিটা, পিটা, প্রিভেনশন অফ ইমোরাল ট্র্যাফিক অ্যাক্ট।

দাদাদিদিদের চোখ সব দিকে।

সুবর্ণরা বলে— ওই পিঠে আইনটা, ওই হাড় হাভাতে নিয়মকানুন।

আদালতে হুকুমে নাস্তানাবুদ হয় ওরা। সুবর্ণ রাস্তায় ঘাটে, পাড়ার বাইরে বসে ব্যবসা করবি কেন তোরা? ঠাঙানি তাই তো আমার বোন?

অপর্না, সন্ধ্যা, শিবুদি হাতে নাতে ধরা পড়ল সিনেমা হলের সামনে। পুলিশ নাকি হণ্যে হয়ে খুঁজছিল। জায়গায় বসে ব্যবসা করো। পাবলিকের জায়গায় বসলেই উচ্ছেদ। মিনাদিদি বলে— মোদের ফোরাম আছে। পিঠে আইনের অলি গলি বোঝায়। সংঘর বাবুরা—

ওরা বলে— সবদিকে আইনের সুরক্ষাটাকে বাঁচিয়ে চলো তোমরা।

সুবর্ণ একাই এই কাজে বেরিয়ে পড়েছে। সংঘের লোকজনকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে নিয়ে ও গলিতে গলিতে ঘুরেছে। বাড়িগুলোর মধ্যে যে কত ঘর আছে, কত রকমের কারচুপি। এই যে ঘর এখন তুলসীর, আধঘন্টা পরে এসে দেখো সে ঘর দখল করেছে চপলা। সংঘের লোকজন নিয়ে ও যখন ঢুকতো মাসীদের মানা না শুনে, মেয়েগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়তো ভেতরের বারান্দায়। ঢলাঢলি, হাসাহাসি। সমরেশবাবুর সামনেই তো একদিন টিটকিরি মারল ফতেমা— নাগর নিয়ে ঘুরছিস কেন রে ছুঁড়ি? ঘর পাচ্ছিস্ না? আয়, ছেড়ে দিই আমার ঘরটা।

কতো নিবিরে ছেমড়ি—রুবি ফোড়ন কাটে, তারপর হি হি হু হু। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল তখন সুবর্ণর। ছি ছি—বাবু কি ভাবলো। বাবু অবশ্য নির্বিকার। ও আড়চোখে চেয়েছিল বাবুর মুখের দিকে।

মাসী তো দোর আগলিয়েই থাকে—হবে না বাছা, এসব ধম্মকথা চলবে না। আসতে চাও আসো, দরজা খোলাই আছে বাছা তোমাদের জন্য। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।

এই অভিজ্ঞতার পর বাবুরা আর বিশেষ যেতে রাজী হয় না বেশি ভেতরে যেতে। সংঘের অফিসে একদিন এই নিয়েই আলোচনা চলছিল। সুবর্ণকেও ওরা একটা টুল দেয় বসতে। প্রথম প্রথম ও খুব আপত্তি করত, কিন্তু মিনাদিদি খুব দয়ালু, জোর করে বসিয়েছে ওকে।

কেন বাপু, তুমি কি ফ্যালনা? তুমিও এই সমাজেরই একজন।

এসব কথা শুনলে বড্ড কষ্ট হয় সুবর্ণর, বড্ড কান্না পায়। কিন্তু ও বেশ বুঝতে পারে এসব কথাই ওকে সাহস যোগায়, শক্তি দেয়।

(৯৬)

মিনাদিদি বলে—দ্যাখো সুবর্ণ, তোমরা যদি এগিয়ে আসো, একটু যদি ভার নাও, তবে কাজ হবে। অনেক কাজ—এটা হল একটা সমাজ চেতনা। ভালো কাজ।

সুবর্ণ উৎসাহ পায়। মাসীদের গালিগালাজ, মেয়েদের টিটকিরি ও সহ্য করে নেয়। এই রোগ যদি ছড়িয়ে পড়ে তবে সর্বনাশ হবে দেশের, সর্বনাশ হবে সব। শুধু দু'চারটে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা—প্রতিদিনই এই কথাগুলিই সংঘে আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুরাও আসে। সুবর্ণ বিগলিত হয় যখন কোন কোন ডাক্তারবাবু ওর পিঠে হাত রেখে বলে—তুমি বুঝেছ যখন তখন ওদেরও বোঝাতে পারবে।

ব্যাটাছেলেদের ভেতরে যাওয়ার সমস্যা, মেয়েছেলেদের তো আরও, কিন্তু আপনি মিনাদি, আপনার কথা আলাদা। কোন মায়ের ছা সাহস করবে আপনার শাড়িতে একটা টোকাও মারতে?

সুবর্ণ উৎসাহিত হয় যখন মিনাদি যেতে চায় গলির মধ্যে, গর্বে বুক ফুলে ওঠে মিনাদিকে পাশে নিয়ে হাঁটতে। সাদা-শাড়ি, লম্বা হাতা সাদা ব্লাউজ, বুকে নীল ব্যাজ, ওপরে সোনালী অক্ষরে কিছু লেখা। সুবর্ণর অবশ্য মনে মনে একটু ভয় ছিল কিন্তু মিনাদির সঙ্গে বেতরিব্যপণা কেউ করেনি। মোটামুটি চুপচাপই ছিল। মাসি যখন একবার বলতে গেছিল—কেন বাছা—মিনাদি ধমকে উঠেছিল—আপনিও শুনুন কি বলছি। এ রোগ বড় ভয়ানক। পশ্চিম দেশে ছেয়ে গেছে। যে ব্যবসা হয় এখানে, তাতেই জন্ম হয় এ রোগের। বাঁচতে হলে কয়েকটা সুরক্ষার প্রয়োজন। আমি কিছু ওষুধপত্র দিচ্ছি। ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভয়ের কারণ কম। মিনাদিদির ব্যাগভর্তি ছিল ওষুধপত্র। মেয়েদের সংঘে গিয়ে কার্ড করে রক্ত পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন মিনাদিদি। গলি থেকে বেরোবার মুখে সুবর্ণকে বলেছিলেন মিনাদি—দু-চারজন আরও জোগাড় কর সুবর্ণ। তোমরা ভেতর থেকে ওদের বোঝাও। কাজ করো।

মাস দুয়েক ঘাড়ে ধাক্কা খেয়ে, অপমানিত হয়ে একা একাই দোরে দোরে ঘুরেছে সুবর্ণ। নিজের ব্যবসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সংঘ থেকে কিছু টাকা পায়। কষ্টেসিষ্টে দিন চালায় সুবর্ণ। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে ও ধূলিধূসরিত কি এক সিদ্ধিলাভের আশায় এ যেন ওর যোগিণীর তপস্যা। ধুলিধুসরিত পা, রুক্ষ চুল, হাড়সর্বস্ব চেহারা সুবর্ণর। ওর অপমানের গ্লানি নেই। খিদের জ্বালা নেই। চোখগুলো ভাটার মতো জ্বলছে খালি। আরো কাজ চাই, আরো ব্যাপ্তি চাই কর্মক্ষেত্রের। এ গলি, ও গলি, ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়ি, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে। কোনো কোনো মেয়ে আবার স্থায়ী না। ঘন্টা দুয়েক ঘর ভাড়া করে থাকে, চলে যায়। এই মেয়েগুলোকে নিয়ে সমস্যা সুবর্ণর। এখানে ওখানে শহরে ছিটকে যাচ্ছে ওরা। কি জানি কোথায় নিয়ে চলেছে রোগ জীবাণু।

দিদি গো, বোনটিরে আমার, শোনো, শোনো—এই পোড়া শরীলটার জন্যই তো সব গো। এই পোড়া শরীলই ধন, শরীলই দায়।

যেতে আসতে এই মেয়েরা মাঝে মাঝে আস্কারা দেয় সুবর্ণকে। ব্যাস; একটু আস্কারা পেলেই সুবর্ণ ওদের হাত জড়িয়ে ধরে বলে— একটু খালি কড়া হতে হবে—ওকে নিয়ে মস্করা করে ওরা। ওরা সেই উড়ে আসা মেয়েগুলো। মালতী, ছবি, পূর্ণিমা।

আচ্ছা সুবর্ণদি, কোন নাগর তোমাকে নিয়ে এই ফষ্টি-নষ্টি করছে গো?

সুবর্ণ দুহাত নেড়ে প্রতিবাদ করে।

কাদের নামে বলছিস রে তোরা? সেবা করছেন তারা। দুহাত কপালে তোলে সুবর্ণ—মানুষ নয় তারা, সাক্ষাৎ সন্নেসী।

সন্নেসী?

উদাস হয়ে ওঠে সুবর্ণর দুটি চোখ। স্বর হয় ভারি, গলা নিচে নামে—গেরস্থ জীবনের ভোগ লোভ ঘেন্না দুরে ছুঁড়ে ফেলে। শুধু মানুষের সেবা গো—গভীর হয়ে ওঠে সুবর্ণের দৃষ্টি। ওর দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে কোথায়। ও বিড় বিড় করে বলে— কাপড়ে গেরুয়া রঙ ধরে কি সহজে। সেবা করি করি পাপ ধুতি হবে গো, পাপ ধুতি হবে। কবে যাবে গো দিদি? পাপ কবে—

গড় হই সুবর্ণদি। পাপ ধুতে ধুতে তুমি যখন সাফ হবে তখন এসো।

সুবর্ণ মরীয়া হয়ে ওঠে, বলে— ব্যামো যাতে বাড়ন্ত না হয়—

সুবর্ণদিগো মাথাটা তোমার ঢিলে হল কেন গো—ডাক ছেড়ে কাঁদার অভিনয় করে মালতী। অন্য মেয়েরা গড়িয়ে পড়ে হাসতে হাসতে।

যন্ত্রণায় কালো হয়ে যায় সুবর্ণের মুখ। দাওয়ার ওপর ও লেপটে বসে পড়ে। হাঁফাতে থাকে। সব সময় অবশ্য সকলের ঠাট্টা ইয়ার্কীর মেজাজ থাকে না। কামিনী তো দু হাত কোমরে দিয়ে রুখে দাঁড়ায়—

এ রোগে কি হয় বল?

ব্যামোতে শরীরটা ঝরে যায় গো।

মানে?

ক্ষয় হবে, হাড়মাস শুকাবে। রোগ ধরলে মোক্ষম। ওষুধ কর, পথ্যি কর—সারবে না।

হারামজাদি—শাপশাপান্ত করছিস?

না গো না, এই রোগের মিত্যু নির্ঘ্যাত। গতর তোমার তিলে তিলে—

মাগী, মুখে তোর পোকা পড়বে। তোর গতরে ঘুণ ধরল কেন রে?

তারস্বরে চেঁচাতে থাকে কামিনী। খাঁ খাঁ করে ওর কণ্ঠস্বর। ছুটে গিয়ে সুবর্ণর হাতটা খামচে ধরে ও। তোর গতরে মাস কই? মড়া—আমার গতরে নজর দিচ্ছিস? আমার নাগর ভাগাতে চাস? শালী—টুঁটি টিপে তোকে আজ শেষ করবই। আলুথালু বেশে চীৎকার করে কামিনী।

সুবর্ণ হাল ছাড়ে না, শেষ চেষ্টা করে— একটু সাবধান হলেই রোগের হাত থেকে রেহাই—

প্রথমে দুহাতে বুক চাপড়ায় কামিনী তারপর আস্তে আস্তে ওর চীৎকার ঢিমে হয়ে আসে। হতাশ কণ্ঠে বলে—আমি কি মাগ? ঘোমটার তলে কি আমি খেমটা নাচব? যা যা সুবর্ণ, দূর হ।

সুবর্ণ বেরিয়ে পড়ে গলিতে। ওর ভাঙা গালের ওপর জল গড়ায়। দু হাতে চোখের জল মোছে ও। নিজের মনে বলতে বলতে এগোয়—সেবার কাজ বড় আঁট, বড় বুক জ্বালানো। বড় রাস্তায় বেরিয়ে একটা বাড়ির বারান্দায় বসে পড়ে ও। এক ঠোঙা মুড়ি কিনে রেখেছিল ঝোলাটায়। আস্তে আস্তে ও মুড়ি চেবায়। দু চোখ বন্ধ হয়ে আসে ক্লান্তিতে। আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবেই আমাকে। ছেলেটাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবো। বাছা রে—মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ওর। ডাগর ডাগর চোখে চাইবে আমার দিকে। ওর বুক ফুলে উঠবে গর্বে, আমি গটগট করে যাবো।

ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় সুবর্ণ। বর্তমানের অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো দৃশ্য মাঝে মাঝেই ফালা ফালা করে ওর স্বপ্ন। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে আবার ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয় ও—আমার দিকে তাকিয়ে তখন কেউ কিছু বলতে পারবে না। গালাগাল? হাসি পায় সুবর্ণর। সাহস পাবে ওরা? ও তখন সমাজসিবি দিদিমনিদের সঙ্গে এক হয়ে ঘুরবে।

তোদের দলে থাকবো না রে আমি, থাকবো না। কলা দেখিয়ে যাবো তখন। উফ—কত লাঞ্ছনা দিচ্ছ গো তোমরা, কত দুঃখু—মানদামাসি সেদিন খাটের ওপর শুয়ে সুবর্ণকে বললো—পা-টা টেপ্ তো সুবর্ণ।

পা-টা টিপে দিচ্ছিল ও চুপচাপ।

মাসি পাখার বাঁট দিয়ে পিঠের ঘামাচি মারতে মারতে বললো—এ বাবুরা পয়সা দেয় তোকে?

সুবর্ণ মাথা নিচু রেখেই বলে—দেয়।

ধন্যি বর্ণ। এ আবার কি লীলেরে তোর? ব্যামো ব্যামো করে হেঁদালি। একটু চুপ করে থেকে মাসি বলে—সে ব্যামোতে গতর খসে, কি বলিস?

খসে মাসি খসে, এই মা কালীর দিব্যি।

ধম্মপথে গতর যদি খসেই তো ক্ষতি কি। তুই তো দুটো অছেদ্দার টাকাতে গতর মারছিস রে বর্ণ?

সুবর্ণ চোখ বন্ধ করে বলে—ভুল মাসি ভুল। টাকা নয় গো মাসি, টাকা নয়। ভদ্দরলোকদের আরও অনেক মায়া আগে গো মাসি, আরও অনেক বস্তু।

মাস দুয়েক যাওয়ার পর প্রায় জনাচারেক মেয়ে ওর দলে যোগ দিয়েছে। প্রথমে পুতুল এসেছিল—সুবর্ণদি, আমিও কাজ করবো তোমার সঙ্গে।

গলির এই পাঁচটা মেয়ে তারপর থেকে জোর কদমে কাজ চালাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে একটু চেতনা জেগেছে। ওদের কথায় কিনা কে জানে? এও হতে পারে চোখের সামনে নিভা আর

করবীর অসহনীয় মৃত্যু যন্ত্রণাটা ওদের চেতনা জাগিয়েছে। তিল তিল করে নিভা আর করবী মরল। সে কি কষ্ট। রক্ত পরীক্ষায় এই প্রাণঘাতী অসুখটার নাম বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে মেয়ে দুটোকে কয়েদীর মতো ধরে নিয়ে গেল গাড়িতে পুরে। ত্রাস ভর করল গোটা পাড়াটার ওপর।

ওরে বাবা, এতো দেখি খুনী রোগ? নিজের থেকেই বেশ কিছু মেয়ে রক্ত পরীক্ষা করতে রাজি হলো। খদ্দের ভাগিয়ে দিলো যে আইন মানতে চাইল না।

সুবর্ণর এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। সেদিন সন্ধ্যায় সারাদিন কাজকর্ম করে সংঘের অফিস ঘরে ঢুকলো ও। একটু চা এখন ওর বড় দরকার। চা-টা খাওয়ার পর পরই মিনাদিদিমনি ডাকলো ওকে। বসো—মিনাদি সামনের চেয়ারটা নির্দেশ করল।

সুবর্ণ চুপ করে থাকে। কাগজের ওপর কি যেন লিখছে মিনাদি ঘস্ ঘস্ করে। সাদা ইউনিফর্মে মিনাদিদিকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা আসুক, সমাজসিবিবাবুরা আসুক, সুবর্ণ দেখেছে সবাই মিনাদিদিকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে। বেশ কয়েকজন নার্সও আছে এই সংঘে। সবাই সাদা—ধপধপে সাদা ইউনিফর্ম পরে। ফিটফাট থাকে। হাতে আবার কাপড়ের মোজা পরে যখন মেয়েদের পরীক্ষা করে। আয়া দুটোর পোশাকও সাদা।

দ্যাখো সুবর্ণ—তিন নম্বর গলিটার ভার এবার তুমি নাও। কেউ পারছে না কিছু করতে। ঘরে তো ঢোকাই যাচ্ছে না। তুমি তো এ দিকটা প্রায় সেরেই ফেলেছ, ওদিকটা দেখো এবার। মিনাদি কলম বন্ধ করে।

হ্যাঁ দিদি, দেখবো। আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সুবর্ণর গলা দৃঢ়।

দেখো, কি ফন্দী তুমি খুঁজে পাও। মেয়েগুলো বড় বেয়াড়া। লোকজন দেখলে ওপর থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে। ওরা বলছে সব খদ্দের নাকি এখন ওদের দিকে ঝুঁকছে। বিশ্রী ব্যাপার। তোমার দলের লতাকে টেনে নিয়ে না কি চড়চাপড়ও লাগিয়েছে সাত নম্বরের মাসি। মিনাদির ভ্রু কুঁচকে যায়।

আপনি ভাববেন না দিদি, ভাববেন না। সুবর্ণ উঠতে যায়। মিনাদি বাধা দেয়। বলে—দাঁড়াও সুবর্ণ তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে।

সুবর্ণর বুকটা দুর দুর করে ওঠে। আশায় চক্ চক্ করে ওর চোখ। ড্রয়ার থেকে একটা খাম বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দেয় মিনাদি। সুবর্ণ হাত বাড়ায় না। বলে কি আছে এতে।

তোমার জন্য বরাদ্দ টাকা পাঠিয়েছে সংঘের প্রেসিডেন্ট।

টাকা? টাকা তো—

এটা তোমার মাসোহারা। এ মাস থেকে ঠিক করা হয়েছে। বিদেশ থেকে সাহায্য আসছে প্রচুর। প্রেসিডেন্ট বললেন—কর্মীদের ইনসেনটিভ দাও।

দু চোখ ভরে ওঠে জলে। বুকের কাছে ধরে রাখে ও খামটা।

সিদ্ধির পথে পৌঁছুতে আর দেরি নেই।

টাকাটা প্রত্যেক মাসেই পাবে সুবর্ণ। যে টাকা পেতে তাতে তো আর চলতো না। তোমায় খেতে হবে, ঘর ভাড়া দিতে হবে। ফুল টাইম কর্মী তুমি। খাওয়া পড়া ছাড়া—মিনাদি হাসে —এ টাকাতে চাই কি তোমার কোন ইচ্ছেটিচ্ছেও মেটাতে পারো।

দিদি গো, পেশিডেনবাবুকে আমার পেন্নাম জানিয়ে টাকাটা জমা রাখো দিদি। জমতে জমতে—

মিনাদি বিস্ফারিত চোখে চায়। টাকা তোমার চাই না নাকি? প্রয়োজন নেই কিছু?

লোভে ভরা গো এই শরীলটা। তুচ্ছু তুচ্ছু পাপে ঠাসা। সেগুলিরেই তো মারতি চাই। তবে না দলছুট হব।

মিনাদি কথা বলে না, অবাক চোখে চেয়ে থাকে সুবর্ণর দিকে। সুবর্ণ তখনও বলে চলেছে—এখনও পাপীতাপী এই পোড়াকাঠ। পেটে লাথ খেলেই পাপের লোভ জাগে। হাড়মাসে পাপ বসতে চায়। টাকা নিলে জানবো কেমনে সে লোভটা মরছে কিনা।

বিস্মিত মিনাদি নির্বাক।

লোভটারে যখন মারতি পারবো, ছেলেরে কোলে নিয়ে আসবো গো দিদি। হাত বাড়িয়ে চাইব—কি চাইব জানো?

মিনাদি শোনার চেষ্টা করে কি বলছে সুবর্ণ। কান্নাবিকৃতস্বর শুধু গোঙানির আওয়াজ তোলে। বোঝা যায় কি একটি শব্দও?

সুবর্ণ বলছে—একটা ধপধপে সাদা পোশাক। নীল ব্যাজ। হাতের সাদা মোজা মাথায় একটা সাদা ঠোঙা টুপি—

গিঁট

লোডশেডিং চলছে। ঘরে ঢুকে অভ্যাসবশে সুইচবোর্ডে হাতটা চলে গিয়েছিল। পাখার সুইচটা নামিয়ে ছিলেন সুস্মিতাদেবী। পাখা অনড়। ক্লান্ত বিধ্বস্ত, ঘামে ভেজা অবসন্ন শরীরটাকে নিয়ে সামনে রাখা কাঠের চেয়ারটার ওপর বসে পড়লেন তিনি। আগুনের হল্কার মতো ঘরম ঘরটা। রাস্তার দিকের বড় জানলাটা খোলাই রয়েছে। খোলা রেখেই চলে গিয়েছিলেন তিনি। পর্দাটা আগাগোড়া টানা। কিন্তু বাইরের থেকে তাপপ্রবাহ ছুটে ঢুকছে ঘরে। মাঝে মাঝে পর্দাটা সরে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাইরের কণ্ড খণ্ড কিছু দৃশ্য ঢুকে পড়ছে ফাঁক পেলেই। উনি তাকিয়ে আছেন সেই জানলার দিকেই। নিষ্পলক দুটি চোখ কিছু দেখছেন কিনা বোঝা মুশকিল। শক্ত কাঠের চেয়ারের ওপর নিশ্চল সুস্মিতাদেবীর শরীরটাও টান টান, কঠিন।

ছোট একটা চড়াই পাখী ঢুকে পড়েছে ঘরে। ফাঁক ফোকর অনেক আছে। কিন্তু পাখীটা বোধহয় ভীষণই বাচ্চা, সবে উড়তে শিখেছে। যে পথ দিয়ে ঢুকছে, সে পথটা হারিয়ে ফেলেছে ও। ঘরের মধ্যেই কিচিরমিচির শব্দ তুলে চরকি কাটছে। বাইরের জানলাটা খোলা, কিন্তু এমনভাবে পর্দা টানা ওই পথ দিয়ে যে সে মুক্তি পেতে পারে, সেটা বোধগম্য হয় না ওর। ক্লান্ত হয়ে বসছে মাঝে মাঝে দেওয়ালের ওপরের তাকে। আবার যেন ভয়ের তাড়া খেয়ে লাফিয়ে উঠে ডানা ঝট্‌পট করছে। হাত বাড়িয়ে পর্দাটা একটু টেনে দিলেই পাখীটা বেরিয়ে যেতে পারে। অসহায় একটা ছোট পাখীকে এক্ষুনি মুক্তি দিতে পারেন সুস্মিতাদেবী। কিন্তু না, উনি একটুও নড়ছেন না। নিষ্করুণ দুটি চোখে গা শিরশির করা দৃষ্টি শুধু পর্দা দিয়ে আড়াল করা খোলা জানলাটার দিকে। রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ। শুকনো ঠোঁটদুটি নিথর। সারা শরীরটাকে নিংড়ে কষ্টটাকে উগরে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু কষ্টটা আরো পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে ওকে। বুকের মধ্যে চাপ চাপ যন্ত্রণা জমাট বেঁধে রেখেছে, বাঁধন ঢিলে দিয়ে অবসাদ মাখা, বেদনায় ক্লিষ্ট শরীরটাকে নরম হতে দেয় না।

কেন ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছি না আমি? ঘরের ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে কান্নায় ডুবে যাওয়ারি তো কথা এখন আমার। সুস্মিতাদেবী অবাক হলেন এই অবস্থাতেও তার মস্তিষ্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করার ক্ষমতায়। হ্যাঁ, ছিটকিনিটা তুলতেই কাঁদতে হতো আমাকে। লোক সমক্ষে স্বাভাবিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করাতো হলোই না এ জীবন। নিভৃতে নিজের সামনেও আমি নিজের ভেতরটাকে উজাড় করতে পারছি না। কাঠফাটা হাহাকারে মনটা ক্ষত বিক্ষত হয়। একফোঁটা জল গড়ায় না গাল বেয়ে। এক অস্বস্তিবোধের মোড়ক ঢেকে ফেলেছে ওর দুঃখের তীব্রতাকে গভীর এক উদ্‌বেগ এই অস্বস্তিবোধটাকে টেনে আনছে। ছেয়ে ফেলছে দুঃখের কালো মেঘকে একখণ্ড খচখচানি ধূসর অনুভূতি। অতীতের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুলে মাথার মধ্যে বসে থাকা সমালোচকটি আগ্রাসে খুঁজছে কোথাও কোনও উত্তর যদি পাওয়া যায়।

নিখিলেশের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অবৈধ। সুস্মিতাদেবীর মায়ের মামাতো বোনের ছেলে নিখিলেশ। দশ বছর বয়সে মার মৃত্যু হওয়ার জন্য মামাবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় ছিলই না

বলা যায়। সেই কারণেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নিখিলেশের সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ আর ঘটেনি। ঘটল যখন তখন সুস্মিতা অষ্টাদশী, নিখিলেশ পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক। সুস্মিতার নিজের মামাবাড়ী থেকে ঠিকানা নিয়ে সোজা সুস্মিতাদের এসে হাজির। মামাবাড়ী সম্পর্কিত সকলেই প্রায় প্রবাসী। মামাবাড়ী কানপুরে। নিখিলেশদের বাড়ীও কানপুরের কাছেই, উন্নাওতে। সন্ধেবেলা দরজায় খট খট শব্দ। নির্জন বাড়ীতে সুস্মিতা একা। কাজের লোকটা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। বাবা অফিস থেকে তখনও ফেরেন নি। দাদা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বেরিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে খুললো ও দরজা, খুলে নিখিলেশকে দেখেই ও বিভ্রান্ত। অসম্ভব সুন্দর স্বাস্থ্য, তাজা চকচকে, সপ্রতিভ যুবক। মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে এলো। সুস্মিতার মুখের লালিমা স্পর্শ করেছিল নির্ঘাৎ নিখিলেশকেও। তাই যা হবার নয় তাই ঘটে গেল। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ল ওরা। তারপরে পরিচয় জানাজানি। লজ্জায় মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করলো সুস্মিতার। স্তি আরেক জায়গায় যে মরেই গেছে ও। তাই মরা আর হলো না। পরস্পরকে নিজেদের মনের কথাটা জানাবার অবসর পেলো না ওরা। কারণ মন জানাজানির জন্য যে সময় যায়, সেই সময়ে তো জেনেই গেছে ওরা ওদের পবিত্র সম্পর্কটির কথা। আর কি বলা চলে?

একদিন সন্ধের দিকে সুস্মিতা একগ্লাস জল নিতে রান্নাঘরে ঢুকছে। বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলছিল। রান্নাঘরটায় তখনও একটি লাল লাল আবছা আলো ছড়িয়ে ছিল বলে, সুস্মিতা আলো না জ্বেলেই জল গড়াল। হঠাৎ লম্বা একটা ছায়া। নিখিলেশ। দরজায় দাঁড়িয়ে। সুস্মিতা অস্পষ্ট। কিন্তু নিখিলেশের মুখ স্পষ্ট। চোখের চাহনি পরিস্কার পড়া গেল। সুস্মিতার বুকে তখন দামামার শব্দ। সুস্মিতাকে একা রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখেই নিখিলেশ বোধহয় ওকে নিরিবিলিতে কিছু বলতে চেয়েছিল। হৃদয় বিনিময়ের জন্য শুধু চোখের ভাষাই যথেষ্ট। কেজো ভাষা এখানে নিরর্থক। অনুচ্চারিত ভাষায় পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়ে গেল। প্রেমে পড়ার প্রথম মুহূর্তে তাই হৃদ্‌পিণ্ডটা যে দ্রুততালে চলতে শুরু করেছিল, সেই অবস্থাতেই চললো আর পয়ত্রিশটা বছর। পাওয়ার আর্তিটা তো রয়েই গেলো চিরদিন। সুস্মিতাদেবী আজও আশ্চর্য হয় ভাবলে যে তাদের এই অব্যক্ত প্রেম বেআব্রু হল কি করে? কি করে প্রতিটি মানুষ টের পেলো? যা তাদের একান্ত নিজস্ব, তা জানলো সবাই কিভাবে? ঢাক ঢোল বাজিয়ে মহাসমারোহে তারাই ঘোষণা করলো এই অবৈধ প্রেমকে। হাতুড়ি পিটিয়ে তারাই ভাঙলো বাঁধ। মাস খানেক থাকার কথা ছিল নিখিলেশের। সুস্মিতা লক্ষ্য করলো বাবা আর একটা দিনের জন্যও ওকে থাকার অনুরোধ করলেন না। যাওয়ার আগের দিন রাত্রিবেলা খাওয়ার টেবিলে বসে নিখিলেশ বলেছিল, দু একটা দিন আর থাকলে ভালো দু একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। সুস্মিতার বাবা শুধু শক্ত মুখে তাকিয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না। সকালে উঠেই চলে গেলো নিখিলেশ। চলে গেল কিন্তু এই অল্পকটি দিনেই সুস্মিতার জীবনটা চুরমার করে দিয়ে গেল। আর কোনদিন সে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখলো না। ভাবতেও পারলো না কারো সঙ্গে একটা বৈধ সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা। পিতৃস্নেহ হারালো

সে, হারালো দাদার সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে। নিখিলেশ চলে যাওয়ার সময় সুস্মিতার নামটা নিতেও সাহস কলর না। দেখা না করেই চলে গেল ও। ঘরে বসেই টের পেলো নিখিলেশ চলে যাচ্ছে। বাইরে গেটের শব্দ হতেই ছলকে উঠলো ওর চোখ দুটো।

অথচ ভালোবাসায় কষ্টে এতগুলো বছর কাটাবার পর যখন নিখিলেশ আজ ভোরে চিরদিনের জন্য চলে গেলো সুস্মিতাদেবীর চোখদুটো তখন শুকনো খটখটে।

হাওয়ায় পর্দাটা দুলে উঠলেই আলো ছিটকে আসছে ঘরে। চড়াই পাখীটা বারবার উড়ে ওই দিকে যাচ্ছে কিন্তু পর্দায় বাধা পেয়ে ফিরে বসছে তাকটার ওপর। পাখীটার হাফ ধরে গেছে মনে হয়। তবুও চার দেওয়ালের কয়েদখানার বাইরে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফটানি কমেনি। অন্যদিন হলে সুস্মিতাদেবী চড়াইটাকে আটকা পড়তে দেখলেই জানলা দরজা খুলে মুক্ত করতো ওকে, বড় মমতা, বড় মায়া ওর। কিন্তু আজ উনি আত্মমগ্ন। ছোট একটি গিঁট খুলতে হিমশিম। বেশ কয়েকদিন ধরেই নিখিলেশের শরীর খারাপ। বছর দুয়েক হলো রিটায়ার করেছিল ও। সুস্মিতাদেবীর বাড়ীর পাঁচ ছটা বাড়ী পরেই নিখিলেশ বাড়ী করেছে। বৌ, একছেলে আর একমেয়ে নিয়ে ওর সংসার। পয়ত্রিশ বছর আগে যে চাকরীটার উমেদার করতে নিখিলেশ কলকাতায় এসেছিল, সেই চাকরীটাই করে গেলো ও সারাজীবন। কলকাতায় প্রথমবার এসেই নিখিলেশের ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার সঙ্গে। চাকরী নিয়ে কলকাতায় এসে ও আবার এসেছিল সুস্মিতাদের বাড়ীতে।

সিঁড়ির ওপরে সুস্মিতা, নীচে ও দরজার কাছে। দৃষ্টি বিনিময় হতো কয়েক মুহূর্তের জন্য। বুক মোচড়ানো যন্ত্রণায়, ভালো লাগায় ভরে উঠতো মন। বাড়ীর কাজের লোকটা দরজা খুললেই সুযোগটা পেত ওরা অবশ্য বাবা আর দাদা বাড়ী না থাকলেই সম্ভব হত এটা। দরজা খোলার আর হুকুম ছিল না সুস্মিতা র। তাই বাবা না থাকলে হয় ওর দাদা তা না হলে বাড়ীর কাজের লোকটা দরজা খুলতো। দরজা খুলে কেউ কোনো কথা বলত না। সরে যেতো একধারে। নিখিলেশ মিনিট দু-তিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। ওর সক্রিয় চোখদুটো কদাচিৎই চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ পেত। অপমানিত হতো বার বার নিখিলেশ কিন্তু আসা বন্ধ করতে পারতো না। আত্মীয় মহল, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যে আলোচনা গুঞ্জনের আকারে ছিল ধীরে ধীরে সেটা ফেটে পড়লো তীব্র ধিক্কারে। লজ্জায় অপমানে বাবা শয্যা নিলেন। জীবনের বাকী কটা দিন আর তিনি মেয়ের সে! কথা বললেন না। বাবার মৃত্যু এক ভারী পাপবোধের বোঝা চাপিয়েছে ওর মনে। পাপবোধটা আরো তীব্র হয়েছে যখন এই পাপবোধের সে! তাল মিলিয়ে ওর প্রেমও হয়ে উঠেছে আরো দুর্বার, আরো উত্তাল। মনটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছে বার বার। বাবা চলে যাওয়ার পর আর ও বাড়ীতে থাকা গেলনা। সুস্মিতা বাড়ী ছাড়লো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সুস্মিতা বাড়ী ছাড়লো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পিসতুতো এক বোনের বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে মেয়েদের একটা ইস্কুলে সামান্য বেতনের চাকরী জোগাড় করলো। ভাড়া বাড়ীতে উঠে গেল এরপর। এই সময়টাতে নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে কয়েকবার। সুস্মিতাদেবী আজ বুঝতে পারেন তাদের ঘিরে পারিবারিক ও সামাজিক যে ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড় অহেতুক বা অন্যায় মনে হয়নি কখনও ওর। মনের ভেতরে নিজেকে অপরাধী

ভেবেছে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু মনটাকে বাগে আনতে পারেনি। তাদের এই প্রণয় যে অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অসামাজিক সেটা ও বুঝতো, তাই কখনও সমাজকে তুচ্ছ করার বলা পায়নি ও। নিখিলেশ অবশ্য অবুঝ হতো মাছে মাছে কিন্তু সুস্মিতা নিজের এই সর্বনাশা ভালবাসাকে মানতে পারেনি কখনও। তাই নিজেকে শাস্তি দিতে, প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট দিতে উঠে পড়ে লাগলো ও।

তুমি একটা বিয়ে কর। গলায় জোর করে নিস্পৃহতা টেনে এনেছিল সেদিন সুস্মিতা। কি বলছ তুমি? আমায় পরীক্ষা করছ? নিখিলেশ খেপে উঠেছিল। কিন্তু সেই নিখিলেশই একদিন রাজী হয়ে গেলো। রাজী হয়ে গেলো ওর বাড়ী থেকে দেখেশুনে দেওয়া একটি মেয়েকে বিয়ে করতে। সমাজকে আস্তে আস্তে ভয় করতে শুরু করেছিল ও। অথচ আশ্চর্য সুস্মিতা তখন আস্তে আস্তে তাদের প্রেমকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাইছিল। আস্তে আস্তে ভেতরে ভেতরে পরিবর্তিত হচ্ছিল তার মন। গ্লানিবোধটা ফিকে হয়ে আসছিল। নিজের মনের গভীর আবেগটি মনের টানাপোড়েনের যন্ত্রণায় পুড়তে পুড়তে পরিশুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। আর তখনই এলা আঘাত। ও বিয়ে করতে বললেই যে নিখিলেশ গলায় বরমাল্য ঝোলাবে, সেই আশঙ্কাও অচিন্তনীয় ছিল ওর। অভিমানে বুক বুজে গিয়েছিল। এই অভিমানই কাঠিন্যের আবরণ এনে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু ভেজা কাগজের মতো টুকরো টুকরো ঙয়ে এই খোলসও ঝরে পড়তে দেরি হল না যখন দেখল নিখিলেশও সুখী নয় বিবাহিত জীবনে। সবাই যেমন ঝট্ করে বুঝেছিল ওদের এই গোপন সম্পর্কটি, অনুভাও বুঝলো বিয়েটা ওর নেহাতই নিরর্থক। এতা তাড়াতাড়ি ও নিজেই বুঝলো, না ওকে বোঝানো হলো সেটা নিখিলেশের বোধগম্য হয়নি। গড়ে ওঠার আগেই ভাঙ্গলো সম্পর্কটা। যে সম্পর্কটা গড়া উচিত সেটা গড়লো না আর যেটা গড়া নিতান্তই অনুচিত, সেটা পাকাপোক্ত হল। বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়ে সুস্মিতাও উপলব্ধি করলো দুই সন্তানের বাবা নিখিলেশের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। ইতিমধ্যে সুস্মিতাদেবীর বয়সও চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। এখন ইস্কুলের কাজে বেশ ভালোই মাইনে। ছোট একটা বাড়ী করলেন উনি। এক কামরার। বাকী যে টাকাটা জমানো ছিল নিখিলেশকে দিয়ে দিলেন যাতে ওই টাকাটার সঙ্গে নিজের টাকা জুড়ে নিখিলেশও একটা নিজের আস্তানা গড়তে পারে। সুস্মিতাদেবীর বাড়ীর কাছাকাছি একটা খালি জমি ছিল। নিখিলেশের কাছাকাছি থাকার লোভও ছিল দুর্বার। অথচ উনি জানতেন লাঞ্ছনা এতে বাড়বে বৈকি, কমবেনা।

রোজ সকালে যখন নিখিলেশ বাজারে যাবে আটপৌরে নিখিলেশকে দেখবে। ক্লান্ত হয়ে ও যখন অফিস থেকে ফিরবে জানলার ফাঁক দিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে শুষে নেবেন ওর ক্লান্তি, বহুদিনের সেই সাধ পূর্ণ হবে ওর। হলোও তাই। লুকোচুরি করে নিখিলেশকে দেখার মধ্যে উন্মাদনা পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যবয়সিনা সুস্মিতাদেবী উপভোগ করতেন বেশ কয়েক বছর ধরে। রোববার রোববার আসতো নিখিলেশ। অন্য একটা থলিতে কিছু ভালো মাছ কিনে নিয়ে ওর রান্নাঘরে নামিয়ে রাখতো। চা খেতো এক কাপ। চলে যেত। শুধু বহুদিনের অভ্যাস মতো ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছুঁতো নরম আশ্লেষে নিজের আঙুল দিয়ে। ব্যাস্। স্পর্শটা শুধু ভালবাসার আর ভালোবাসার। মাদকতায় ঝিম্ ধরতো শরীরের কোণে কোণে, খাঁজে খাঁজে। সাতদিনের জন্য সুস্মিতাদেবীর পাথেয় জুটতো। নিখিলেশের স্ত্রী অনুভার কিছু হলে বা ওর

ছেলেমেয়েদের কোনো দরকার হলে, ননদের ছদ্মবেশে ঢুকতেন ওদের বাড়ীতে। তবে ওর ছদ্মবেশটা এতোই স্বচ্ছ যে নিখিলেশের ছেলেমেয়ে ও বৌর ঘৃণাময় চোখে ধরা পড়ত সেটা প্রতি মুহূর্তে। তাও যেতেন উনি। মান-সম্মান খুইয়ে যেতেন চক্ষুলজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে যেতেন। পূজোর সময় সুস্মিতাদেবীর কেনাকাটার ধূম। ইস্কুলের শিক্ষিকারা হাসতো।

এত কি কেনেন সুস্মিতাদি? নিজে তো শুধু সাদা সাদা দু চারটে শাড়ীর বেশী পরেন না? দু-চারজন বয়স্কা সমবয়সিনা জানতেন সব। তারা প্রশ্ন করতেন না। নবীনারাই কৌতূহলী বেশী। প্রশ্নের সং! জড়িয়ে থাকতো প্রছন্ন বিদ্রূপ, তীর্যক মনোভাব। সারা জীবনটাই প্রায় বৈরাগ্যের পোষাক পরলেন সুস্মিতাদেবী। শুধু ডানহাতে একটা লাল পলা পরতেন। কেন যে পরতেন, কেন যে খুলতেন না ওটা কখনই, সেটা বোধহয় নিজেরও জানা নেই।

যা টাকা পয়সা যখনই নিখিলেশের দরকার হয়েছে, সুস্মিতাদেবী ঠিক টের পেত, নিখিলেশকে পূর্ণ করাতেই ছিল ভোগের তৃপ্তি। তোমার জন্যই তো সব। মনে মনে উচ্চারণ করতেন কথাগুলো। নিখিলেশকে পুজোর সময় একটা নতুন জামা পরাবার আকাঙ্খায় ওদের বাড়ীর কাজের লোকটা শুদ্ধু সকলের জন্য কাপড় কিনতেন উনি। পাড়ার মধ্যে ওদের সম্পর্কটা নিয়ে প্রথম দিকে প্রচুর ঘুসঘুসানি চলেছে তবে ওদের বয়সটা সম্পূর্ণ ঢলে গেছে বলে ইদানিঁ লোকে খালি বিতৃষ্ণার দৃষ্টি ফেলত। আলোচনারও অযোগ্য ভাবতো। জীবনের প্রথম ধাপে খুব অণান্তি করলেও, অনুভা এখন মেনে নিয়েছিল কিছুটা। কিন্তু এবার যখন নিখিলেশ অসুস্থ হলো, তখন থেকে অনুভা যেন আবার মারমুখী হয়ে উঠলো। সুস্মিতাদেবীকে দেখলেই যেন জ্বলে উঠতো। রক্তে চিনি হয়েছিল বেশ কয়েকবছর ধরে নিখিলেশের। দৃষ্টিশক্তিও তাই বেশ খারাপ হয়ে এসেছিল। অনেক বড় বড় চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সুস্মিতাদেব কিন্তু বিশেষ উপকার হয়নি। চোখের ভেতরে রক্তক্ষরণ হতো। চোখে রে-ও দেওয়া হলো। কিছু লাভ হ'ল না। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত কলকাতার একজন ডাক্তার নিখিলেশকে ম্যাড্রাসের শঙ্কর নেত্রালয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন চিঠি লিখে সুস্মিতাদেবী ঠিক করলেন সব। কিন্তু ভেস্তে গেল। একদিন সকালে হঠাৎ দরজায় অসহিষ্ণু কড়ার শব্দ। ছুটে গিয়ে দরজা খুললো সুস্মিতাদেবী। নিখিলেশের ছেলে উৎপল দাঁড়িয়ে। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও, সুস্মিতাদেবী মুখে হাসি ফোটালেন। নিরেট পাথুরে মুখে উৎপল জবাব দিলো, বাবা ম্যাড্রাসে যাবে না। কর্ত্তব্যটা আমাদের। আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। নিখিলেশের জন্য মাথা না ঘামাবার উপদেশ দিয়ে নিখিলেশের ছেলে দরজা থেকেই বিদায় নিল। জীবনে অনেক চাবুক খেয়েছেন সুস্মিতাদেবী। এই মারটিও গিলে ফেললেন।

দিন পনেরো আগে বাজার করতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেছিল। রিক্সা করে বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়ছিল নিখিলেশ। খুব ঘাম আর অস্থির ভাব। ছেলে বাড়ী ছিল না। মেয়েটা অগত্যা সুস্মিতাদেবীকে খবর দিয়েছিল দৌড়ে। ছোটাছুটি করে সব ব্যবস্থা হল। এইরকম একটা বিপদের সময়ও সুস্মিতাদেবীর মনটা ভরে উঠেছিল লিখিলেশের মেয়ে পাড়া প্রতিবেশীর

কাছে না ছুটে ওর কাছে এসেছিল বলে। কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন মেয়েচির কাছে। ব্যাস্ ওইটুকুই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিল ওরা। আর কোন কিছুর জন্যই ওকে আর ডাকেনি ওরা। আর কোন কিছুর জন্যই ওকে আর ডাকেনি ওরা। সুস্মিতা রোজ গেছেন। অবস্থা যখন খারাপের দিকে এগিয়ে গেল তখন থেকে সারা রাত বসে থেকেছেন, শুধু ভোরবেলা কিছুক্ষণের জন্য বাড়ী এসে স্নান টান করেছেন। ঠায় বসে থেকেছেন পাশের একটা চেয়ারে। অনুভা বিরক্ত হয়েছে। জগদ্দল পাথরে সে! তুলনা করেছে। মাঝখানে বসে থাকার জন্য সহস্র অসুবিধার কথা বলেছে। কিন্তু সুস্মিতাদেবী ওঠেনি। ওর এই নির্লজ্জ ব্যবাহারে যে শুধুমাত্র অনুভা আর ওর ছেলেমেয়েরাই বিরক্তিতে চুরচুর হয়েছে তা নয়। পাড়া প্রতিবেশীও বিস্মিত কিছু কম নয়।

এতো বয়সে এতো নির্লজ্জতা—

সেবা এখন নিচ্ছে কার?

ঘরের বউয়ের মূল্য বুঝেছে শেষে।

আরে ঘরের বউয়ের সে! তো জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন—স্বামীস্ত্রীর বন্ধন—

গরম সীসার মতো গণগণে কথাগুলো কানের ভেতর দিয়ে টগ্‌বগ্ করতে করতে ঠুকছে কিন্তু ওঠেননি উনি।

অনুভা যতো কটুক্তি করেছে পাড়ার মহিলারা ধুয়া ধরেছে। কিন্তু অনুভা যখন আক্ষেপে, ক্ষোভে হাত পা ছুঁড়ে নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েমানুষটাকে ঘাড়ে ধরে, অপমান করে (অবশ্য ওর অপমান যদি এতোতেও না হয়ে থাকে) বার করে দিতে বলেছে তখন মহিলামহল চুপ করে গেছে। ওকে তাড়ানো মানেই তো এমন একটা সরস নাটক দেখা বন্ধ। ষাট বছরের বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়, পঞ্চাশ উতীর্ণা প্রেমিকা খাটের পালে তপস্বিনী জলজ্যান্ত বউয়ের নাকের ডগায়। তাই, চলুক।

সেবা করার অধিকার নেই সুস্মিতাদেবীর উনি চুপচাপ বসেই থাকেন। শুধু রাত্রিবেলা জখন সারাদিনের উত্তেজনা, পরিশ্রম আর সেবায় ক্লান্ত অনুভা খাটের পাশে মেঝেতে আঁচলটা পেতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন সুস্মিতাদেবী জল চাইলে জল দেয়, ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত রাখেন। একদিন রাত্রিবেলা অনুভা নিদ্রাচ্ছন্ন। নিখিলেশ স্থির। হঠাৎ ওর হাতটা কেঁপে শূন্যে উঠে খুঁজে নিয়েছিল সুস্মিতাদেবীর আঙুলগুলো। ভালবাসার জমে উঠেছিল চোখে। হাতটা উঠেছিল শুধু মুহূর্তের জন্য। চিরবিদায় হয়তো নিতে হবে তাড়াতাড়িই, তাই সময় থাকতে থাকতেই সুস্মিতাদেবীর বাকী জীবনের পাওনাটা মিটিয়ে দিয়েছিল সে রাত্রিতে নিখিলেশ। তাই সুস্মিতাদেবী গ্রাহ্য করেনি কোনো কটুবাক্য। আমার মূল্যতো নিখিলেশের মনে, অন্যের মুখে তো নয়—এই বোধটা ওকে নির্বিকার রাখতে সাহায্য করেছিল। ওদের শত অপমানেও তাই অপমানিত হয়নি সে। হাজারটা ছি ছি শব্দও একটা ঢিল ফেলেনি ওর মনে। নিখিলেশ ওকে আড়ালে দিয়ে গেছে সব কিছু। লোকে জানেনি। সেই রাতের পর থেকে ঘোরের মধ্যেই ছিল নিখিলেশ। কোনোও কথা ছিল না ওর মুখে। যদি তাই থাকতো যদি সত্যিই আর একটা কথাও

আর না বলতো নিখিলেশ তবে নিখিলেশকে চিরকালের মতো হারিয়ে বুক চিরে চিরে কাঁদতে পারতেন সুস্মিতাদেবী। ব্যথার পাহাড়ের বরফ গলিয়ে বুকটা হাল্কা করতে পারতেন উনি। যে অমূল্য সম্পদের অধিকারিনী ছিলেন, ভালবাসার সেই নির্মল স্মৃতিকে মনের মধ্যে সযত্নে রেখে চোখের জলে ধুতে পারতেন অবশিষ্ট জীবনটা। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে কি ধন্দে রেখে গেলো নিখিলেশ সুস্মিতাকে? একটা অক্ষরও উচ্চারণ না করে কি ও চলে যেতে পারত না?

মৃত্যুর আগের দিন হঠাৎই যেন চেতনা ফিরে এলো নিশিলেশের। চোখ মেলে তাকালো। কি যেন খুঁজলো। আবার চোখ দুটো বন্ধ করলো। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা জল। আস্তে আস্তে ফাঁক হলো ঠোঁট দুটো। কিছু বলছে, কিছু বলতে চায়—আত্মীয় স্বজন, দু একজন প্রতিবেশী প্রায় ঝুঁকে পড়লো মুখের কাছে।

অনু-উ-কথাটার বাকী অংশ মুখের মধ্যেই হারিয়ে গেল।

যেন মৃত্যুর দূত নয় জন্মের বার্তা এলো ঘরে। নব জীবনের খবর শোনালো কেউ। উল্লাসে ফেটে পড়লো সকলে।

দেখলেহ্ল দেখলেহ্ল অনুভাকে ডাকলো শেষ মুহূর্তে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হারাবার আগের মুহূর্তে অনুভাকে ডাকলো ও। দেখেছহ্ল দেখেছহ্ল—

সবাই যে সুস্মিতাদেবীকে ঠেলে ঠেলে দেখাতে চাইছে, শোনাতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে, সেটা বুঝতে পারছিল সে। তোমাকে নয়, অনুভাকে চেয়েছে নিখিলেশ। মৃত্যুর মুহূর্তে তো নিখাদ সত্যটাই বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে।

চাপা একটা আনন্দে অনুভার ছেলেমেয়ের মুখ উজ্জ্বল। গর্বে অনুভার মুখ উদ্ভাসিত। এতদিনের শত্রুকে হারিয়ে দেওয়ার সুখ।

নির্লজ্জের মতো তাও সুস্মিতাদেবী বসে রইলেন শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলা অবধি। শুধু একটা আশা নিয়ে মৃত্যুর আগে যদি শব্দটা শেষ করে যায় একবার নিখিলেশ। যতোদিন নিখিলেশ ছিল সমাজের কোনো স্বীকৃতি চায়নি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কোনোদিন নিখিলেশ সামাজিক মর্যাদা দিতে পারেনি ওকে। জীবনটা ছেড়ে যাওয়ার আগে নিখিলেশ কি ওদের ভালবাসাকেও অবৈধ করে রেখে যাবে? সকলের দৃষ্টি যেন ফালা ফালা করছে তার শরীর। তবুও সুস্মিতাদেবী কানখাড়া করে শব্দটা নিখিলেশ সম্পূর্ণ উচ্চারণ করবে এই অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু শব্দটা সম্পূর্ণ না করেই নিখিলেশ কি তবে চেতনারহিত অবস্থায় অনুভাকেই ডেকেছিল? নাকি শুধু সুস্মিতাদেবীর কারে বহু আবেগে বহু প্রেমে যে 'অনুপমা' শব্দটি উচ্চারিত হতো, নিখিলেশ যাওয়ার আগে পাঁচ কান করতে চেয়েছিল সেই লুকনো শব্দটা, গোপনীয় সেই নামটা।

চেয়ারের ওপর বসেই আছেন সুস্মিতাদেবী। ঘামে শরীর ভেজা। গরম হাওয়া ঘোট পাকিয়েছে ঘরে। চড়াই পাখীটা আর উড়ছে না। খোলা পৃথিবীর আশা বোধহয় ত্যাক করেছে ও। ক্ষীণস্বরে ডাকছে মাঝে মাঝে। ডানদুটো দু একবার ছড়িয়েই চুপসে গেল ও। অথচ দু'পা

হেঁটে সুস্মিতাদেবী পারতেন পর্দাটা সরিয়ে দিতে। কিন্তু উনি আজ দিগভ্রান্ত, অসহায়। প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে বুঝতে চাইছেন মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ার আগে নিখিলেশ কি কোনো ইঙ্গিত করেছিল? কোনো সূত্র রেখে গিয়েছিল সুস্মিতাদেবীর জন্য। মৃত্যুর আগে কি খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন ওকে? কোনো সূত্র রেখে গিয়েছিল সুস্মিতাদেবীর জন্য। মৃত্যুর আগে কি খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন ওকে? অস্বস্তিবোধটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারেন না সুস্মিতাদেবী। অথচ সন্দেহের এই কাঁটাকে উপরে ফেলে গভীর দুঃখ বোধটাকে বাইরে টেনে এনে ডুবে যেতে বড় ইচ্ছে হয় ওর।

ক্ষতিপূরণ

দ্বিজেনবাবু সবকিছু ঠিক করেই বাড়ি ফিরলেন। ফিরেই অবশ্য উনি কিছু বলেননি; খেতে বসে রাত্রিবেলা ভাঙলেন কথাটা। ওই প্রসঙ্গটা উঠতেই উনি শান্তস্বরে জানালেন। ছেলেরা প্রথমে গুম্ মেরে গেল। কিছুক্ষণ পর বড় ছেলে সিদ্ধার্থ মুখ খুললো—

আগে জানালে এতো হ্যারাসমেন্ট হতো না আমার। যাক্— যা ভালো বুঝেছ।

ভদ্র ও, অমায়িক, সুশিক্ষিত এবং কলেজের অধ্যাপক। রাগলে ওর মুখ লাল হয়। গলার স্বর সামান্য কাঁপে। কিন্তু গলা চড়ে না, কুঁচকায় না মুখের পেশী। দ্বিজেনবাবু বড় ছেলের দিকে তাকালেন। নিয়ন আলোর নিচে ওর মুখের রক্তিমাভার গাঢ়ত্ব পরখ করা মুশকিল। সাদা সাদা লাগে সব। ওর ভয় ছিল ছোট ছেলে অমিতকে। বড় কাটখোট্টা ও, বড় বেশি বেসামাল। রাগলে আমি কাউকে তোয়াক্কা করিনা, এইটাই ওর অহমিকা। কিন্তু আশ্চর্য, অমিত কিছুই বললো না। আর শোভনাদেবী, চিরদিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বামীর আড়ালে প্রায় মিশে যাওয়া শোভনাদেবী কিছু বলবে এ কথা ভাবেও না কেউ।

অল্পের ওপর দিয়ে ছেলেরা মেনে নিলো দেখে খুশি হলেন দ্বিজেনবাবু। বেশ হাল্কা লাগলো নিজেকে। রক্ত চাপের রুগী উনি, হঠাৎ বেহিসাবী কথা বলে ফেলেন আজকাল। তাই ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে চলেন। এড়িয়ে বরাবরই চলেন। যখন যুবক ছিলেন, যখন রক্তচাপের সমস্যা ছিল না, ছিল একখানা টগবগে সতেজ শরীর, তখনও। পরিবেশও ছিল অনুকূল। বোটানিস্ট দ্বিজেনবাবু সারাজীবন চাকরি করেছেন বোটানিকাল গার্ডেনে। সবুজ গাছপালা, পাখীর কূজন, আর মিষ্টি বাতাসে দশটা পাঁচটা করেছেন। গায়ে লাগেনি অফিসপাড়ার ক্লেদাক্ত স্পর্শ বা চাবুক মারা তাড়া। গার্ডেনে ঘুরে ঘুরে গাছ নিয়ে বিভিন্নরকমের গবেষণামূলক কাজ করতেন। মাড়িয়ে যেতেন শুকনো পাতা, সবুজ ঘাস। মাথার ওপর সুবিশাল বৃক্ষের শাখা দুলে দুলে তার শরীরে মাখিয়ে দিতে স্নিগ্ধ বাতাস। বৃষ্টিতে ভিজে, ঘাসে পা ডুবিয়ে কাজ করতে ক্লান্তি আসতো না মনে। সূর্যের প্রখর তেজ গাছের ভেতর দিয়ে গলে পড়তো বলে, কড়া লাগতো না। উষ্ণ মনে হতো। ঘরে ফিরেও প্রকৃতির সেই কোমলতার সান্নিধ্য। সুন্দরী শোভনা, সেবাপরায়ণা শোভনা। দ্বিজেনবাবুর সামনে চিরকাল ধরে রেখেছে মনোরম সংসারের ছবি। সংসারে সমস্যার উদ্ভব হলেও শোভনার মোলায়েম হাত, কোমল গলা ও শান্তস্বভাব সমস্যার দাবদাহে প্রলেপ ছড়াতো। সবসময় সমস্যা সহজভাবে বিদায় না নিলেও, অস্থির করতো না দ্বিজেনবাবুকে কখনই। ধীরে সুস্থে মিটিয়ে ফেলার সময় পেতেন। তাই শান্তিপ্রিয় দ্বিজেনবাবু পেয়ে গেলেন একটি শান্তিময় জীবন। বড় ছেলে সিদ্ধার্থ জীবনের কবিতার ছন্দ মেলালো, কিন্তু ছোট ছেলে অমিত হলো কিছুটা খাপছাড়া, ছন্দপতন। ওর উগ্র চালচলন শোভনাদেবী আত্মস্থ করেও অনেক সময় নিঃশেষ করতে পারেন না। দুচারটে হলকা দ্বিজেনবাবুর গায়ে ছ্যাঁকা দেয়। তাও সব মিলিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন ওদের। শান্ত, স্বাভাবিক, ছিমছাম। বছর চারেক হল অবসর

নিয়েছেন। শহরের প্রান্তে, গড়িয়ার ব্রীজ ছাড়িয়ে ছোট একটা একতলা বাড়ি করেছেন। গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকার প্রায় পঁচাত্তর ভাগ নিঃশেষ হয়েছে এই খাতে। বাকি পঁচিশ ভাগ ব্যাঙ্কে আছে আর আছে পেনশনের টাকা। সিদ্ধার্থ কলেজে পড়ায়। মাস গেলে সংসার খরচ বাবদ কিছু দেয়। বছর খানেক আগে ল পাশ করে সিনিয়রের আন্ডারে ঢুকেছে অমিত। রমরমা প্র্যাকটিস ভদ্রলোকের। হাইকোর্টেই ঠেক তার, কিন্তু তাকে নিয়ে টানাটানি চলে বিস্তর। এগারোটায় হাইকোর্টে একটা রিট পিটিশন মুভ করলে, বারোটায় সুট হিয়ারিং আলিপুরে। অমিত বুদ্ধিমান, সিনিয়রের পেছু ছাড়ে না কখনও। উনি ছুটছেন তো অমিতও ছুটছে, আর্গুমেন্ট করছে তো অমিত পাশে নোট করছে। প্রভিশনাল সার্টিফিকেট জোগার করে, এনরলমেন্ট করিয়ে নিতে নিতে মাস পাঁচ ছয়েক লেগেছে, তারপর থেকে শুরু করেছে প্র্যাকটিস। পয়সা এখনও আনেনি বাড়িতে কিছু, গাউন বানাতে, কোট বানাতে একবার আর রোজ যাতায়াতের জন্য দ্বিজেনবাবুর পকেটে হাত পড়ছে বার বার। মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল, সুষ্ঠ সংসার। সবকিছু ঠিক ঠাক চলার পর, অবসর গ্রহণের পরপরই যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জুটলো ঝামেলা রক্তচাপের। হই হই করে চড়ে, অস্থির হন নিজে, অস্থির করেন সবাইকে। যখন নামে, বড় খারাপ লাগে দ্বিজেনবাবুর, বড় অপরাধী। কিন্তু ওর এইভাব দেখে শোভনাদেবী যখন দ্বিগুণ অপরাধবোধে ভারক্রান্ত হয় তখন আবার সংসার ঝলমলে, নির্মেঘ, স্বচ্ছ। কিন্তু বছরখানেক ধরে দ্বিজেনবাবুর প্রশান্ত মনে অশান্তির যে মেঘ জমেছে সেটা থম্ মেরে আছে, কিছুতেই মনটাকে শান্ত রাখতে পারছেন না।

বড় ছেলে একটা রঙীন টেলিভিশন কিনেছে গত বছর। ওটাকে ঘিরেই জানলো সবাই। পুরনো দিনের সিনেমা দেখানো হবে। দ্বিজেনবাবু বেশ উত্তেজিত, শোভনাদেবী তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত। সিনেমা শুরু হলো। মন দিয়ে সিনেমাটা দেখছিলেন দ্বিজেনবাবু। কিন্তু মাঝে মাঝেই শোভনাদেবীর প্রশ্ন ওর মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটাচ্ছিল। হঠাৎ একটা প্রশ্নে চমকে গেলেন দ্বিজেনবাবু।

পদ্মাদেবী হাতে ওটা কি ধরেছে গো?

পদ্মাদেবী শোভা পদ্মাদেবী কি বলছ?

দ্বিজেনবাবু হতচিকত।

না- না- শোভনাদেবী অপ্রস্তুত।

দ্বিজেনবাবু দেরি করেননি। পরের দিনই আই স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন স্ত্রীকে। আই স্পেশালিষ্ট ঘষ্ ঘষ্ করে লিখে দিলেন ব্লাড টেস্ট। ইউরিন টেস্ট, চেস্ট এক্সরে, ই সি জি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

মানুষের শরীরের যে এতোরকমের টেস্ট হয় জানা ছিল না রক্তচাপের রুগী দ্বিজেনবাবুর। একটা বাঁচোয়া, শুধু প্রেশারের যন্ত্রে ফুসফুস করা ছাড়া সরাসরি কোনোও টেস্টের কথা বলেন না ডাক্তারবাবু ওকে।

ইউরিন টেস্টে বেরলো সুগার। ব্লাড টেস্টে বেরলো সুগার। আর সুগারের জন্যই নাকি ছানি। এছাড়া বয়স তো আছেই। দুচোখেই ছানি। দীর্ঘ একমাস টানাটানি। অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির

খুঁটিনাটি হিসেব নিয়ে আই স্পেশালিস্ট মতামত দিলেন মাস আষ্টেক পর বাঁ চোখটার ছানি অপারেশন করবো। ইতিমধ্যে চলুক সুগারের চিকিৎসা। কারণ সুগার চোখে ইন্টারন্যাল হ্যামেরেজও ঘটিয়েছে।

উপায়? দ্বিজেনবাবু দিশেহারা।

সুগারটা কনট্রোল করাই একমাত্র রাস্তা— অভিজ্ঞ ডাক্তারের জবাব।

মাস ছয়েক কাটার পর থেকেই বাড়িতে আলোচনার সূত্রপাত। দ্বিজেনবাবু বেশ বুঝতে পারলেন ছেলেরা চায় না দ্বিজেনবাবুর পঁচিশ ভাগ সঞ্চয়ে হাত দিতে। সিদ্ধার্থের ছাত্রের বাবা ডাক্তার, হাসপাতালে আছেন। ভালভাবে উনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কম খরচে মিটবে সব। বিনা ঝামেলায়। দাদার সংগে ছোটবেলা থেকে অমিতের বনিবনা নেই। কিন্তু এই প্রস্তাব ও লুফে নিলো। হাসপাতালেই হোক না অপারেশনটা— ছেলেরা মতামত জানালো। কিন্তু দ্বিজেনবাবুর মনটা খচ্‌খচ্‌ করে। সহধর্মিনীকে একটু আরাম দেওয়ার বড় সাধ হয় ওর। সারাজীবন আমাদের এতো সেবা করলো, একটু বেশি অর্থের বিনিময়ে যদি ওকে একটু সেবা কিনে দিতে পারি, কি আর অন্যায় তাতে? ছেলেদের জন্য বাড়ি তো করেই দিয়েছি, নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখেছে। ছোট শালীর বাড়ি গড়িয়াহাটে। ওখানে যেতে যেতে বেশ একটা সুন্দর, ছায়াঘেরা নার্সিংহোম দেখেছেন। ওই পরিছন্ন পরিবেশের চেহারাটাই বারবার মনে উঁকি দিয়েছে।

হাসপাতাল— বাপরে বাপ। নোংরা, একখাটে দুজন, সময়ে ডাক্তার নেই, রোগী মরে গেলে জল দেওয়ার লোক নেই। অব্যবস্থা আর দুর্গন্ধের আর একনাম হাসপাতাল। কাগজে তো প্রায়ই দেখেন আজ ধর্মঘট, কাল ইঁদুর বেরিয়েছে, পরশু এমার্জেন্সীতে ওষুধ নেই। অফিসের এক কলিগকে দেখতে গিয়ে চাক্ষুষ পরিচয় যা পেয়েছেন, সেটা তার এত ভালবাসার স্ত্রীর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই ছেলেরা যখন হাসপাতালের সপক্ষে মোটা মোটা যুক্তি দেখায়, উনি তখন ডুবে থাকেন ধূলিহীন, গাছপালায় ছাওয়া, ছায়াময় একটি নার্সিংহোমের ছবিতে। ব্যাঙ্কের টাকা পয়সার হিসেব করে, বার ছয়েক নার্সিংহোমে চক্কর দিয়ে, উনি সব ঠিক করে ফেললেন। আর আজ সকালেই টাকা দিয়ে বুক করে এলেন সিটটা। দিন সাতেকের ধাক্কা। কুলিয়ে যাবে। ব্যাঙ্কটা ফাঁকা হবে ঠিকই কিন্তু শোভনাদেবীর ঠোঁটের সেই তৃপ্তির হাসি কি খুবই মূল্যহীন? ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, নিজেরও পেনশন আছে। চলেই যাবে। শুধু দোতলটা করার ইচ্ছে ছিল। যাগ্‌গে। এ সব চিন্তায় আমল দেওয়াই ঠিক নয়। আলোচনার মধ্যে দিয়ে ছ মাসটা আটমাসে পা দিয়েছে। ছোট ছেলে অমিত খাওয়ার টেবিলে কথা বলেনি ঠিকই কিন্তু রাত্রিরবেলা বাবামার ঘরে এসে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা ছেলের চেয়েও বাবা বেশি নাছোড়বান্দা। তাই শেষ পর্যন্ত নার্সিংহোম।

দিন দশেক পরে চোখজুড়ানো নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিলেন শোভনাদেবীকে। চকচকে তক্‌তকে। বহু ডাক্তার আসে এখানে। যার যার রোগীকে দেখে, বসে বসে প্রেশক্রিপশন বলে, নার্স লিখে নেয়। সটান ওঠে। গটগট হয়ে হাঁটে। সত্যিই, তাদের সময়ের ডাক্তারগুলো কেমন ছিল, কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। বসে বসে প্রেশক্রিপশন লিখতো। এখনকার ডাক্তাররা কি

স্মার্ট? কি ধারালো! রিসেপশনের সোফায় বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে। সোনালি লাল প্যাকেট থেকে কিং সাইজের সিগারেট বার করে লাইটার জ্বালায় বাঁ হাতে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রেশক্রিপশন বলে। লেখে না, বলে। কাচটা ইষৎ লালচে। ডোড়াকাটা প্যান্ট। সবকিছু কেমন মিহি, মিহি, রেশমী রেশমী।

ছানি কাটা তো ফোঁড়া কাটার চেয়েও কম রিস্কি—

ডক্টর মুখার্জীর হাসি বন্ধ ঠোঁটদুটিতে সামান্য স্পন্দন তোলে।

ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, সুগারটা এখন— দ্বিজেনবাবুকে প্রায় ছুটতে হয়।

ডক্টর মুখার্জীর সুগন্ধী শরীরটা তখন সিঁড়ির বাঁকে। একটু পরেই কানে আসে সাদা হণ্ডাসিটি মৃদু ইঞ্জিনের শব্দ। আবার ঝিম্ ধরে গোটা নার্সিংহোমে। কেমন যেন হিমশীতলতা। ঠিক সিদ্ধান্ত নিলাম তো? ভয়, একরাশ ভয় গিলে ফেলেন দ্বিজেনবাবু।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য এখানে অতো বাধাধরা নিয়ম নেই। ডাক্তারবাবু আসেন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হওয়ার একঘন্টা বাদে। তাই রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার কড়িডোরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি, এবার আস্তে আস্তে বাড়ির পথে পা বাড়ান। বাইরে তখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। তাড়া নেই কোনো দ্বিজেনবাবুর। ব্যগ্র দৃষ্টি জোড়া আজতো ঘরের জানলায় নেই। পড়ে আছে পেছনে। সাগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন আবার চারটে বাজবে, কখন দরজায় ছায়া ফেলবে চিরপরিচিত মানুষটা।

আজ সকালে অপারেশন হয়ে গেলো। দুই ছেলে নিয়ে দ্বিজেনবাবু সকাল থেকে বসে আছেন একতলায়। সকাল নটায় হাসপাতালে যাওয়ার আগে ডক্টর মুখার্জী অপারেশনটা সেরে গেছেন। ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন যখন বেরিয়ে গেলেন। দ্বিজেনবাবুর শুকিয়ে যাওয়া গলার স্বরে আওয়াজ ফুটতে ফুটতেই উনি রাস্তায়। ছেলেরাও দুপা এগিয়ে ছিল। ডাক্তার মুখার্জী শুধু হাতটা সামান্য তুললেন। দ্বিজেনবাবু আবার গিয়ে বসলেন চেয়ারে। ছেলেরা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। তোলা হাতটুকুর অর্থ বুঝবার জন্য চিন্তার জগতে পাড়ি দিলেন দ্বিজেনবাবু।

বিকেল থেকেই শোভনাদেবী বলতে শুরু করলেন চোখে বড় ব্যথা।

অপারেশন হয়েছে, ব্যথা হবে না? নার্স ঝাঁঝিয়ে উঠলো দ্বিজেনবাবু অসহায় প্রশ্নে।

ব্যথা কিন্তু কমলো না, বাড়লো। পরদিন বিকেল থেকে ব্যথা ব্যথা আর বেশি বললেন না শোভনাদেবী কিন্তু দ্বিজেনবাবুর শরীরের রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করলো, রক্তচাপ হ্রাস পেয়ে শিথিল করলো ওর হাত পা যখন তিনি বেশ বুঝতে পারলেন শোভনাদেবী আচ্ছন্ন, প্রায় অচৈতন্য। ডাক্তারবাবুর জন্য রাত এগারোটা অবধি অপেক্ষা করার পরও উনি এলেননা। ভয়ে শরীর তখন অসাড়। কি হল! ছেলেরা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল বাবাকে। বাড়িতে কন্টকিত অবস্থা। কি একটা অজানা ভয় এসে আঁকড়ে ধরেছে ওকে। শোভনা মরে যাবে নাকি? ছানি অপারেশন করলে এইরকম প্রতিক্রিয়াও হতে পারে? কই কোনোদিনতো জানতাম না। শোভনার শাড়ি আলনায় ঝুলছে, ওর সিঁদুরের কৌটা, ওর রান্নার জিনিষপত্র, ওর সংসার।

চোখের শিরা টনটন করে। বিকেলে নার্সিংহোমে গিয়ে শুনলো ডাক্তারবাবু ঠিক পোনে চারটেয় এসেছিলেন। দিন তিনেক ধরে চললো প্রায় যমে মানুষে টানাটানি। ওর ডায়বেটিস আছে, তাই আই স্পেশালিস্ট ডক্টর মুখার্জী আর জেনারেল ফিজিসিয়ান ডক্টর সেন ওর রোগের যে জটিল ব্যাখ্যা দিলেন, দ্বিজেনবাবুর কাছে তা সম্পূর্ণটাই দুর্বোধ্য। আড়ালে ডাক্তারবাবুদের কাছে অনেক তথ্য জেনে, নিজেদের মতামত সহ দ্বিজেনবাবুকে মায়ের রোগের স্বরূপটা বর্ণনা করলো ছেলেরা। কিন্তু শান্তিপ্রিয় দ্বিজেনবাবু রোগের এই ঝামেলাময় ব্যাখ্যায় একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ডক্টর মুখার্জী বলেছিলেন ব্রেইন অ্যাটাক হতে পারে। আবার ডক্টর সেন বললেন ইউরিন আটকে গিয়ে এই বিপত্তি। ছোট একটি অপারেশন করলেন তিনি। ধীরে ধীরে যখন শোভনাদেবী বিপদটা কাটিয়ে উঠলেন তখনই আসল বিপদটা জানতে পারলেন দ্বিজেনবাবু। এতো কাঠখড় পুড়িয়ে, যথাসর্বস্ব দিয়ে, শোভনাদেবী মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেন একটি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে। অপারেশন করবার সময় অসাবধানতাবশতঃ ইনফেকশন হয়ে গেছে। পুঁজে রক্তে চোখটা মাখামাখি। রোজ ড্রেসিং করায় নার্স। বালিশও ভিজে থাকে রক্তে আর পুঁজে। মাথার যন্ত্রণা অসহ্য। সব গন্ডগোল হয়ে যায় দ্বিজেনবাবুর। ত্রাসে, দুঃখে অভিভূত দ্বিজেনবাবু। একদিন খুব সকালে হাজির হয় ডাক্তারবাবুর কাছে। সঙ্গে ছিল অপারেশন ফি বাবদ চার হাজার টাকা। নার্সিংহোমে জমা নয়, আগের থেকে কথা ছিল টাকাটা ওনার হাতে দিতে হবে। ক্যাশ। শোভনাদেবীর হঠাৎ বাড়াবাড়ি হওয়ার জন্য দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ওর? কেঁপে যাওয়া গলার স্বরটা গলার শিরা ফুলিয়ে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করেন দ্বিজেনবাবু।

দেখুন— ব্লাড যদি ক্লট করতো তবে কেসটা এনকারেজিং ছিল খানিকটা, কিন্তু ইনফেকশন— মোস্ট আনফরচুনেট-পুওর লেডী— ডাক্তারবাবুর অসহিষ্ণু চোখ কবজি উলটে সময় দেখে।

ডাক্তারবাবু— কেস্‌টা কি সিরিয়স?

ভ্রুটা প্রায় বেঁকেই যাচ্ছিল ডক্টর মুখার্জীর, সামলে নিলেন।

শী হ্যাজ লস্ট হার ভিশন্।

কী-ই-ই— জানা কথাটা যখন বিধাতার মুখের বাণী হলো তখন দুর্বিষহ কষ্টে বুকের পেশীগুলো দুমড়ে গেলো।

দেখুন, ব্রেইন অ্যাফেক্ট হয়ে মারা যেতে পারতেন উনি, বেঁচে গেছেন বড় জোর। ডক্টর মুখার্জী এবার দরজার দিকে তাকালেন। আর সময় দেবেন না মনে হয়। রক্ত চাপ লাফ দিয়ে মাথায় চড়লো অতর্কিতে। শূয়োরের বাচ্চা বলে চিৎকার করে উঠতে এক তীব্র আকুলতা অনুভব করেন। কিন্তু ভদ্র সভ্য দ্বিজেনবাবু শুধু বলতে পারেন—

থ্যাঙ্ক য়ু স্যার, থ্যাঙ্ক য়ু।

একচোখের দৃষ্টি চিরদিনের মতো হারিয়ে বাড়ি ফিরলেন শোভনাদেবী। ওনাকে এই নির্মম সত্যটা জানানো বড় কঠিন। কিভাবে বলবেন ওকে দ্বিজেনবাবু— শোভনা, অনেক যত্নে,

অনেক ঘুষ খাইয়ে আমি তোমার চোখের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়েছি। ড্রেসিং করার ব্যাপার ছিল তাই একজন নার্সও রাখতে হল রাতের জন্য। ব্রেইন অ্যাটাকে বা ইউরিন আটকে অচৈতন্য না হয়ে পড়ে আবার। মায়ের এই পরিস্থিতিতে ছেলেরাও বেশ ভেঙে পড়েছে।

আমরা চেষ্টা করব, দেখি যদি কিছু করা যায়। ছোট ছেলে কলকাতার আর এক নামজাদা আই স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গেল শোভনাদেবীকে। যে কথাটা ওরা বলতে পারেনি, অত্যন্ত সহজসুরে ডাক্তারবাবু বললেন কথাটা— দা আই ইজ কমপ্লিটলি লস্ট। কালো চশমা পরে থাকার কোনো দরকার নেই। ছানি অপারেশন করার পর ডক্টর মুখার্জী কালো চশমা পরতে বলেছিলেন। আসলে দ্বিজেনবাবুই নার্সিংহোম ছাড়ার আগে ডক্টর মুখার্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

পরতে পারেন— ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন। ওনার আর একজন পেশেন্ট নতুন ভর্তি হয়েছিল সেদিন, তাই সময় কম।

ছেলে মাকে ধরে বাইরে নিয়ে আসতে আসতে চোখের ইশারা করল বাবাকে।

জেনে গেছে, ও জেনে গেছে।

শোভনাদেবীর চোখে তখন কালো চশমা। দ্বিজেনবাবু ভয়ে আর তাকাতে পারছেন না ওর মুখের দিকে। কালো চশমার ভেতরে শোভনা কি এক চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে? দৃষ্টি যখন একচোখে সংবদ্ধ হয় তখন কি সেটার প্রখরতা তীক্ষ্ণতর?

ছাড়বো না, ছাড়বো না।

ছেলেরা যেন মন্ত্র জপতে থাকে। শান্ত সিদ্ধার্থ উতলা, অমিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কি সিদ্ধির জন্য এই মন্ত্র আওড়ানো দ্বিজেনবাবু প্রথমে বোঝেননি, বুঝলেন মাস তিনেক বাদে।

শোভনাদেবী তখন আবার ফিরে এসেছে সংসারে। ভগবানের এই নিষ্ঠুর আঘাতেও নীরব সে। ধীর, স্থির। শুধু এই প্রসঙ্গে কোন কথা উঠলে উঠে চলে যায়। যদি উঠতে না পারে তবে একদম চুপ করে থাকে, কখনও কখনও মনে হয় ও কি চৈতন্যরহিত?

চোখটা গলে গেছে বলে সুন্দরী শোভনা বিকৃত। সুগার আছে বলে ঘাটা সম্পূর্ণ সারেনি। তা না হলে কসমেটিক আই পরতে পারতো।

সিনিয়রের সঙ্গে আলোচনা করে অমিত একটা ড্যামেজ সুট ফাইল করল কোর্টে। পাঁচলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। কেস্ চললো প্রায় চার বছর। হাইকোর্টে অ্যাপিল হল। সেখানেও ঝুলে থাকে মামলাটা কিছুদিন।

কেস্ চলাকালীন বাড়িতে সব সময় উত্তেজনা। আজ কেস্টা ওদের দিকে এগলে কালকে যায় বিপরীত পক্ষের দিকে। সেই শান্ত, সমাহিত বাড়িটা সব সময় অস্থির, উত্তেজিত, অশান্ত। শোভনাদেবীর নষ্ট চোখ দিয়ে কতদিন পুঁজরক্ত গড়িয়েছিল, কতদিন উনি অচৈতন্য ছিলেন। যখন জানলেন মানসিক ভারসাম্য কতটা হারিয়েছিলেন, পাখী পড়ার মতো করে অমিতের

সিনিয়র, অ্যাডভোকেট সুজিত গুহ বোঝায় শোভনাদেবীকে। সাক্ষী দেওয়ার আগে পর পর বেশ কয়েকদিন শোভনাদেবীকে হাজির হতে হয় সুজিত গুহর চেম্বারে। অ্যাডভোকেটের সামনে শোভনাদেবী ঘামে ভিজে ওঠে। গলা শুকিয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে দাঁড়ায় শোভনাদেবী। ছেলেদের শেখানো বুলি, অ্যাডভোকেটের শেখানো সুক্ষ্ম চালের কথা বলতে হয় ওকে।

যন্ত্রণার কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবেন। বলবেন অপারেশন করার সময় ভীষণ খোঁচা খেয়েছিলাম।

যা যা শিখিয়ে দেয় ওরা, সব বেশ গুছিয়ে বলেন। মেনে নেওয়ার স্বভাবই তো ওর, স্বভাব সমঝোতার। মাঝে মাঝে যখন সবাই মিলে বেশি চেপে ধরতো শোভনাদেবীকে, দ্বিজেনবাবু অসহনীয় হয়ে পড়তো।

ছাড় না তোরা ওকে। কেন এত চাপ দিচ্ছিস?

আরে, সামান্য ভুল হলেই কেস্‌টা হারবো, বোঝ না কেন? অমিত বলে।

বাবার অস্থিরতায় সিদ্ধার্থর মুখ লাল হয়।

একবার সুজিত গুহও বিগড়ে গেছিলেন দ্বিজেনবাবুর অনীহা দেখে।

দেখুন, স্বার্থটা আপনাদের। যে রকম বলবেন তাই হবে। এটা আমার প্রফেশন— অমিত আমার জুনিয়র; আর কেসটাও কিছুটা ইউনিক বলেই আমি ইনটারস্টেড। অ্যাডভোকেট গুহ অনর্গল কথা বলেন।

এর পরেও যখন দ্বিজেনবাবু শোভনাকে আড়াল করতে চায় তখন অমিত অমোঘ বান ছোঁড়ে—

বলেছিলাম, নার্সিংহোমে না দিতে। হাসপাতালে কত ব্যবস্থা, কত ডাক্তার।

সিদ্ধার্থর চোখে সমর্থনের দৃষ্টি। আর— আর তখনই চুপসে যান দ্বিজেনবাবু। ধীর পায়ে দরজার বাইরে পা রাখেন।

হাইকোর্টের রায় বেরল শেষ পর্যন্ত। পাঁচ লক্ষ টাকার ক্লেম ছিল। চার লক্ষ টাকা পেলো ক্ষতিপূরণ বাবদ। বাড়িতে আনন্দের বান বইলো। মিষ্টির বাক্স এলো, মাংস চড়লো কুকারে। শোভনাদেবী রান্না করলেন যত্ন করে। সন্ধ্যাবেলায় এলেন উকিলবাবু স্ত্রীকে নিয়ে। রাত্রিবেলা নেমতন্ন। জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত ওদের মুখ।

চার লক্ষ টাকা। কম কথা! অমিতের কথায় মাধুর্যের আভাস— সত্যি সুজিতদা, আপনি জানেন না এই টাকাটা আমাদের দরকার ছিল। বেশ জব্দ হয়েছে ওরা। পকেট থেকে এতোগুলো টাকা যাবে। ডাক্তারটাকে বেশ নাজেহাল করা গেল কি বলেন? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না যে সত্যিই আমরা দোতলাটা করতে পারবো এবার। ভেবেছিলাম হবে না আর। দোতলা হলেই নিচে চেম্বারে বসাবো।

বাড়িটার মডেল পালটিয়ে আবার নতুন আধুনিক ডিজাইনে যদি বানানো যেতো— মৃদু স্বরে বলে সিদ্ধার্থ— চারলক্ষে দোতলা বাড়ি, বাড়ি ভেঙে আধুনিক ডিজাইনে হবে না— একটা চাপা উষ্মা যেন ঝরে পড়ে অমিতের স্বরে— তার জন্য দরকার আরও চার লক্ষ, বুঝলি দাদা আরও চার।

অস্থির অমিতের কথাগুলোতে একটা খামচে ধরা আর্তি। দ্বিজেনবাবুর দুই চোখের দৃষ্টি দুই ছেলের দুজোড়া দৃষ্টির পথ অনুসরণ করে পৌঁছয় শোভনাদেবীর ছানি পড়া অবশিষ্ট চোখটার দিকে। চোখটা আছে এখনও, ছানি পড়েছে, কাটতে হবে। স্থির, অকম্পিত, ছানির আড়ালে প্রায় অদৃশ্য দৃষ্টি।

বুঝলেন দ্বিজেনবাবু। আপনি কোনোও চিন্তা করবেন না। কোনো চিন্তা করবেন না। কোনোও অভাব থাকবে না আপনার। এতো কষ্ট করলেন সারাজীবন। এবার শুধুই সুখভোগ।

দ্বিজেনবাবু হঠাৎ কাঁধে অ্যাডভোকেট সুজিত গুহর হাতে স্পর্শে শিউরে ওঠেন, বলেন, থ্যাঙ্ক য়ু স্যার, থ্যাঙ্ক য়ু।

রচনাকাল ১৯৯২

ডেথ্ সার্টিফিকেট

চব্বিশে মে দিনটা বড্ড সাদামাঠা ছিল তাপস বসুর জীবনে। ওর যদি ডায়েরি লেখার অভ্যেস থাকত তবে দু চার লাইন লিখলেই চলত। সকালে চা বিস্কুট খেয়ে সাইটে গেলাম। মালপত্রগুলো মেলালাম। টুকটাক কাজ। বাড়ি। শরীরটা ক্লান্ত। ওষুধের বাক্স থেকে ট্যাবলেট। মাথাটা ঘুরছে। বমি পাচ্ছে। বুকে ব্যথা কি? মাথায়? ভোঁ ভোঁ— তাপস বসু বোধহয় মরে গেল, একা একা, নিজের বিছানার ওপর ও হঠাৎ ঢলে পড়ে। তাপস বসুর স্ত্রী রমা বসু তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। পাখার হাওয়াটা বড্ড গরম। অবশ্য চারতলার বারান্দার হাওয়া কিছু ঠাণ্ডা না। তবু একটু যেন ভাল লাগছিল। তাপস ফিরে আসার পর রমা জিজ্ঞাসা করেছিল— খাবার বাড়ি। তাপস বলেছিল— একটু পরে, হাত না ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিই।

তাপসের এই জিরিয়ে নেওয়ার অবসরেই রমা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। ও বারান্দায় এসেছিল বোধহয় একটা দশ নাগাদ। বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল। তখন সবে একটা পঁচিশ। ঘরে ঢুকে একটু চমকে গেল রমা। শোওয়ার ভঙ্গি কেমন যেন?

কি গো? খাবে না? ঘুমলে নাকি? রমা কাছেএগিয়ে এসে দেখে তাপসের চোখ আধ বোজা। মুখটা এককাতে। তাপস, তাপস — রমার বুকে তখন শুরু হয়ে গেছিল ঢিপ ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ। সমর ছুটে এল।

সমর দেখ তো, দাদা হঠাৎ না খাওয়া দাওয়া করে কেমন ঘুমিয়ে পড়ল।

বার তের বছরের সমরের চোখে মুখে নেমে এসেছে ততক্ষনে ভয়ের ছায়া।

বৌদি, একটা ডাক্তার ডাকি? মনে হচ্ছে দাদাবাবু—

তুই দৌড়ে যা সমর? যেখান থেকে পারিস একটা ডাক্তার নিয়ে যা। তাড়াতাড়ি যাবি।

সমর ছুটে বেরয়।

রমা তাপসের হাত পায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে।

কি গো তোমার কি জ্বর হল?

মাথায় হাত রাখে।

মাথাটা ব্যথা করছে?

বুকে হাত বোলায় ও — বুকে কষ্ট?

কোথায় কষ্ট তোমায় তাপস?

কি হল?

উন্মাদের মত রমা কথা বলে চলে। খাটে উঠে বসে। পরক্ষনেই মেঝেতে নামে। জানলা দিয়ে উঁকি দেয়।

কত যে দেরি করছে সমর?

ও রান্নাঘরে ঢোকে, চিনির জল কোনমতে গুলে ছুটে আসে। এক চামচ জল মুখে দেয়। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। রমার হাত কাঁপে। তাপসের ঠোঁট শুকনো, শক্ত।

রমা বলে— একটু একটু জল খাও। দেখো ভাল লাগে কিনা। খাও, জল একটু খাও।

রমা দেখে চামচের জল ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

তাপস, তাপস— রমার সারা শরীর জুড়ে ভারি এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মিনিট পনেরর মধ্যেই একজন ডাক্তারকে নিয়ে ঢোকে সমর।

ডাক্তারবাবু সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় তাপসের মুখের দিকে।

কি হয়েছিল?

জানি না তো? আমি তখন দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়।

অসুস্থ মানুষকে ফেলে?

অসুস্থ তো ছিলনা। এই তো সবে কাজের থেকে ফিরেছে।

রমা খাটের কাছে সরে যায়— অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। সেই তখন থেকে শুধু পড়ে আছে। একটু জলও খায়নি, — হঠাৎ এতক্ষণে গলার কাছটায় যন্ত্রণা শুরু হয় রমার।

ডাক্তারবাবু চোখ টেনে টর্চ ফেলে। বুকের ওপর টেথিস্কোপ ফেলে।

ওকে হাসপাতালে পাঠান।

কোন হাসপাতালে পাঠাব ডাক্তারবাবু?

যেখানে হোক। অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিন।

অ্যাম্বুলেন্সের ঠিকানা বা ফোন নম্বর?

ভাল তো, কিছু জানেন না?

সমর বোঝে ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু আপনি থাকুন। হাসপাতালের গাড়ি এলে আপনি যাবেন।

আমার তাড়া আছে। আর এ কেস আমার হাতের বাইরে—

ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার সিঁড়িতে।

রমা হঠাৎ ছুটে যায়

ভীতিচকিত কণ্ঠে যেন গুঁঙিয়ে ওঠে— ডাক্তারবাবু অন্ততঃ অ্যাম্বুলেন্সের ফোন নাম্বারটা—

ডাক্তাবাবু সিঁড়ি থেকেই দুটো নম্বর বলে।

শেষ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স আসে। দুটো লোক উঠে আসে ওপরে। বিছানার ওপরে শোওয়া তাপসের দিকে তাকিয়ে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

রমা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে—

একটু তাড়াতাড়ি করুন ভাই।

এ বডি তো নেওয়া যাবে না।

বডি। রমা গিলে ফেলে একগলা ত্রাস। মুখে সামান্য হাসির রেশ তুলে বলে—

সিঁড়িটা কি ছোট ভাই?

লোকটা রমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে— ডাক্তার দেখান নি?

ডাক্তারবাবুই তো বললেন আপনাদের খবর দিতে। বললেন হাসপাতালে পাঠান তাড়াতাড়ি দরকার। ভাই, একটু তাড়াতাড়ি করুন।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন?

আমরা নিতে পারব না। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক—

আপনারা চলে যাবেন?

কি করব থেকে?

চলে যাবেন?

যদি বলেন থাকতে পারি।

একটু থাকুন তবে? ভাই একটু থাকুন আপনারা।

লোকদুটো নিচে নেমে যায়।

তাপস বসুর বাড়ির খবর এইবার হাওয়ায় ভাসে। নিঝুম দুপুরে, এই গরমে প্রত্যেক বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ। পুরো পাড়া দিবা নিদ্রায় মগ্ন। গাছের একটা পাতাও কাঁপছে না। পিচের রাস্তা গরমে নরম। তাপসবাবু বাড়ির সামনে রেডক্রস দেওয়া সাদা ধপধপে গাড়ি।

কি হল?

কি হল?

কৌতূহলী চোখ দু চারটে সজাগ হল।

কি হল বল তো?

মনে হয় কেউ অসুস্থ।

গুটি গুটি পায়ে দু একজন বেরিয়ে আসে।

অনুভা মিত্র বলে— কি হয়েছে?

ওপর তলার বাবু বোধহয়— চোখের ইশারায় বাকি কথাটা সারে অ্যাম্বুলেন্সের লোকটা

সে কী? একদম?

হু। মরে গেছে।

তা আপনারা? সুজাতা রায় জানতে চায়।

আমরা ডেড বডি তো নিই না।

তবে?

অপেক্ষা করতে বললেন। তাই করছি।

তাপস বসু বোধহয় মরে গেছে।

বোধহয় মরে গেছে? তাই না কি? ডাক্তার আসে নি?

সে কি কথা? ডাক্তার ডাকা হয়নি? স্ট্রেঞ্জ।

পাড়ার বেশ কয়েকজন মহিলা এই দুপুরের গরমে রাস্তায় জড় হয়। নিজেদের মধ্যে চলে ফিস ফিস আলোচনা।

চল যাই ওপরে।

দীপা, চিত্রা, সুনন্দা, অমৃতা ওপরে ওঠে।

খাটের ওপরে শোওয়া তাপস বসু।

সমর দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে। টেলিফোনের বোতাম টিপছে তখন রমা বসু।

ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই বলে— দেখো ভাই, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমার স্বামী। একজন ডাক্তার যদি—

তাপস বসুর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে লোকটা মরে যাচ্ছে। তবে কি রমা বসু বুঝছে না?

ডাক্তার আসেনি?

এসেছিল। হাসপাতালে দিতে বলে চলে গেল। আবার অ্যাম্বুলেন্সও নিচ্ছে না। একজন ডাক্তারের দরকার ভাই।

ওরা বেরিয়ে আসে।

সুনন্দা বলে— হ্যাঁ, ডাক্তার একজন তো লাগবেই। মনে হচ্ছে মরে গেছে। তবে কোমা স্টেজও হতে পারে। মরে গেলে ডেথ্ সার্টিফিকেট তো লাগবে। ডেথ্ সার্টিফিকেট ছাড়া তো নানা ঝামেলা। একজন পুরুষ মানুষও যদি থাকত এখন পাড়ায়।

দীপা চমকে ওঠে মনে মনে। গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে বলে রজত যায়নি অফিসে। ও আস্তে আস্তে দলচ্যুত হয়ে ঢুকে পড়ে বাড়িতে। লোকটা বোধহয় মরে গেছে। এক ডাক্তার এসে চলে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স নিচ্ছে না। ডেথ সার্টিফিকেট নেই। রজতই বোধহয় পাড়ায় একমাত্র পুরুষ মানুষ।

শোনো। তুমি কিন্তু একদম বাড়ির বাইরে বেরিও না। চুপচাপ ভেতরে থাকো।

আহা। প্রতিবেশীর বিপদে যাব না।

একদম চুপচাপ থাক। প্রতিবেশীর বিপদে আমি যাচ্ছি।

সুজাতা আর সোনালী ডাক্তারের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। শুধু রজত নয় আরও অনেক পুরুষ মানুষ আছে কাছাকাছি। তবে ঠিক কেউই বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। পাড়ার সব ইয়ং ছেলেগুলো গেল কোথায়?

আধ ঘন্টার মধ্যে সুজাতা আর সোনালী এল এক ডাক্তারের গাড়িতে। বড় একজন কার্ডিওলজিস্টকে ধরে এনেছে ওরা। গট গট করে ডাক্তার উঠল ওপরে। পেছনে একজন অ্যাসিটেন্ট, ই সি জির যন্ত্রপাতি সমেত। গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করল ডাক্তারবাবু। চোখে পাতা টেনে চাপ দিল। তারপর বলল— ডেড্।

বোধহয় না সত্যি সত্যি মরে গেছে তাপস বসু।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাচ্ছ। সুনন্দা রমাকে ঠেলে দিল— ডেথ্ সার্টিফিকেটটা চান, তা না হলে তো চলে যাবে।

রমা তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো দিশাহারা হয়ে বলল— ডাক্তারবাবু ডেথ্ সার্টিফিকেটটা—

ডেথ্ সার্টিফিকেট? আমি এ ভদ্রলোককে কোনদিন চিনি না। চিকিৎসা করিনি। আমি কেন ডেথ্ সার্টিফিকেট দেব?

সুজাতা বলে— আপনি তো দেখলেন ভদ্রলোক মরে গেছে।

তাতে কি? কি কারণে ভদ্রলোক মরে গেছে সেটা আমি কি জানি?

হুড় হুড় করে নেমে যেতে থাকে ডাক্তার। পেছনে ওর অ্যাসিসটেন্ট। সিড়ির মাথায় রমা আর সুজাতা দাঁড়িয়ে থাকে হত বুদ্ধি।

ডাক্তার নাকি গাড়িতে উঠতে উঠতে বিস্তর গালাগাল দিয়েছে— না বলে নিয়ে এসে জব্দ করতে চেয়েছে আমায়। কেন মরে গেছে কে জানে। সব ইরেসপনসিবল লোক।

আস্তে আস্তে মহিলাদের মনেও ভয় ঢোকে। ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া কি করে হবে? অনুভা বলে— আর যেন কিছু ভাবা যাচ্ছে না। একটু পুরুষ মানুষের বুদ্ধি ছাড়া কি চলে?

সোনালী বলে— ডেথ্ সার্টিফিকেট তো পেতেই হবে। তা না হলে ভদ্রমহিলা বিপদে পড়বে।

দু একজন বাদে প্রায় সব মহিলারাই একবার বাড়ি ঢুকছে, ফ্যানের নিচে বসছে। জল খাচ্ছে। আবার বেরিয়ে আলগা স্বরে জানতে চাইছে— কি হল ডেথ্ সার্টিফিকেট পাওয়া গেল?

মহিলারা বলছে— কি করা যায় বলতো?

একজনও পুরুষ মানুষ নেই ঠিক মতো। পুরুষ মানুষ অবশ্য তখন দলে জুটেছে দুজন। বরুণ আর মনা। বরুণ কলেজের ছাত্র আর মনা বেকার। লেগ্ ওয়ার্কটা হয়। তবে বুদ্ধি

বিবেচনা? এইসব কঠিন কঠিন অবস্থায় হালে পানি পাওয়া কি মহিলাদের পক্ষে সহজ? তাই ওরা আছে বেশ অ্যামেচারিস্টের মুডে। মাঝে মাঝে শুধু বলছে— কি মুশকিল বলতো? ডেথ সার্টিফিকেটটা—

আর পারছি না, পা টা কন্ কন্ করছে। মাথাটা ধরে গেল।

ওরা এক একবার উঠছে চারতলায়। আর এক একবার নামছে রাস্তায়।

ডাক্তার একটাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ভদ্রমহিলার উচিত ছিল যে ভাবেই হোক আর একজন ডাক্তারকে ডাকা—

আচ্ছা ভাই, ভদ্রমহিলাকে— যাগ্‌গে।

আচ্ছা ভদ্রমহিলা এমন নির্বিকার বসে আছে কি করে বলতো? আমি হলে জ্ঞান হারাতাম।

সত্যি— এক ফোঁটা চোখে জল নেই।

মনে হয় ভদ্রমহিলা ঠিক বুঝতে পারছে না।

জ্বালিও না। ডাক্তার ভদ্রমহিলার মুখের ওপর সোজা বলল ডেড্।

সোনালী আর সুজাতা আবার বেরিয়েছে ডাক্তারের খোঁজে আর এর মধ্যে পৌঁছে গেছে রমার প্রৌঢ়া মা বাবা আর ছোট ভাই। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে রমা আর তাপসের ছেলে ছোটন। ওর বয়স এগার। বেলা গড়িয়েছে অনেকটা। সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

রমার বাবা সুজিতবাবু বলল— ডক্টর দাসকে একটা খবর দিয়েছিস্?

তাই তো। এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি কারুর কথাটা।

সুজাতা বলে— আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকেই তো খবর দেওয়া উচিত ছিল। আসলে ডক্টর দাস রমার বাপের বাড়ির পাড়ার ডাক্তার। এখান থেকে অনেকটা দূর। তাছাড়া ভদ্রলোক চেম্বারে বসে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আর ওর বাড়িটা আরও দূরে।

মহিলার দল আবার নামে নিচে।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ভদ্রমহিলার ফ্যামিলি ডাক্তার আছে। দুমাস আগে না কি ভদ্রলোককে দেখে গেছে। তবে তাকে খবর না দেওয়ার মানেটা কি?

মিছি মিছি গোল করা।

দীপা বলে— ভদ্রমহিলা মনে হয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে।

সুনন্দা হাসে— গুছিয়ে যেমন কথা বলছে, মনে তো হয় না ভেবাচেকা।

পুতুল বলে— এক ফোঁটা চোখে জল নেই।

আশ্চর্য!

আমার তেমন সুবিধের লাগছে না ভাই।

কারুর সংগে মিশত না।

অথচ দ্যাখো এখন আমাদেরই দরকার পড়ছে।

কিছু রহস্য টহস্য নেই তো?

সত্যি কিন্তু হঠাৎ লোকটা মরে গেল।

আর অদ্ভুত লোকটা মরছে আর উনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

পুরুষ মানুষরা ফিরতে শুরু করল। কি হয়েছে? মরে গেছে? হঠাৎ?

ডেথ্ সার্টিফিকেট এখনও পাওয়া যায়নি?

শুধু মেয়েরা ছিল?

মাই গড্।

ডাক্তার দাসের কাছে যাওয়া হল। মিঃ রায় অর্থাৎ সুনন্দা রায়ের স্বামীর গাড়িতে রওনা দিল রমা, রমার বাবা, ভাই, মিঃ রায়, সুনন্দা রায়। মিঃ চক্রবর্তী আর সোনালী সেন।

সারা রাস্তা ওরা রমাকে বোঝাল।

শুনুন— অনুরোধ করে বলবেন। ওকে যে ভাবেই হোক বোঝাতে হবে।

সুনন্দা বলে— আমরা যে ডাক্তার এনেছিলাম তাকে আপনি আরও বুঝিয়ে বলতে পারতেন।

শুনুন মিসেস্ বোস— মিঃ চক্রবর্তী বোঝান। বলবেন ডেথ্ সার্টিফিকেট ছাড়া তো চলবে না।

মিঃ রায় বলেল— বলবেন হঠাৎ কেউ মরে গেলে দোষটা কার।

সোনালী শুধু চুপ করে বসে থাকে। গাড়ি থেকে নামার সময় রমার হাত ধরে বলে— একটু চাপ দেবেন।

ডাক্তার দাস তো শুনে আগুন— ডেথ্ সার্টিফিকেট দেব মানে?

আপনি তো ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান মানে? ন মাসে ছ মাসে একবার দেখেছি কি দেখিনি।

দু মাস আগে নাকি গেছিলেন?

হ্যাঁ। জ্বর হয়েছিল। সর্দি জ্বর।

তবে তো আপনি দেখেছেন।

সেই সর্দি জ্বরেই কি মরেছে ভদ্রলোক?

না, তাও ধরুন হার্ট যে ই—

আর যদি আত্ম হত্যা হয়? খুন হয়? হয় কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যু? তবে জেলে যাবে কে? আমি না আপনি? জানেন মৃত্যুর কারণ বৈজ্ঞানিক সম্মতভাবে না জেনে আমরা ডেথ্

সার্টিফিকেট দিতে পারিনা। গিয়ে যদি দেখি পাঁচ মিনিট আগে মৃত্যু হয়েছে তবেও আমরা ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতে পারি না।

সোনালী বলে— তবে কনজিউমার প্রটেকশন।

কনজিউমার প্রটেকশন? হ্যাঁ ওই আইনের জন্যই আরও বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের। পানের থেকে চুন খসলে তো আপনারাই ডাক্তারদের ধরে পেটান। আর কনজিউমার। ওকে দেখে ফিস্ নিয়েছি আমি?

নিইনি। তবে কি করে কনজিউমার হয়?

সোনালী বলে— বিপদে পড়ে এসেছি আমরা দেবেন না?

ডাক্তার দাস একটু তিক্ত হাসি হেসে বলে— বিপদে পড়েছেন বলেই তো দিতে পারছি না।

এত কথা শেখান হয়েছিল রমাকে, কিন্তু রমা সব কথা ভুলে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেরার সময় মিঃ রায় বিরক্ত হয়ে বলে—

এত করে বললাম আপনাকে—

রমা কাঁপাস্বরে বলে— কিছু মনে করবেন না।

এবার পাড়ার বেশ কিছু লোক জড় হল মিঃ রায়ের বাড়িতে।

মিঃ চক্রবর্তী বলে— তাপসবাবুর বাড়ির থেকে কেউ আসেনি?

ওর বাবা মা, ভাই বা কেউ?

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার—

মনা বলে— বৌদি তাপসদার বাড়িতে না কি খবর দেয়নি?

খবর দেয়নি?

বোধহয় হতবুদ্ধি—

হতবুদ্ধি? তবে নিজের বাপ্ মা ভাইকে খবর দিতে বুদ্ধি খুলল কিভাবে?

রহস্য আছে কিছু।

না, বৌদি বলছিল হঠাৎ ছেলের মৃত্যুর খবর বাবা মাকে দিলে যদি ওরা সহ্য করতে না পারে।

না বাবা, বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

হঠাৎ ভদ্রলোক মরে গেল বলেই তো সমস্যা—

আমাদের একটু ভেবেচিন্তে দেখা দরকার।

সন্ধ্যে থেকে রাত হয়। রাত বাড়ে, অথচ ডেথ্ সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। রমার ভাই তুতান গেছে ওর বন্ধুর বাড়িতে। ওর নাকি চেনাশোনা ডাক্তার আছে। যদি ব্যবস্থা কিছু

হয়। পাড়ার লোকের ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে জটিল হচ্ছে পরিবেশ। ইতিমধ্যে বাঁকুড়াতে খবর পাঠিয়েছে রমার বাবা। ওখানেই তাপসের বাড়ি। ওর এক ভাই থাকে বম্বে। বম্বের লাইনও ধরার চেষ্টা করছে সুজিতবাবু। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে ফোনও করছে দু এক জায়গায়। যদি পাওয়া যায় ডেথ্ সার্টিফিকেট।

রাত প্রায় এগারটায় এল তুতান।

না, কয়েক ঘন্টা ধরে মরে আছে লোকটা।

মৃত্যুর কারণ না জেনে ডেথ্ সার্টিফিকেট দেওয়া যায় কি?

কি হবে এখন? রমা যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়েছে। ওর চারধারে যা চলেছে তা যেন ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

তুতানের সঙ্গে এসেছে ওর বন্ধু।

ভাস্কর বলে— দিদি, পুলিসের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মনে হচ্ছে।

পুলিস।

ওদের গিয়ে বলি, ডাক্তার সার্টিফিকেট দিচ্ছে না।

মিঃ রায়ের শরনাপন্ন হল তুতান আর ভাস্কব— প্লীজ দাদা, আপনারা যদি না যান—

মিঃ চক্রবর্তী বলে— দেখুন আমাদের যেন আবার ফাঁসাবেন না।

এর মধ্যে ফাঁসানোর কি আছে? শুধু প্রতিবেশী হিসেবে একটু পাশে দাঁড়ানো— ভাস্কর একটু রুক্ষ স্বরে বলে।

দুপুর থেকেই তো করা হচ্ছে সব কিছু— মিঃ রায় রেগে ওঠেন।

তুতান দু হাত জোড় করে— প্লীজ, আপনারা চলুন।

সোনালী সেন আস্তে বলে— একটু কম রাতে গেলে বোধহয় ভাল ছিল। অনেক আগে থেকেই তো বলছি। রাতের অন্ধকারে মানুষের মাথায় যে বাসা বাঁধে শয়তান।

মিঃ রায়ের গাড়িতে রওনা হল মিঃ রায়, তুতান, ভাস্কর, রমা, রমার বাবা, মিঃ চক্রবর্তী। রাত তখন সাড়ে এগারটা। গরম হলেও শহরের রাস্তা, বেশ নির্জন। রমা গাড়ির মধ্যে মাঝখানে বসে। বাড়িতে পড়ে আছে তাপসের বডি। সমর ও ছোটনের সঙ্গে আছে সোনালী আর সুজাতা।

ডিউটি অফিসার আধঘন্টা অপেক্ষা করিয়ে ডাকে।

কি হয়েছে?

তাপস বসু, আমাদের প্রতিবেশী। দুপুরবেলা মারা গেছেন।

তো?

ডেথ্ সার্টিফিকেট পাইনি।

হেঁয়ালি ছেড়ে পরিষ্কার বলুন তো।

আসলে ভদ্রলোক দুপুরবেলা হঠাৎ মারা গেছে ঘরে একা একা। ডাক্তাররা আর সার্টিফিকেট দিতে চাইছে না।

একা একা? কেন লোকটার পরিবার নেই?

আছে। স্ত্রী আর ছোট ছেলে।

স্ত্রী কোথায়?

এই তো এসেছেন। মিঃ রায় ঢোক গিলে রমার দিকে আঙুল তোলে।

আপনি কোথায় ছিলেন তখন?

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন? এদিকে ঘরে তখন কর্তা মরছে?

রমা ফ্যালফ্যাল করে চায়। মিঃ চক্রবর্তী পাশেই বসেছিল, চাপা গলায় বলে— যা জিজ্ঞাসা করছে উত্তর দিন।

আমি জানতাম না—

কি জানতেন না?

ও যে হঠাৎ এভাবে—

অসুস্থ নিশ্চয়ই হয়েছিল?

অসুস্থ হয়নি।

কিছু না কিছু বেগড়াফাই তো হবেই।

ওর কিছু হয়নি—

হয়নি? কি করে জানালেন?

রমা আবার শব্দ হারায়।

প্রেশার ছিল?

না।

সুগার?

না।

হাঁপানি?

না।

তবে মরল কিভাবে?

রমা আবার চুপ করে।

তবে বোধহয় মনের ওপর চাপ ছিল। আবার বলুন না মনের ওপর চাপ ছিল না?

ছিল।

কি স্বামী স্ত্রী মন কষাকষি।

রমা চুপ করে যায়।

বলুন, বলুন—

হঠাৎ মিঃ চক্রবর্তী উত্তেজির হয়ে তর্জনী দিয়ে খ্যাঁচ করে রমার হাতে খোঁচা মারে। রমা শূন্য দৃষ্টি মেলে চায়— না, আমাদের স্বামী স্ত্রীতে কোনও ঝগড়া ছিল না।

এক দম না?

না, আমাদের ঝগড়া হত না।

ডিউটি অফিসার এতক্ষণ দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল, এবার ফ্যা ফ্যা করে হাসে খানিকক্ষণ— স্বামী স্ত্রী যে বাড়িতে বাস করে, সে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে যদি ঘটি বাটি ছোঁড়ার আওয়াজ না পান তবে বুঝবেন সে বাড়িতে স্বামী স্ত্রী না, দ্যাবা দেবী থাকে।

তুতান হঠাৎ বলে বসে— ডেথ্ সার্টিফিকেটের ব্যাপারে কি করতে পারবেন, তাই বলুন না, কেন মিছিমিছি—

চুপ কর হে বদ ছোকরা। জামাইবাবুকে গিয়ে কি করেছ? মেরেছ না তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছ তার ঠিক্ কি? ডেথ্ সার্টিফিকেট দিল না কেন তবে ডাক্তাররা? ভাস্করের তরুণ রক্তও বোধহয় গরম হয়— ডেথ্ সার্টিফিকেট মরে যাওয়ার পর লিখলে তো আপনারাই হাজতে পোরেন—

শালা শূয়ার কা আউলাদ— ঝামেলা বাঁধিয়ে আবার ঝামেলা পাকাচ্ছ?

শুনুন মহিলাদেবী, আপনি যদি পুরুষ মানুষ হতেন তবে এখনই হাজতে পুরতাম। তবে নেহাত মেয়েছেলে তাই রক্ষা। চলুন, একশো চুয়াত্তর করতে হবে আমাদের। স্পট দেখতে হবে— মৃত্যুর কারণটা তো জানতে হবে? রওনা দিল দুজন অফিসার। একজন কনস্টেবল, ফটোগ্রাফার ও ডাক্তার।

মেডিকো লিগাল অ্যাঙ্গেল থেকে তো দেখতে হবে কেসটা।

একটা কালো ভ্যান মিঃ রায়ের গাড়ি অনুসরণ করল।

ভ্যান থেকে নেমে জুতোর মশ্ মশ্ শব্দ তুলে পুলিশরা উঠে গেল ওপরে।

রমা, সুজিত বাবু, তুতান, ভাস্কর উঠল পেছনে পেছনে।

মিঃ রায়, মিঃ চক্রবর্তী বলল— এবার তা হলে আমরা যাই?

না, না, আপনারা যাবেন কি?

সাক্ষী লাগবে না? ইনভেসটিগেটিং অফিসার বাধা দিল।

ডাক্তার এসেই এগিয়ে গেল বডির দিকে।

ইনভেসটিগেটিং অফিসার সশব্দে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ওর চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের চারধারে। ছোটন এখনও ঘুমোয় নি। ঘরে পুলিশ ঢুকতে দেখে ওর দুচোখ আতঙ্কে হিম হয়।

রমা বসু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। সুজাতা আর সোনালীও নিস্পন্দ।

ডাক্তার বলে— রিগর মর্টিস অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। কখন মারা গেছে?

বোধহয়—

বোধহয় মানে?

দেড়টা নাগাদ অসুস্থ হয়েছিল। প্রথম ডাক্তার তখনই এসেছিল। রমা যন্ত্রচালিতের মতো কথা বলে।

উনি কি এসে দেখেছিলেন ডেড?

কিছু বলেননি। শুধু বললেন হাসপাতালে পাঠান।

তার মানে সন্দেহ হয়েছিল কিছু ডাক্তারের। ডাক্তারের নাম ঠিকানা?

জানি না। সমর ডেকে এনেছিল।

পুলিশ অফিসার বলে— মিসিং লিঙ্কে ভর্তি কথা।

রিগার মর্টিস খুব আরলি হয়েছে। আর গায়ের চামড়ার রঙ দেখেছেন?

শুনুন তদন্তের বাধা সৃষ্টি করবেন না। বডির চামড়ার রঙটা সন্দেহজনক। তাছাড়া বডি যতক্ষণই থাকুক, রঙ ফ্যাকাশে হবে কিন্তু কালচে মারবে না। আর আরলি রিগার মর্টিসও পয়েজনিং কেসের এক নম্বর ক্লু।

নাক টেনে গন্ধ শোঁকে অফিসার। বডি ডিকম্পজিশনও শুরু হয়েছে এত তাড়াতাড়ি।। এতো তাড়াতড়ি হওয়ার কথা না। গন্ধটা কেমন যেন! দেখুন তো ডাক্তার কোন হ্যামারেজিক স্পট আছে নাকি। হ্যাঁ নাকের কাছে রক্তের স্পট। মুখের কাছে দাগ। মনে হয় গ্যাজলা বেরিয়েছিল। পয়েজনিংএর সাইন দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার বলে— মনে হয় পোস্ট মর্টমে পাঠাতে হবে।

পোস্ট মর্টমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পুলিশ অফিসার যেন একটু সহজ হয়, বলে— দেখুন বউদের ওপর আমাদের একটা জেনারেল সিমপ্যাথি থাকে। কিন্তু ডাক্তারই বলুন বা পুলিশই বলুন আমাদের বিজ্ঞান আর আইন দুটো মেনে চলতে হয়। সবার জন্য সমান আইন।

এরপর চলল পোস্ট মর্টমের প্রস্তুতি। একজিকিউ ম্যাজিসট্রেটের কাছে খবর গেল। রিপোর্ট তৈরি হল। সই করল পুলিশ অফিসার। মিঃ রায়, মিঃ চক্রবর্তী। পোস্ট মর্টমে পাঠান হল তাপস বসুর দেহ। আট চল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই তাপসের দুর্গন্ধময় মৃতুদেহ ফিরে পাওয়া গেল। রমা, সুজিত বাবু, তুতান, ভাস্কর মৃতদেহ সৎকার করে ফিরে এল বাড়ি।

ঢিমে তেতলায় সময় চলে রমা বসুর বাড়িতে। সুজিতবাবু আর তুতান রোজই একবার করে আসে। একদিনের মাথায় আসে মিঃ রায়, মিসেস রায়, মিঃ চক্রবর্তী আর অনুভা।

সত্যি পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা— অনুভা বলে।

মিঃ চক্রবর্তী বলে— অফেন্সটা কি কগ্‌নিজেবল? কগনিজেবল মানে উইদাউট ওয়ারেন্টই পুলিশ অ্যারস্ট করতে পারে। মনে হয় নন কগ্‌নিজেবল।

মিঃ রায় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে— কি যে বলেন? মার্ডার কগনিজেবল হবে না? তবে পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট অবধি পুলিশ অপেক্ষা করবে তো?

তবে কি ঘটনাটা— মিসেস রায় আঁতকে ওঠে।

আরে না না, আমি সাসপেকটেড বললাম।

কখনও আসে সুজাতা আর সোনালী— ভয় পাবেন না। মিছিমিছি একটা গোলমালে পড়ে গেলেন।

তবে— সুজাতা বলে— পোস্ট মর্টম রিপোর্ট যে কবে আসবে তার ঠিক নেই। শুনেছিলাম একজনকে নাকি অ্যারেস্ট করেছিল একবছর বাদে।

দূর দূর— সোনালী থামায় সুজাতাকে— ওটা অন্য ব্যাপার ছিল। অন্য কোনও ক্লু পেয়ে হয়ত নতুন করে ইনকোয়ারী শুরু হয়েছিল।

কি হবে?

মিঃ রায় বলে— ভ্যাগিস মেয়ে আপনি, তাই তখনই জেলে পোরেনি। তা না হলে পুলিশগুলোর তো আর কোনও বিবেক বুদ্ধি নেই।

মিঃ চক্রবর্তী বলে— সিল করা খামে আসে পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট। আর তাতে যদি সন্দেহজনক কিছু পায় তবে তখনই অ্যারেস্ট। কালো ভ্যান হঠাৎ এসে হাজির দোরগোড়ায়।

কেউ যদি কিছু না করে তবে ভয় কি? মিসেস চক্রবর্তী বলে— আপনি ভয় পাবেন না। আপনি তো আর কিছু করেন নি।

না, না, হয়ত হয়েছে ব্রেইন হ্যামারেজ। ওরা ধরে নিল খুন হয়েছে বোধহয়। তবে ইনোসেন্টেরও নিষ্কৃতি নেই।

যদি লেথাল কোনও ডোজ ওষুধের খেয়ে ফেলে যাবেন ভদ্রলোক। ওরা ভাববে পয়জনিং।

রমা বসু নির্বাক। ও ঘোরেফেরে। সামান্য কিছু রান্না করে। ছেলেকে ইস্কুল পাঠায়। লোকজন আসে, কথা বলে। নীরবে পুতুলের মত ঘোরে ও। মনে হয় ওর চোখে দৃষ্টি নেই, মুখে ভাষা নেই, মস্তিষ্কে নেই চিন্তাশক্তি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওর মস্তিষ্ক, দৃষ্টি, কান সব শুধু সংহত এক জায়গায়। পশ্চিমের জানলায় ও বার বার ঘুর দাঁড়ায়। ওখান থেকে দেখা যায় গলির মুখটা। ওইগলি দিয়েই নাকি ঢুকবে কালো ভ্যান। অপেক্ষা করে করে রমা যেন আর

পারে না। কবে আসবে ওই ভ্যান। পোস্ট মর্টমের রিপোর্টটা পেলেই ওরা আসবে। অনিশ্চয়তা, শুধু অনিশ্চয়তা যেন ভার হয়ে চেপে বসে আছে ওর স্নায়ুতন্ত্রীতে, রক্তস্রোতে, শরীরের আনাচে কানাচে।

হঠাৎ একদিন আসবে ওই কালো ভ্যান। হয়ত আজ, হয়ত কাল, হয়ত কোনও একদিন। সেদিন দুপুরে অলস চোখে চেয়েছিল রমা সেই জানলা দিয়ে। চোখে পড়ে গলির দিয়ে ঢুকছে একটা কালো ভ্যান। ও চমকে ওঠে। বুকের ভেতরে শুরু হয়ত ছলছলানি। কেমন যেন এক বাঁধনছেড়া উল্লাস ওকে মাতিয়ে দেয়। এসেছে তবে? এতদিনে কি শেষ হল অপেক্ষা? এসে কি গেছে পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট? জানা গেছে কি? ও ছুটে যায়। টান টান করে খুলে ফেলে সদর দরজা। চেয়ারে বসে থাকে চুপ চাপ। বুকের ভেতর ধুক্‌ধুক্ করে। খোলা দরজার সামনে বসে অপেক্ষা করে রমা। গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হল কি? জুতোর মশ্ মশ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? ওর কান টন্ টন্ করে। শরীর জুড়ে ব্যথা ব্যথা ভাব। শেষ পর্যন্ত জানা গেল ওর মৃত্যুর কারণ বোধহয়। পাওয়া গেল কি সার্টিফিকেট? ও কান খাড়া করে। রমা অপেক্ষা করে।

তাপস বাবু এক্সপায়ার্ড ডিউ টু—

লুণ্ঠন

দাদুকে ছেড়ে চলে আসার একদম ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আসতে হলো। ও বেশি পীড়াপীড়ি করেনি। একবার শুধু বলেছিল— থেকে যাই না আমি। কিন্তু ওরা একবার না বলতেই ও চুপ করে গেছে। দাদুর ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে একতলায়, তারপরে রাস্তায়। অসহ্য একটা রাগ হচ্ছিল, গাল দুটো আগুন আগুন, কান দিয়ে দমকে দমকে গরম হাওয়ার হল্কা ছিটছিল। দাঁতে দাঁত চেপে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ও বসেছিল জানলার ধারে। কাচ নামানো ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হু হু করে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া ওর চুলগুলোকে এক ঝাপটায় এদিকে আর এক ঝাপটায় ওদিকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। অসম্ভব বিরক্ত লাগছিল বুবলুর। কিন্তু জানলার কাচ ও উঠিয়ে দেয়নি। চোয়াল শক্ত করে বসেছিল। দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ও দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে ছিট্‌কিনিটা লাগিয়ে দিল। নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরে ঢুকেই ও টের পেলো গালের ওপর জ্বালা ধরিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। একফোঁটা, দুফোঁটা। দুটো চোখ যেন ফেটে পড়ছে যন্ত্রণায়। আস্তে আস্তে হেঁটে ও দাঁড়াল জানলার ধারে।

বাবুসোনা— কি হল? দরজা খোল্। খাবি না?

মার গলা। দু তিনবার সজোড়ে ঢোক গিলে আটকে দিল বুবলু ওর উদ্‌গত যন্ত্রণা। গলার স্বর কিঞ্চিৎ নামিয়ে বলল-- খাবার দাও, আসছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বুবলু খাবার টেবিলে এসে বসে। মুরগীর ঝোল আর ভাত। সামান্য স্যালাড্। চারটে চেয়ার চারধারে। বাড়ির সদস্য চারজনই। কিন্তু বসে ওরা তিনজন। ভাই টুবলু টলমল পায়ে সারা বাড়িতে ছুটে ছুটে খায়। ও এতক্ষণ জেগে থাকলে বাড়িটা এতো নিঝুম লাগতো না। এটা টেনে, ওটা ফেলে, নিজে আছাড় খেয়ে ও সারাদিন বাড়িটাকে শব্দময় রাখে। ও ঘুমলেই তাই চুপচাপ। অবশ্য টুবলুর বাবাও টুবলুর মতো প্রাণচঞ্চল, ছট্‌ফটে। কিন্তু আজ সারাবাড়িটা জুড়ে রয়েছে চিন্তার ঘেরাটোপ। সবাই দাদুকে নিয়ে চিন্তাগ্রস্থ।

আর একটু ভাত দাও বাবুকে— দীপক রীণাকে বলে।

খাবি আর একটু? রীণা ভাত তোলে একহাতা।

না, না — আর না।

মন খারাপ লাগছে বাবু? দীপক বাঁ হাতটা বাড়ায় বুবলুর দিকে।

না, না — বুবলু মাথা ঝোঁকায়।

দ্যাখ্, কালতো তোর ক্লাস টেস্ট আছে। সারারাত ও বাড়িতে থাকলে ঘুম হবে না। আর পড়াশোনাও হবে না। একেই তো যা যাচ্ছে কাল থেকে। নার্স আছে। আমিও তো খেয়েই আবার খাচ্ছি ওই বাড়িতে। চিন্তা কিরে?

বুবলু চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত দৃষ্টি বোলায় দীপকের দিকে। ওর ডান হাত প্লেটের ওপরই রয়ে গেছে।

সারারাত জাগতে হলে কষ্ট হবে না তোমার? রীণার গাঢ় স্বরের গুলতি ধাঁ করে মাথায় লাগে বুবলুর। এক ধাক্কায় প্লেটটা উল্টে দিতে হাত ওঠে ওর, শেষ মুহূর্তে আটকে ফেলে বেপরোয়া হাতটাকে। সামান্য নড়ে যায় শুধু প্লেটটা।

বাবাই কিন্তু ঠিকই বলেছে বাবু। তোমার এখন ছাত্রজীবন, পড়াশোনাটাই আসল। দ্যাখো, বাবাই এতো নজর দেয় বলেই তো কতো ভালো হয়ে উঠেছে তুমি এখন। এবার যখন ফাস্ট হলে কতো গর্ব হলো বলো তো বাবাইয়ের, আমার।

হ্যাঁ, কতো মিষ্টি আনলো দাদাবাবু, কতো খাওয়া—

রীণা চমকে ওঠে। ম!লা যে ওখানেই আছে ওর একদম খেয়াল ছিল না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর কথা না। খাওয়া শেষ করে ওঠো সবাই।

কোনো রকমে খাওয়া শেষ করে ওঠে দীপক।

বেরোবার আগে বুবলুর ঘরে ঢোকে ও। বুবলু ওর বইয়ের তাকে একটা গল্পের বই খুঁজছিল।

বাবু—

বুবলু ঘুরে দাঁড়ায়।

ভালো করে পড় বাবা। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠিস্। জানিস তো বড় হতে হলে পড়তে হয়। অনেক জানতে হয়।

নিজের পায়ে দাঁড়াবি তুই। তাই না?

বুবলু একটা চেয়ারের পেছনে হাত রেখে দাঁড়ায়।

কি রে? কিছু বল।

বুবলু হাসে। ওর শরীরে প্রতিটি রোমকূপ রি রি করে। গল্পের বই পড়তে আর ভালো লাগে না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে বুবলু। কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ওকে। পড়াশোনার প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করে ও। অথচ ছোটবেলায় ও যখন দাদুর বাড়িতে থাকতো, একদম পড়তে ভালো লাগতো না। সারাদিন দাদুর স! লুকোচুরি খেলা, দাদুর হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাওয়া, একসঙ্গে খাওয়া, ঘুমলে দাদুর গায়ে জল ঢেলে দেওয়াতেই ছিল ওর একমাত্র আনন্দ। এখনও ভাবলে ওর মন ভেসে যায় অতীতে। বেদনার মাধুর্যে মন ভরে ওঠে। কিন্তু এখনকার বুবলু আর ছেলেমানুষ নেই, তাই ও সব ছেলেমানুষী ওর ছেলেবেলার স্মৃতিতেই আটকে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ওর পড়াশোনার প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁক হয়েছে। আঁকড়ে ধরেছে ও যেন একটা অবলম্বন। ওকে পড়াশোনায় ভালো হতেই হবে, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। স্বাবলম্বী হতেই হবে।

সবাই আমাকে জব্দ করতে চায়। অনেক বড় হয়ে, একটা বিরাট কিছু হয়ে একদিন সবাইকে জব্দ করবো— কিশোর বুবলুর নরম শরীরটা আস্তে আস্তে দৃঢ় হয়ে উঠছে।

এই ঘরটা ওর নিজস্ব। অনেকদিন হলো ও একা থাকছে। একা থাকতে ভালো লাগে ওর। একা একা বই পড়ে। ছবি আঁকে। গল্পের বইও পড়ে গাদা গাদা। অজস্র বই আছে ওর আলমারীতে। একাকীত্ব তাই ওর নিঃসঙ্গতায় কাটে না। নিজস্ব এই জগতটার সঙ্গে মিলে মিশে কেটে যায় ওর সময়। একটা সুন্দর ছবি এঁকে মনটা বেশ ভালো লাগে। চকচকে মলাটে ভরা বই পড়ে স্বাদু লাগে।

সাধারণত এরকমই ঘটে। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে ওর কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে। খালি যেন মনে হয় কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা দেখবে ও, কিছু একটা শুনবে। আর এই অস্বস্তিবোধটা যখন গভীর হয়, তখনই একটা ত্রাস জড় হয় মনে। হিম হিম লাগে বুকের মধ্যে। দাদুর বাড়িতে শেষ কয়েকটা দিনে এই ভয়টা ওর মনে গেঁথে বসেছে। বিরাট বাড়িতে ওরা তিনজন। পাড়ার একটা স্কুলে পড়তো ও। মা তখন কিছুদিন ধরে অফিসে যাচ্ছিল। স্কুল থেকে ফিরে স্নান খাওয়া সারতো ও ওই বাড়ির বহু পুরনো লোক শক্তিনাথের কাছে। ওর দুষ্টুমীতে অস্থির হয়ে ওকে বকতো খুব। তবে ভালোও বাসতো।

অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল বুবলুর। ঘুম জড়ানো চোখের ভারী পাতাদুটো টেনে খুলে তাকাল। অ্যালার্ম বাজছে এখন সকাল...আলো কই? অন্ধকার-- এখন ঘুমবো... আর একটু... দাদুর শরীর খারাপ... কটা বাজে, স্কুল আছে? হু... ক্লাস টেস্ট... টেস্ট—

একলাফে উঠে পড়ে বুবলু। দরজা খোলে। বাথরুমে যায়। ব্রাশ করে চোখ বন্ধ করেই, মুখ ধোয়, চোখে জল দেয়। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে বসে। মা রাত্রিতে ফ্লাস্কে দুধের মধ্যে কফি মিশিয়ে রেখে দেয় রোজ। বিস্কুটের একটা টিনও থাকে পাশে। ফ্লাস্কের ঢাকনাতে কফি ঢেলে চুমুক দেয়। আহা আর কোনও ক্লান্তি নেই। আজ স্কুল থেকে সোজা দাদুর বাড়ি যাবো। পরশু থেকে কাল দাদুর অবস্থাটা ভালো ছিল, আজ নিশ্চয়ই আরো ভালো দেখব। দাদু ভালো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই হবে।

ভীষণ একটা পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বই টেনে নেয় বুবলু।

কফি খেয়েছিস বাবু? ঠাণ্ডা হয়নি তো?

মার গলার আওয়াজে ও বই থেকে মুখ তোলে-- না ঠিকই ছিল।

ঠিক সোয়া ছটায় দীপক আসে। কলিং বেলের আওয়াজ হতেই বুবলু কান সজাগ রাখে।

পড়তে বসে গেছিস? কিছু দেখাতে হবে?

এখন পড়ছি। স্নান করে এসে দুটো রাইডার একটু দেখিয়ে দিও।

এক কাপ চা খেয়েই দীপক বাথরুমে যায়। এই সময়টা ভীষণ তাড়াহুড়ো। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। মঙ্গলাদি ভাইয়ের দুধ তৈরি করছে। ভাই ফিডিং বোতল হাতে ধরে শুয়ে শুয়ে দুধ

খায়। দুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ আর তারপরই শুরু হয় ওর অভিযান। প্রথমেই দাদার ঘরে। দাদার টেবিলের প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর ওর বড় লোভ। দোয়াত, পেন, বই, পেনস্ট্যান্ড, পেপার ওয়েট পেন্সিলকাটার ছুরি। পড়তে পড়তেই বুবলু ভাইয়ের সে! জিনিসপত্র চালাচালি করতে মজা পায়। কিন্তু এ ব্যাপারে মা খুব সজাগ। রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে— যাও, শিগ্‌গির যাও এ ঘর থেকে। দাদাকে একদম বিরক্ত করবে না। ওর পড়াশুনো নেই?

আমিও পলা কর্‌বো— ভাই নাছোড়বান্দা।

থাক না ও, আমার অসুবিধে হবে না। বুবলু ভাইয়ের দিকে একটা লোভনীয় জিনিস বাড়িয়ে দেয়।

না, না। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বোস। ম!লা, ওকে ধর তুমি।

সকালবেলটা বড় সুন্দর ওদের বাড়িতে। বুবলু পড়ে ওর ঘরে। রীণা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকলেও ওর চোখ থাকে বুবলুর দিকে। ভাইয়ের দুষ্টমী চলে। দীপক স্নান সেরে বুবলুর ঘরে আসে। কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার থাকলে বোঝায়। আধঘন্টা মতো সময় থাকে ওর। এই সময়টা ও বুবলুর ঘরেই থাকে।

সারা বাড়িতে মুঠো মুঠো আলো ছড়ানো। তেরছা, গোল, চৌকা বা একঢাল। পরিশ্রমে মার মুখ লালচে। আঁচল দিয়ে বার বার মুখ মোছে মা। তাই মুখে কোন রঙের দাগ থাকে না। মাকে ভীষণ মা মা লাগে। সাড়ে আটটার সময় দীপক বেরিয়ে যায়। ওর ব্রেকফাস্ট রীণা বুবলুর ঘরেই দিয়ে যায়। দীপক চলে যাওয়ার পরই আবার বুবলুর স্কুলে যাওয়ার তাড়া। ও ঠিক নটায় স্নানে যায়। বই গুছিয়ে ও ওঠে। সময় একটু হাতে নিয়েই ও স্নান করে। একটা লাল বড় ড্রামে জল ভরা থাকে। লোডশেডিং হয় বলেই জল ভরে রাখার ব্যবস্থা করেছে রীণা। ঝাপড়ি দেওয়া জানলা দিয়ে সকালের সোনালী রোদ ড্রামের জলে দোল খায়। আলো আর জলের হুটোপুটি খেলার প্রতিফলন হয় সাদা দেওয়ালে। তিরতির করে কাঁপে। কতো বিচিত্র নক্সা, আলপনা ফুটে ওঠে, ভেঙে ভেঙে পড়ে, আবার টুক্ করে ভাসে। বুবলু নিবিষ্ট মনে দেখে। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে ড্রামের জলটা ঘেঁটে দেয়। বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের দলের মতো ছবিটা আলোড়িত হয়।

আজ অবশ্য সকালটা এতো ঝরঝরে ছিল না। দাদুর অসুখ। মাথা ঘুরে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল দাদু। ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছে ডাক্তার। কপালে তিনটে ষ্টিচ পড়েছে। প্রেশার হাই। তাই সংসার চলছে ঠিকই, কিন্তু সাবধানে, পা টিপে টিপে। বেলা কিছুটা বাড়ার পর থেকেই বুবলুর মনটা আবার একটু একটু খারাপ লাগছে। বাড়িতে আজ সবাই ভীষণ শান্ত। রীণা ছোট ছেলেকে বকছে না। দীপক চুপচাপ অফিসে বেরিয়ে গেছে। মঙ্গলাদি ভাইকে চুপ করাতে হলেই বলছে— ও বাড়ির দাদুর অসুখ না? দুষ্টুমী করে না আজ।

দাদু সিরিয়স। ভালো নাও হতে পারে। দাদু মরে যেতে পারে। বুবলুর মনটা তলিয়ে যেতে থাকে।

স্কুল থেকে সোজা দাদুর বাড়ি এলো বুবলু। সোজা রাস্তা। প্রথমে তিনটে স্টপেজ পর দাদুর বাড়ি, আর দাদুর বাড়ির পর গোটা পাঁচেক স্টপেজ পর বাড়ি। অনেকদিন ধরেই ও একা একাই এই পথে যাতায়াত করছে।

দাদু। কেমন আছো দাদু তুমি? দাদুর বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে এক ঝলক চোখের জল উপচে পড়ে। দু হাতে মুছে ফেলে ও চোখ। কিন্তু জল যে বেরিয়েই পড়ছে আজ। বিপন্ন বুবলু দুচোখ আবার মোছে। শক্তিকাকু, দাদু? বাড়িতে ঢোকার মুখেই শক্তিনাথের সঙ্গে দেখা।

ভালো আছে। ডাক্তারবাবু ঘুমের সুঁই লাগিয়েছে। ভ্যাগিস্ চোখে কম দেখে শক্তিকাকু।

হাতমুখ ধুয়ে এসো খোকন, খাবার দিই। বৌদি খাবার করে রেখে গেছে। সন্ধ্যায় আসবে।

দাও খেতে দাও, আমি দাদুকে দেখে আমি একবার। শক্তিকাকুর হাতে স্কুলের ব্যাগটা দিয়ে ও দাদুর ঘরে ঢোকে। বিরাট বড় খাট, উঁচু। দাদুর মাথার কাছে নার্স বসে আছে। একটা খাতায় কি লিখছে। বুবলুর দিকে চোখ পড়তেই বলে—

আস্তে, উনি ঘুমচ্ছেন।

মেজাজটা খিচড়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরের এককোণে রাখা গদি আঁটা একটা সোফায় বসে। সোফা সেটের লম্বা সোফাটা এ ঘরের এককোণে রাখা। স্প্রিং বেরিয়ে গেছে। তাই একটা বড় বেডকভার দিয়ে ঢাকা। ঘরের মাঝখানে দাদুর খাট। খাটের ওপাশে বড় একটা জানলা আছে। কিন্তু জানলাটা চিরকাল বন্ধ। অন্তত বুবলু ওটাকে খোলা দেখেনি কখনও। দেয়াল জুড়ে কয়েকটা ট্রাঙ্ক একটার পর একটা রাখা। ট্রাঙ্কগুলো গা ঘেঁষে একটা লোহার সিন্দুক। ওগুলোই বুবলুর দাদুর স্মৃতিভান্ডার। বুবলু জানে নিচের ওই সবচেয়ে বড় ট্রাঙ্কটা দাদুর মার ট্রাঙ্ক। ওর মধ্যে জড়ি দেওয়া লাল, সোনালী, নীল, হলুদ শাড়ী আছে। দাদুর মার পানের ডিবে, রূপোয় বাঁধানো চিরুনী, সিদূরের কৌটা সব যত্ন করে রাখা। দাদুর মার একটা খুব সুন্দর সোনার প্রজাপতি আছে। ওটা রাখা আছে সিন্দুকে। দাদু যখন সিন্দুকটা খোলে, বুবলু তখন সিন্দুকের ঠাণ্ডা পাল্লায় গাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরটা অন্ধকার। দাদু একটা করে বার করে, দেখে, ঢুকিয়ে রাখে।

বুবলু হাত দেয় না, শুধু তাকিয়ে থাকে। ট্রাঙ্কের মধ্যে শাড়ীগুলো সাদা কাপড়ে মুছে রেখেছে দাদু। প্রত্যেক মাসে এক রোববার দাদু দাদুর মায়ের ট্রাঙ্কটা ছাড়াও তিনটে ট্রাঙ্ক থেকে সব নামিয়ে রোদে দেয়। বুবলু এ বাড়িতে আসে প্রত্যেক রোববার সকালের পড়া শেষ করে, ও সাহায্য করে দাদুকে। জিনিসগুলো দু হাতের মধ্যে পরম যত্নে, আলতো করে ধরে নামায় দাদু। দুহাত দিয়ে আস্তে আস্তে ধূলো ঝাড়ে। এই সময় বুবলুর চোখের অবাধ্য জল গাল বেয়ে পড়ে। ওর চোখে তখন ভেসে উঠবেই সেই দিনের দৃশ্যটা, যখন দাদু ওর মুখে বুকে এইভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সেই দিনটা যেদিনে ও এ বাড়ি থেকে স্কুল গেল কিন্তু আর ফিরে এলো না।

দাদুর মা, দাদুর বাবা, দাদুর বউ আর দাদুর ছেলের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলো দাদু রেখে দিয়েছে আলাদা আলাদা চারটে ট্রাঙ্কে। দাদু বুবলুকে বলতো— দাদুভাই, আমি মরে গেলে, আমার জন্য একটা আলাদা ট্রাঙ্ক রাখবি তো?

বুবলুর বুকটা গুড়িয়ে যায় কষ্টে। গলাবন্ধ হয়ে টন্‌টন্‌ করে। কানের নিচের রগগুলো দপদপ করে চলে। প্রচণ্ড একটা জমাট যন্ত্রণা ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। ও চেপে রাখে, প্রাণপনে চেপে রাখে। দাদু, ভালো হও তুমি তাড়াতাড়ি। তোমাকে আমি সব বলবো। তোমার অসুখের সময় কি রকম ভয় পেয়েছিলাম আমি তোমাকে বলব।

দাদু জানো, যেই শুনলাম যে তুমি পড়ে গেছ... খোকন— এসো, খেতে দিয়েছি। কল্পনার জাল ছিঁড়ে যায়। দরজায় শক্তিকাকু দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকার নেমেছে। সব কিছু আবছা আবছা, দাদু শুয়ে আছে, নিস্পন্দ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, ঢক্‌ঢক্‌। ঘরের দৃশ্যটা কেমন যেন আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা। দুহাতের পিঠ দিয়ে চোখদুটো মুছে নেয় বুবলু।

রীণার আসতে আসতে সাতটা বাজলো। টুবলু ম!লার কাছে বেশ থাকে। ওর যখন মাসতিনেক বয়স তখন ম!লাকে পেয়ে গেছে রীণা। আর তারপর থেকে টুবলুকে ওই দেখে। রীণা বোধহয় দাদুর জন্য কিছু ফলটল কিনে এনেছে। ওর হাতে পলিথিনের ব্যাগ একটা।

খেয়েছিলি? রীণা ঢুকেই বুবলুকে বলে। বৈঠকখানায় বইপত্র খুলে বসেছিল বুবলু। বিরাট বড় ঘর। সিলিং অনেক উঁচুতে। অনেক পুরনো একটা কার্পেট পাতা। বড় বড় জানলা, দরজা। দেওয়াল জুড়ে বড় বড় ছবি। দাদুর দাদু, দাদুর ঠাকুমা, দাদুর বাবা, দাদুর মা, দাদুর বউ। দাদুর ছেলের কোনো ছবি নেই। শক্তিকাকুকে একবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল বুবলু। শক্তিকাকু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল— কাঁচা বয়সে চলে গেল দাদাবাবু। বৌমার কষ্ট হবে তাই বাবু রাখেনি। ছোট হলেও বুবলু বুঝতো এ প্রসঙ্গটা বড় কষ্টের, বড় স্পর্শকাতর। আর কেমন যেন গোপনীয়— লুকিয়ে রাখা বেদনা, গিলে ফেলা শোক। ছেলেমানুষ বুবলু যখন কঠিন এক কষ্টানুভূতিতে ফালা ফালা হতো তখন ও নিজেকে পিষে ফেলতো কিন্তু একবিন্দু কষ্টকে প্রকাশ করতো না। কৈশোরে পা দেওয়া বুবলু আরও স্পষ্ট বোঝে কোনো কোনো ছবি দেওয়ালে টা!তে নেই, কোনো কোনো দুঃখ আড়ালে রাখতে হয়। তা না হলে নিজেরই লজ্জা, নিজেই জব্দ হওয়া।

আজকের রুটিনের বইছাড়া কালকের রুটিনেরও দুএকটা বই নিয়ে এসেছে বুবলু বুদ্ধি করে। দাদুর বাড়িতে ওর দুএকটা খাতা থাকে, তাতেই লিখছে টুকটাক। বৈঠকখানার মাঝখান থেকে ওপরে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়িটা কাঠের। তাই যে যতবার আসছে, যাচ্ছে, শব্দ হচ্ছে। রীণা ওপরে চলে গেছে। দাদুর শোবার ঘর ওপরে। সিঁড়ির ডানদিকে দাদুর ঘর, বাঁদিকের ঘরটা ওদের ছিল। এখন যখন ও মাঝে মাঝে এ বাড়িতে থাকে তখন ও দাদুর ঘরেই শোয়। দাদুর পাশে।

দীপক এলো সাড়ে সাতটা নাগাদ। রোজ সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে দীপক খুব উচ্ছল থাকে। হাসিখুশি। আজ গম্ভীর মনে হলো। বললো— মা কোথায়? ওপরে?

বুবলু ঘাড় নাড়তেই ও ওপরে উঠে গেলো।

কি ব্যাপার? কি হলো? হঠাৎ বুবলুর কেমন যেন ভয় করতে শুরু করলো। আর ভয় শুরু হলেই ওর ভেতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। কান্না পেতে থাকে। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সামনের বইয়ের একবিন্দুও মাথায় ঢোকে না। ও স্থির হয়ে বসে থাকে। বেশিক্ষণ না, মিনিট তিন চারেক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখে রীণা আর দীপক নামছে নিচে, দীপক বেশ ব্যস্ত। কি বলছ? রীণার স্বর উদ্‌বিগ্ন।

ডাক্তারের চেম্বার হয়ে আসছি। উনি বললেন ওপর থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওষুধেও ভালো রেসপন্ড করছেন। শুধু একটা ব্রেইন স্ক্যানিং করা দরকার। দীপকের স্বর তখন গম্ভীর।

স্ক্যানিং মানে? রীণা উদ্বেল।

মানে আর কি ব্রেইনের এক্সরে বলতে পারো— মানে। ব্রেইনের ছবি নিয়ে বুঝবে, মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝবে ব্রেইনে কোনো ইনজুরি বা কোনো অসুবিধে— ডাক্তারের কাছে শোনা কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করে দীপক।

ভয়ের কিছু নেই তো? রীণা জানতে চায়।

আরে না না— ভয় কিসের? দীপকের জমাট স্বর তরল হয় কিছুটা।

যে ভয়টা বুবলুর বুকে দানা বেঁধে উঠছিল, কেটে যায়। হাল্কা লাগে ওর।

ডাক্তার কি বললো? ভয়ের কিছু? খোলামেলা গলায় প্রশ্ন করে বুবলু।

না সানি না। কোনোও ভয় নেই। দীপক যেন এতক্ষণে বুবলুর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়। বুবলুর পাশে এসে বসে।

রীণা, এবার চা খাওয়াও, এক কাপ।

রীণা চলে যেতে যেতে বলে— শুধু চা? আর কিছু খাবে?

না— কিছু না, শুধু নির্ভেজাল এককাপ সুস্বাদু গরম পানীয়।

রীণা হাসে। দীপকের কথায় বুবলুর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

সকালে রাইডারটা বুঝেছিলি? দীপক বুবলুর বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো তো, এই জায়গাটা ঠিক বুঝছি না।

দীপক ও বুবলু পাশাপাশি বসে তন্ময় হয়ে যায় বইয়ের জগতে।

দীপক ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র ছিল। এখনও স্কুলের বই দেখলে মনটা নিসপিশ করে।

ওপরের ঘরে দাদু অসুস্থ। যথেষ্ট সিরিয়স, অথচ বুবলুর আজ সন্ধ্যেটা কেমন কেটে যাচ্ছে, তরতর করে। সামান্য সময়ের জন্য একটা ভয়ের ঢেউ খেলেছিল বটে বুকে। কিন্তু সেটা সাময়িক, আর ভয়টাও অন্য জাতের। দাদুর জন্যই ভয়ে কেঁপে উঠেছিল ও।

রীণা, দীপক এ বাড়িতে, দাদুকে নিয়ে চিন্তিত, দাদুর অসুখ, দাদুর ডাক্তার। রীণা আর দীপক শুধু বুবলুর দাদুর জন্য ভাবছে। দীপক বলছে না রীণা, আর কতো কাজ করবে? এবার এসে বসো না আমার কাছে। রীণা স্নান সেরে হলুদ, সবুজ বা নীল রঙের শাড়ি পরে, কপালে সিঁদুরের টিপ এঁকে স্বামীর পাশে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে না, কথা বলছে না মৃদুস্বরে, অথবা স্বামী স্ত্রী টুবলুর দুষ্টুমীর আলোচনাও করছে না প্রশয়ের গলায়, গর্ব্বের সুরে। এখানের ছবির বর্ণ আলাদা। সাদামাটা মা, দাদুর চিন্তায় মগ্ন দীপক, বুবলুর মনটাকে ভরিয়ে তোলে।

রোজ যখন পশ্চিমের আকাশ লাল করে সূর্য ডুবতে থাকে, পৃথিবীর মতো বুবলুর মনও যেন ধীরে ধীরে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে। একটা আতঙ্ক ওর মনকে ছেয়ে ফেলে। মাস্টার মশাই আসেন সপ্তাহে চারদিন। ও ওর ঘরে পড়ে। ও ভালো ছাত্র। ও মন দিয়ে পড়া বুঝে নেয়, কিন্তু একটা মন কেমন করা কষ্ট অবিরত ওর বুকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। ও টের পায়। দীপক আর রীণা ডুবে আছে ওদের সংসারে। ও একা, পৃথিবীতে একা। মাস্টারমশাইর অলক্ষ্যেই ও আঙ্গুলে গুনে দেখে রোববার আর কত দেরি। ও কবে যাবে দাদুর কাছে। দীপক, রীণা আর টুবলুর ওই অন্তরঙ্গ রূপ পড়তে পড়তে ওর কল্পনায় ঝিলিক দেয়। অনেক সময় মাস্টারমশাইর কাছে অন্যমনস্কতার জন্য বকুনীও খেতে হয়। প্রতি সন্ধ্যেয় একবার মাস্টারমশাই এলেও বা না এলেও, ও একবার বাথরুমে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে ও একবার ওদের দেখে। নিজেকে আরো কষ্ট দিতে মন চায় ওর। দেখি, দেখি, ও আর ভাবতে পারে না। বাথরুমে ঢুকেই ছিটকে কান্না বেরিয়ে আসে গলা থেকে। আলো জ্বালায়। ও আর জলের ছায়া দেখে না ছাদে। ইলেকট্রিকের আলোতে জলের ছায়া দেখা যায় না। আর বুবলু তখন দিন শুরুর বুবলু না, ও দিনশেষের বুবলু। আত্মমুখী, বিধ্বস্ত।

সন্ধ্যোটা কেটে গিয়ে যেই রাত্রি হয় তখন বুবলু আবার নিজেকে সামলে নেয়। ও মন দিয়ে পড়ে। দীপক খবরের কাগজটা নিয়ে এসে বসে বুবলুর ঘরে। বুবলুকে পড়া বুঝিয়ে দেয়। রীণা ব্যস্ত থাকে রান্নাঘরে, সংসারের কাজে।

রোজ সন্ধ্যেবেলটা কাটে এভাবে। কিন্তু আজ একটা ব্যতিক্রমী সন্ধ্যে কাটিয়ে রাত প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি ফিরলো ওরা। দাদু সাড়ে আটটা নাগাদ জেগেছিল কিছুক্ষণের জন্য। নার্সের হাত থেকে হরলিক্সটা নিয়ে মাই খাইয়ে দিল দাদুকে। দীপক যখন দাদুর হাতে হাত রেখে ভরা গলায় বলে শরীর কেমন? দাদুর দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ভাঙাগলায় বলে— ভালো।

দাদুকে ভালো হতেই হবে, তা না হলে বুবলু বাঁচবে কিভাবে। ওর মনের সব কথা, বেদনার টুকরো টুকরো কি নিদারুণ কষ্টে, কি অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় বুবলুর রাতদিন কাটে। সামান্য দু একটা কথা শুধু দাদুকে বলতে হতো, দাদু ঠিক বুঝতে পারতো। কারুর কাছে বুবলুর মনের ক্ষতবিক্ষত চেহারাটাকে উন্মোচিত করতে পারে না, ও তাই ঢেকে রাখে, আপ্রাণ চেষ্টায় গুটিয়ে রাখে নিজেকে। ওর মূক বেদনার ভাষা শুধু দাদু বোঝে। দাদু ধীরে ধীরে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। কিছু বলে না।

প্রথমদিকে ওর যখন খুব দুঃখ হতো, বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হতো, ও কেঁদে ফেলতো, রাগ করতো, কঁকিয়ে উঠতো কষ্টে। কিন্তু ও দেখেছে ওর এই বুক ছেঁড়া যন্ত্রণা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। বিশেষ করে মা ওর বেইমানীতে ক্ষুদ্ধ হয়েছে, ওর অকৃতজ্ঞতায় লজ্জিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। বুবলু এখন বড় হয়েছে, ও বুঝতে পারে দীপক খুব ভালো। উদার, অনাবিল। বুবলুকে খুব ভালবাসে। ও এতো ভালো বলেই বুবলুকে দিন কাটাতে হয় অনুচ্চারিত বেদনায়। দীপক কি অত্যাচার করে? মারে? টুবলুর সং! পার্থক্য করে? বুবলুর সং! ওর সম্পর্ক কি ঠাণ্ডা? না না না। বুবলু মনে মনে মাথা ঝাঁকায়। কিন্তু দুঃখ মাপার বাটখারার কি শুধু এগুলো?

ছোটর থেকে বড় হতে হতে বুবলু ভীষণ মুখচোরা হয়ে গেল। দাদু বলে তুই একরকম হয়েছিস। কার সঙ্গে একরকম অবশ্য বলে না। বলে একরকম। বুবলুর বুকটা স্ফীত হয় গর্বে। আমরা একরকম। আমি আর বাবা। বাবা আর আমি। বুবলুর বাবা, দাদুর ছেলে শান্তনুও খুব শান্ত ছিল। ফর্সা লম্বা, ছিপছিপে গড়ন। পাতলা দুটো ঠোঁট আর গভীর একজোড়া চোখ। বুবলু চোখ বন্ধ করে এখনও দেখতে পায় বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দুটো চোখ। বড় বড় চোখের পাতাদুটো যেন ছায়া ফেলত। বিশাল এক ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। দুর্বার এক আকাঙ্খা প্রায়ই বুবলুকে তাড়িয়ে বেরায়। আহা! যদি এমন হতো, যদি সেই বিরাট আশ্রয় আমি না হারাতাম। ছোটবেলার সেই বুবলুকে দেখে ও, বাবার চওড়া বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। বাবার গলা জড়িয়ে আছে। সেই ছোট বুবলু কিশোর বুবলুর বুকে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বুবলু অস্থির হয়ে পড়ে। দাদু বলে, দাদুভাই তোমার চোখদুটো একরকম। সেইরকম কালো, সেইরকম জ্বলজ্বলে।

দাদুর প্রত্যেকটি কথা, দাদুর বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাপত্র, ওই বাড়ির দেওয়াল, জানলা, দরজা বুবলুর বুকে অবিরত ঢেউ তোলে। ভীষণ আপন লাগে। অন্তরের অন্তঃস্থলের সং! যেন যোগ রয়েছে হাজার হাজার তন্ত্রীতে। তাই সবসময় টান পড়ে, বুকটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যায়।

ও বাড়ি থেকে চলে আসার আগে থেকে ও টের পাচ্ছিল, কিছু একটা হবে, বিপর্যয় ঘটবে কিছু। একটা ভয় চেপে বসেছিল ওর মনে। দাদুর সং! মার কথা হত নিভৃতে। দাদু চুপ করে বসে থাকতো। মা কথা বলতো, কাঁদতো। একদিন রাত্রিবেলা ও জেগে উঠেছিল স্বপ্ন দেখে। মাকে পাশে না দেখে ছুটে গেছিল ডানদিকে দাদুর ঘরে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেখেছিল মা দাদুর পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে চলেছে। দাদু শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। পর্দার আড়ালে বুবলুর বড় বড় দুটো চোখ বিস্ময়ে আতঙ্ক বিস্ফারিত হয়ে গেছিল। ও বুঝতে পেরেছিল আর একটা বিচ্ছেদ হবে। বাবার মতো আর কেউ হারিয়ে যাবে সারাজীবনের মতো। কয়েকদিন পর রীণা দীপককে নিয়ে এলো বাড়িতে। দীপক দাদুকে প্রণাম করে বসলো। বুবলুকেও ডাকলো রীণা। বুবলু এলো ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। দীপক ওর হাতে একটা ক্যাডবেরী গুঁজে দিল, ওর শক্ত শরীরটাকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করলো দু একবার। বুবলু নড়ল না। দাদু বসে রইল, নির্বাক। বুবলু দাঁড়িয়ে রইল, অনড়। দীপক এককাপ চা খেলো শুধু। চলো গেলো মিনিট কুড়ি পরে। সেদিনই বুবলু বুঝেছিল ষড়যন্ত্র শুরু

হয়েছে। ওর একটা কিছু কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। গুমড়ানো এক পরিবেশ চেপে বসেছিল বাড়িতে। মা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল একদিন। রাতের অন্ধকারে বুবলুর সারা শরীর জমে গেছিল এক তীক্ষ্ণ ত্রাসে। ধর বাবা যদি আবার ফিরে আসে, মা কোনোরকমে এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলেছিল। ছোট বুবল জানতো মরে গেলে কেউ ফিরে আসে না। চরম দুর্দিনটা এলো শেষ পর্যন্ত। মা চলে গেলো সকালে। আগের দিন রাত্রিবেলাই মা সুটকেস গুছিয়েছে, বুবলুর জিনিস নিয়েছে, নিজের জিনিস নিয়েছে। বুবলুকে তখনই আস্তে আস্তে বলছিল মা, কালকে আমরা নতুন বাড়িতে যাবো বুবলু। তুমি ধরে নাও তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই শেষ পর্যন্ত আমি— মার কথা আটকে গেছিল। সেদিন থেকেই বুবলু খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। সবার প্রত্যেকটা কথা। প্রতিটি শব্দ মনে রাখে। সকালবেলা দাদু ঘরে শুয়েছিল। ও যখন স্কুলে যায়, দাদু উঠে এসে ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর বুকে পিঠে বৃদ্ধর দুর্বল হাত দুটো অসহায়ভাবে ঘোরাফেরা করে। দাদু যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যায়। কোনো কথা বলতে পারেনা।

আগেই ঠিক করা ছিল। তখন বুবলু ব্যবস্থার পাকাপোক্ত চালটা বোঝেনি। আজ বোঝে সব। ওকে স্কুল থেকে আনার জন্য ওর মামা মামী স্কুলে যায়। বুবলু, চল তোমার নতুন বাড়িতে। মামী ওর মাথায় হাত রেখেছিল। ট্যাক্সিতে মাঝখানে ও, মামা মামী দুপাশে। অজানা ভয়ের উত্তেজনায় যেন ওর বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। শরীর মুচড়ে মুচড়ে এক যন্ত্রণাদায়ক ভয় ওকে গিলে ফেলছিল। ওর হাত পা ঘামে ভিজে উঠছিল। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়ার মতোও জল ছিল না মুখে। মুখের ভেতরটা তখন খটখটে। মামা মামী ওকে প্রায় ঠেলেই নিয়ে গেলো একটা বাড়িতে। দোতলায় একটা ঘরে। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক। মামাবাড়ীর কেউ কেউ, আর অন্য লোকগুলোকে ও চেনে না। সবাই হাসছে, কথা বলছে। ও ঘরে ঢোকে। সব দৃষ্টিগুলো ঘুরে যায় ওর দিকে। ঘোর লাগা দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢোকে বুবলু। হঠাৎ চোখ পড়ে ঘরের কোণে।

কে—এ—এ? বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে থাকে বুবলু। সারা মাথায় সিঁদূর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা। এক নিষ্ঠুর হাতের চাবুক শপাং করে ওর পিঠটাকে দুফালা করে দেয়। নিরাশ্রয়, অবলম্বনহীন, পিতৃহারা ছেলেটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একটা আশ্রয়ের খোঁজে সামনে ছুটে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে মাকে। হু হু করে কান্নায় ও ভেঙে পড়ে। বাহ্যজ্ঞানরহিত বুবলু কান্নার প্রাবল্যে ভেসে যেতে থাকে, গুড়িয়ে যেতে থাকে।

দাদু আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছে। এখন উঠে বসে খায়। কথাবার্তা বলে। তবে বিছানা ছেড়ে উঠবার অনুমতি এখনো দেয়নি ডাক্তার। স্ক্যানিং রিপোর্ট ভালো। অ্যাম্বুলেন্স করে দীপক আর নার্স দাদুকে নিয়ে গিয়ে দিন পনেরো আগে স্ক্যানিং করে নিয়ে এসেছে। বুবলু শুনেছিল বুকিং নাকি খুব সমস্যা, ডেট পাওয়া যায় না। কাকে যেন ধরে দীপক ডেটটা তাড়াতাড়ি করিয়ে নিয়েছিল।

ইংজেকশন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন শুধু ওষুধ। দিনের বেলার নার্স ছাড়িয়ে এখন আয়া রেখেছে একটা। শুধু রাতে নার্স আছে। রীণা থাকে সারা দুপুর। আর শক্তিনাথ তো আছেই।

সন্ধ্যেবেলা রীণা আর যায় না। বুবলুকেও আর সন্ধ্যেবেলা থাকতে দেয় না দীপক। ও শুধু বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফেরার পথে নামে। দাদুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে বাড়ি ফিরে আসে। মা ওর জন্য অপেক্ষা করে। একসঙ্গেই ফেরে দুজনে। দীপক বাড়ি ফেরে অফিস থেকে। আজকাল ও বেশ তাড়াতাড়িই ফিরছে। ফিরে জলখাবার আর চা খেয়ে বেড়িয়ে যায় দাদুর বাড়িতে। রাত প্রায় নটা সাড়ে নটা নাগাদ ফেরে। দু-তিন দিন আগে পর্যন্ত রাত্রিবেলা আর দরকার নেই। সন্ধ্যেবেলা বুবলু পড়াশুনা করে। টুবলু খেলা করে ম!লাদির স!। মা রান্না করে। বাড়িটা খুব চুপচাপ থাকে সন্ধ্যের দিকটায়। সন্ধ্যেবেলাগুলো আজকাল বুবলুর কেটে যায় সকালবেলার মতোই। ও বুকে আর কোনোও চাপ অনুভব করে না। দাদু ভালো হয়ে গেছে। বিরাট এক কালো ছায়া যেন উঠে গেছে বুবলুর ওপর থেকে। পড়তে পড়তে ও উঠে গিয়ে মাঝে মাঝে টিভির সুইচটা খুলে দেয়। মা ছুটে আসে, চোখ রাঙায়। বুবলু খবরদার টিভি খুলবি না। পড়া নেই তোর?

বুবলু মাকে খেপিয়ে মজা দেখে।

আজ ভাবছি বাংলা নাটকটা দেখবো। বুবলু মাটিতে বসে পড়ে।

মা টিভির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, দেখ দেখি, কেমন করে দেখবি।

বুবলু ভাইকে নিয়ে যায় ওর পড়ার ঘরে। ওর হাতে রঙীন একটা রবার দেয়। ওকে কোলে উঠিয়ে জোরে জোরে পড়ে। মা অবশ্য ঠিক টের পেয়ে যায়। ভাইকে নিয়ে যেতে চায়। বুবলু ভাইকে চেপে ধরে রাখে যেতে দেয়না।

আরও প্রায় মাসখানেক লাগলো দাদুর সুস্থ হতে। দীপক আর এখন রোজ সন্ধ্যেবেলা যায়না, সপ্তাহে দুবার যায়। বুবলু আবার মন ঢেলে পড়ে। অনেকদিন পড়াশুনার গাফিলতি হয়ে গেছে। দীপক তাই ওর প্রতি বেশ কড়া নজর রেখেছে। সন্ধ্যেবেলায় নিজের ঘরে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই আবার বুকটা ফাঁকা লাগে বুবলুর। তবে এখন ওর মন দ্বিখন্ডিত। বুকে যেই কাঁটা ফোটে, সঙ্গে সঙ্গেই কাঁটা ওপড়াবার একটা চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। দাদু ভালো হয়ে গেছে, আর দুঃখ কি? সবাই তো অনেক করেছে। তা না হলে দাদু কি বাঁচতো? মনটা স্থির করতে ও বদ্ধপরিকর।

সামান্য একটা মৃদু ব্যথা, ব্যাস্। এছাড়া বুবলু সম্পূর্ণ হাল্কা। দাদু ভালো হয়ে গেছে, আমার আর কিছু চাই না। মনের কোনোও পেশীতে টান পড়লেই ও নিজেকে বোঝায়।

কিন্তু সেদিন রাত্রিবেলা বুবলু আবার ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সর্বনাশা এক বিশাল গহ্বর আচমকা টেনে নেয় ওকে অতলে।

দীপক ফিরেছে দাদুর বাড়ি থেকে। রীণা দরজা খোলে। বুবলু অভ্যাসবশতঃ কান পাতে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই রীণা বলে— কি ব্যাপার? খুশি খুশি এতো? জানো, আজ উনি কি বললেন আমায়— দীপক কথাটা শেষ করে না।

কি বলেছেন? রীণা কৌতূহলী হয়।

সে এক দারুন ব্যাপার, বলব না, এটা একদম গোপণীয়। দীপকের গল্য রহস্যময়।।

বল না গো, বল না— রীণার কৌতূহল বেড়ে ওঠে।

বুবলুর বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। ও আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কথা বলতে বলতে রীণা আর দীপক ওদের ঘরে ঢোকে। টুবলু ঘুমচ্ছে। ম!লা বোধহয় রান্নাঘরে।

পর্দার আড়ালে একজোড়া চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে বুবলু।

জানো, উনি বললেন, তুমি যা করেছ তা তুলনাহীন। আমি বললাম— এতো আমার কর্ত্তব্য। শুনে উনি বললেন, সবাই বলছে, শক্তিও বলছে তোমার নাকি ঘুম ছিল না রাতে। আমাকে তো ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হতো, তাই জানতে পারিনি প্রথমে, তবে পরে আমিও তো দেখেছি— দীপক আস্তে আস্তে বলে চলে। তুমি কি বললে? রীণার গলা মৃদু আবেগতাড়িত। আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে, আমি তো আপনার ছেলের মতো।

তারপর? রীণার কণ্ঠে আকুলতা।

উনি কি উত্তর দিলেন জানো?

কি?

উনি বললেন ছেলের মতো কেন? তুমি আমার ছেলেই।

বাবা বললেন একথা? বাবা বললেন— রীণার গলা কান্নায় বুজে যায়।

হ্যাঁ, এই হীরের আংটিটা আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। দীপক হাতটা সামান্য তুলে দেখায় রীণাকে। শুধু রীণা না, পর্দার ফাঁক দিয়ে বুবলুও দেখে দীপকের আঙুলে ঝকঝক করছে আংটি। অনেকদিন পর এক তীব্র ভয়ে শিউরে ওঠে ও। আবার একটা বিচ্ছেদ হবে, আবার একটা সম্পর্ক ঘুচে যাবে চিরদিনের মতো। শরীরের ভেতর কুলকুল করে ঘাম ঝরে পড়ে। ও আর দাঁড়াতে পারে না, ছুটে যায় ঘরে।

সেদিন রাত্রিবেলা রীণার শত বকুনী, দীপকের হাজার অনুরোধেও ওঠেনি ও। এক বিন্দু জলও খায়নি। ভয়, এক নিদারুণ ভয় ওকে বিহ্বল করে রেখেছিল। ও বুঝতে পারছিল, চোখ মেললেই ও দেখতে পাবে সেই হীরের আংটিটা জ্বলজ্বল করছে দীপকের অনামিকায়। অথচ চোখ বন্ধ করলেই ও অন্য দৃশ্য দেখছে। ফর্সা, লম্বা একটি আঙুলে হীরের আংটিটা। বাবা হাত নাড়ছে, ঝলমল করে উঠছে আংটি। বাবা টেবিলের ওপর হাত রেখেছে। আংটিটা জড়িয়ে রয়েছে বাবার আঙুলে। হাতে থাকতো ওই আংটি। বাবা হাত ধরতো ওই আংটি পরা আঙুল দিয়ে। মা রাগ করলে সুন্দর আঙুল দিয়ে মার চিবুক তুলে ধরতো বাবা। ও ছোট ছিল কিন্তু ও ভোলেনি বাবার চোখের মতো আংটিটাও চিক্‌চিক্ করতো। খন্ড খন্ড এই ছবিগুলো ভেসে আসছে ওর বন্ধ চোখের পাতার অন্তরালে। আর ওর চোখ গড়িয়ে জল ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর বালিশ।

বাবা যখন মারা গেল, কে যেন খুলে নিয়েছিল আংটিটা। মৃতদেহ বাইরের ঘরে রাখা হয়েছিল। বুবলুকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছিল বুবলুর এক দূর সম্পর্কের কাকীমা। ছোট বুবলু

বাবার পায়ে হাত না দিয়ে, দু হাত বাড়িয়ে বাবার হাত দুটো ধরেছিল। বাবার বাঁ হাতের অনামিকা শূন্য, শুধু সাদা একটা দাগ। ও চমকে ছেড়ে দিয়েছিল হাতটা। সাদা, শূন্য বাবার সেই অনামিকা বুবলুর বুকে খোঁচা মেরেই চলেছে। অগ্নিশলাকার আঘাতে বুবলু গোঁঙাছে, বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

পর পর দুরোববার বুবলু আবার একাই যাচ্ছে দাদুর বাড়ি। ও একদম চুপচাপ হয়ে গেছে, প্রায় নির্বাক। বেশ বোঝা যায় ও সবাইকে এড়িয়ে চলছে। রীণা নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে বুবলুকে। দীপকও বুঝতে পারছে বুবলু হঠাৎ আরও চুপচাপ হয়ে গেছে, আরও অন্তর্মুখী। একদিন বুবলুর ঘরে ঢোকে দীপক— কি হলে বুবলু? ঘর থেকে বেরোচ্ছিস না? আমার কাছে পড়া বুঝিস না?

বুবলু উত্তর দেয় না। দীপক বুবলুকে নিরুত্তর দেখে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে। হীরের আংটিটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বুবলু দুচোখ বন্ধ করে এক নিমেষে।

দাদুর বাড়িতে এসেও ও আর আগের মতো কথা বলে না। চুপচাপ এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে ওর গতিবিধি, ওর চালচলন। দু সপ্তাহ বুবলুর এইরকম খাপছাড়া ব্যবহার লক্ষ্য করেই সেদিন দাদু বলে— আয় দাদুভাই। ট্রাঙ্কগুলো থেকে জিনিসগুলো নিয়ে রোদে দিই। আমার অসুখ বলে অনেকদিন জিনিসগুলো বার করা হয়নি।

বুবলু বিশেষ হাত লাগায় না। শক্তিনাথের সহায়তাই দাদু খালি করতে থাকে ট্রাঙ্কগুলো। হঠাৎ দাদু চমকে ওঠে—

ছড়ি! ছড়িটা কোথায়?

শক্তিনাথ ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

কি ছড়ি বাবু? কোন ছড়ি?

দাদু তখন পাগলের মতো বড় ট্রাঙ্কটা হাতড়াচ্ছে। জিনিসপত্রগুলো একাকার করে, তোলপাড় করে ও খুঁজে চলেছে ছড়িটা, কিন্তু কোথায় ছড়ি?

দাদু অস্থির হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ছড়িটা পাওয়া যায় না। আঁতিপাঁতি করেও যখন ছড়িটা পাওয়া যায় না, বৃদ্ধ তখন ভেঙে পড়ে। কান্নায় বিকৃত হয়ে যায় ওর কণ্ঠ। বুবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ও দু হাত দিয়ে।

দাদুভাই, ওটা আমার বাবার ছড়ি ছিল। সবসময় হাতে রাখতেন উনি। বেড়াতে যেতেন ছড়ি হাতে, বৈঠকখানায় যখন লোকজনের সঙ্গে বসতেন তখনও হাতে থাকতো ওই ছড়িটা। আমাদের শাসনও করতেন ওই ছড়ি দিয়ে। ছড়ির দাগ বোধহয় আমার পিঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে এক আধটা। ওরে দাদুভাই, আমি যে চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি বাবার হাতে সেই ছড়িটা। আমি যে স্মৃতি নিয়ে বসে আছি দাদুভাই। স্মৃতির সঞ্চয়ও যদি আমার চলে যায় তবে আমি বাঁচবো কি নিয়ে—

বুবলু দাদুর শক্ত বাঁধনের ভেতর কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাদুর চোখে জল, কিন্তু ওর চোখদুটো শুকনো, নিষ্করুণ।

অনেক রাতে বুবলু ওঠে। পিঠের মধ্যে বিঁধছে কিছু। ঘুম ভেঙে গেছে তাই। আলো জ্বালায় না ও। পুরো তোষকটা তুলে ফেলে। তোষকের নিচে পাকানো ছড়িটা।

শুধু ছড়িটা হারিয়ে এতো দুঃখ পাচ্ছ তুমি? তোমার স্মৃতিতে আছে একটা হাত। কিন্তু ফর্সা, লম্বা অনামিকায় হীরের আংটিটা যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে ঝিলিক দিতো আমার স্মৃতিতে, তাকে যে তুমি টুকরো টুকরো করে ভাঙলে। আমায় যে দেখতে হচ্ছে সেই হীরের আংটিটাকে অন্য কায়দায় জ্বলজ্বল করতে।

টান মেরে তোষকটাকে আবার পাতে বুবলু। পায়ের নিচে আর এক চিলতেও জমি নেই ওর নিজস্ব। এতদিন ধরে যে ভয় ওকে লাঞ্ছিত করেছে, বুকের ওপর চেপে বসে থেকেছে, সেই সর্বগ্রাসী ভয়ের অনুভূতি শিথিল হয়ে সরে গেছে কখন অলক্ষ্যে। পা দুটোকে শক্ত করে সাঁতার কাটবে ও আজীবন। অবশেষে যদি কোনদিনও পারে ও কিনে নেবে এই পৃথিবী থেকে পায়ের নিচের একটুকরো জমি।

মাটি ভিজে কাদা

প্রফুল্ল এবার আর কোনোও ঝুঁকি নিলো না। সাবধানী চোখ বুলিয়ে নিলো চারদিকে। ঠিক, জানলাগুলো আধভেজানো রাখা দরকার, আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ রাখলে অস্বাভাবিক লাগতে পারে। সদর দরজা বন্ধ রাখতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু সদর দরজাই গেছে উড়ে। ভাঙা দেওয়ালের গায়ে ঝুলে আছে দরজার এক চতুর্থাংশ। দুটো ঘর। পাশাপাশি। ঘর দুটোর মধ্যে একটা দরজা। নামেই দরজা। ফাঁক বললেই ভালো, পাল্লা নেই, শুধু কাঠামোটা আছে। প্রফুল্লরা যে ঘরে থাকে, তার বাইরের দিকের দরজাটা খুললে উঁচু দাওয়া। সামনের জমিটা নীচু, আগাছায় ভর্তি। দাওয়ার বাঁ পাশের লাগোয়া জায়গাটাতে টিনের চাল দিয়ে রান্নাঘরের ব্যবস্থা। স্নানটানের তো কোনো ব্যবস্থাই নেই বাড়ীতে। পুকুর ছাড়া গতি নেই। প্রাকৃতিক কর্মও সারতে হয় মাঠে। কতোবার ভেবেছে সামনের জমিটা একটু পরিষ্কার করে তরিতরকারীর গাছ লাগাবে কিছু একটা ঘেরাও করে স্নানের জায়গা করবে; কিন্তু ফাটা কপাল। খাওয়া শোওয়ারই নেই সংস্থান, তার আবার অন্য বিলাসিতা। ঘেন্না, ধরে গেলো জীবনে।

শোনো, কেউ এলেই আবার ঘরে নিয়ে বসিও না। আদিখ্যেতার তো শেষ নেই। নিভাকে সতর্ক করে প্রফুল্ল।

কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। নিভার চাপা গলার স্বর বেসুরে বাজে। কিন্তু কখন জানাবে সবাইকে? নিভা ভয়ে ভয়ে জানতে চায়।

চুপ প্রফুল্ল গর্জে ওঠে।

একদম চুপ। একটু গলা ছাড়বি তো জিভ টেনে। ছিঁড়ে ফেলবো। এবার আর রেয়াৎ করছি না আমি। গর্তে ঢুকে যাওয়া প্রফুল্লর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে শ্বাপদের মতো।

ইস্কুলে যেতে দিলে না তুমি, কিন্তু গেলে ভালো হতো, কেউ সন্দেহ করতো না। স্তূপাকার বালিশ তোষকে পিঠ দিয়ে সুখেন গালের একটা ব্রণ খুঁটছিল। ইস্কুলে যাওয়ার জন্য ভাত খেয়ে নিয়েছিল ঠিক দশটায়। কিন্তু বাপশালা বাগড়া দিলো। যেতে দিল না ইস্কুলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে দেখে। মেজাজটা আগুন হয়ে আছে তখন থেকে। নিতাই, তপন, শ্যামল সকলে তেমাতানিতে জড়ো হয় ওরা। চণ্ডীর পানের দোকান থেকে সিগারেট কেনে। তারপর পানের দোকান থেকে একটু সরে আসে। দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। সরলাবালা মেমোরিয়াল ইস্কুলটা ছুটি হয় ঠিক এগারোটায়। ওদের সামনে দিয়ে মেয়েগুলো যেতে থাকে দলে দলে। ফাইভ সিক্সের বাচ্চা মেয়েগুলো প্রথমে বেরিয়ে যায় এক দমকার। আর তারপরেই শাড়ীপরা মেয়েগুলো আসে হেলতে দুলতে। গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, ঢলাঢলি। মায়রী, ন্যাকামীও জানে মেয়েগুলো। শ্যামল, তপন, নিতাই, ওরা আন্‌শান্ খিস্তি খেউর ছাড়ে কিন্তু সুখেন দাঁড়িয়ে থাকে একধারে। ও নজর রাখে। মাধবীকে এগিয়ে আসতে দেখলেই ও মুখটা ছুঁচলো করে গানের সুর ভাঁজে। ছুঁড়ীর মুখে যেন ফ্লাড লাইট জ্বলে। আর—

ধুস্ শালা। দিনটাই মাটি। বিরক্তিতে তাই ভাত খেয়ে উঠেই বিছানার গড়িয়ে পড়েছিল। বাপমায়ের কথাবার্তা দিলো ঘুমটা চটকিরে। কতোদিন থেকে বাবার এই ঘরটার ওপর লোভ। নিজের জিনিষ বেহাত হলে কোন পুরুষ মানুষের না গায়ে জ্বালা ধরে। ঘরটা ব্যবহারই করতে পারলো না ওরা। তাই বাড়ীর মধ্যে যতো বাক্সপ্যাঁটরা, আর আবর্জনা আছে তাই দিয়ে ভরে রেখেছে ঘরটা। সরু তক্তপোশটা এককোণে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। হাওয়াটা ঘরের মধ্যে ঘোট পাকিয়েই থাকে। শরীর নিঃসৃত জল আর সারে হাওয়াটায় যেন ভেজাভাব। গা গুলিয়ে উঠতো সুখেনের। এই নিয়ে কম রাগারাগি করেছে নাকি ও। যতোক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ নাক দিয়ে ঢুকে চলেছে রাশ রাশ পচা গন্ধ। হঠাৎ সুখেনের মনে হলো অসহ্য গন্ধটা যেন বেড়ে গেছে আজ। প্রফুল্ল আর নিভাও নাকে কাপড় চাপা দিচ্ছে বার বার।

গেছে একেবারেই? না আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে? সুখেন বাঁকা হাসে।

তাই তো এতো আটাআটি চাল। অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার গতবারে। এবার পচে গলবে তবেই ডাকবো লোক। পরোপকার করার লোকের তো অভাব নেই। প্রফুল্ল গামছাটা টেনে নিয়ে কোমড়ে বাঁধে, আবার কি ভেবে কাঁধে নেয়। খাটের পাশে উবু হয়ে বসে তেলের বাটিটা নিয়ে ঘরের শিকলে হাত দেয়।

কেউ এলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলবে। আর বিদায় করে দেবে তাড়াতাড়ি।

যদি ঢুকতে চায়? নিভা প্রশ্ন করে।

ঢুকাবি না, ব্যাস্। এবার যদি কিছু হয় তোকে শুদ্ধু বাড়ী থেকে তাড়াবো বলে দিলাম। অনেক সহ্য করেছি, আর না। শিকল থেকে হাতটা নামিয়ে নিভার দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি রাখে প্রফুল্ল।

তুমি চান করতে যাচ্ছ নাকি এখন? কনুইয়ের ভর দিয়ে সুখেন আধশোয়া হয়।

নজর রাখিস সব দিকে। কোনো গন্ডগোল যেন না হয়। চান না করতে গেলে লোকে ভাবতে পারে কিছু। অসুখ করেছে বলে আবার দেখতে না আসে। বাইরের হালচালটা এই ফাঁকে দেখে আসে একবার। বাপটার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ব্যাটাছেলে, কোথায় ফুর্তি মারবে একটু আধটু। তা নয়, ভগবান গলায় লটকে দিল একটা। কি বিচ্ছিরি বাপরে বাপ্। একদিন কি কারণে ওই ঘরে ঢুকেছিলও। পারতপক্ষে সুখেন ঢোকেই না ও ঘরে। তবে যদি ঢুকতেই হয় তবে প্রাণপণে মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঝট্ করে কাজটা সেরে পালিয়ে আসে। সেদিন হঠাৎ কি করে চোখটা পড়ে গেছিল। পিচুটি ভর্তি ঘোলাটে দুটো চোখ। তাড়া খেয়ে যেন সুখেন পালিয়ে আসে ঘর থেকে।

অথচ বিনাদোষে বাবাকে এই নরক ঘাঁটতে হয়। আবার হাই ওঠে সুখেনের।

ধ্যাত্ শালা—বালিশ একটা টেনে শরীরটা ছড়িয়ে দেয় ও।

বাইরে বেরিয়ে প্রফুল্ল দরজাটা টেনে দেয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ভেতর থেকে শেকল তোলার শব্দ শোনে। সামান্য ঠেলে দরজাটা ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে পা বাড়ায়।

বর্ষাকাল। কাদা ভর্তি। ছোট ছোট ইঁটের টুকরো রাখা ছিল। জলে আর কাদায় সেগুলোও বেশ ডুবে গেছে। পায়ে কাদা লেগেই যায়। পুকুরে পৌঁছে প্রথমেই প্রফুল্ল পা দুটো ডলে ডলে ধোয়। শান্‌বাঁধানো ছিল এককালে পুকুরটা। এখন আর কোনো ইজ্জত নেই। সিঁড়িগুলো একদম ভাঙা। বর্ষায় পিছল। সাবধানে পা না ফেললেই একেবারে সোজা পুকুরে। এখানে অবশ্য সবাই সাঁতার জানে। তবে পুকুরের নীচে এত লতানো গাছ যে পা একবার জড়িয়ে গেলেই হলো আর কি। সাপের উপদ্রবও বেশ। জলের সাপে বিষ নেই বটে, তবুও পুকুরের ধারে সাপের বিষেই তো মরলো নব্ধীপের ছেলেটা মাস কয়েক আগে। কি মাস্টার। আজ যাওনি ছেলে ঠ্যা!াতে? শরীর খারাপ না কি? হলধরের কুতকুতে চোখদুটো দেখলেই গা জ্বলে যায় প্রফুল্লর। প্রফুল্লর জ্যাঠার ছেলে। সব সময় কথার মধ্যে বাঁকা ভাব। এই মাস্টার ডাকটাও যেন প্রফুল্লকে ছোট করার চেষ্টা।

গাটা একটু ছমছেমে। প্রফুল্ল এক খাবলা তেল তুলে পায়ে ঘসে।

শরীর খারাপ তো এতো অবেলায় স্নান? হলধর খুকখুক করে কেশে ওঠে। প্রফুল্ল চমকে ওঠে, হাসি চাপতেই লোকটা কেশে উঠলো মনে হয়। সামান্য অসর্তকতায় তার চমকে ওঠা লোকটা দেখলো না কি। আড়চোখে দৃষ্টি গলায় সে। আরো একটু তেল নিয়ে মাথা নীচু করে পায়ের ফাটা জায়গুলো ঘসে। প্রফুল্লর দৃষ্টি পায়ের পাতায়। এতো করে ধুয়েও নখের ফাঁকে ফাঁকে কাদা দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পুকুরে নেমে দুটো ডুব দিলো প্রফুল্ল। তিনটে বাজতে চললো। চান বেশী করা ঠিক না। গামছা দিয়ে গাটা ডলে নিলো একবার মাথাটা ভেজায়নি আর অবেলায়। বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করতেই পেছন থেকে ডাক দিলো হলধর।

ও মাস্টার, শোনো, শোনো। শাশুড়ী আছে কেমন? প্রফুল্ল খুঁটিয়ে তাকায়। বুকের রক্ত জমাট বাঁধে। কিন্তু না, সাহস হারালো চলবে না। শক্ত মুখে প্রশ্নে মোকাবিলা করতে ঘুরে দাঁড়ায়। গতবার হাতে উঠে আসা মাছটা নিজের বোকামীর জন্য জলে পালিয়েছিল। মেয়েছেলেটা বমি করছিল খুব। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে নাড়ীছাড়া অবস্থা। প্রফুল্ল অবশ্য কোনো গা করেনি। একগাদা গিলে তো প্রায়ই বমি করে হারামজাদী। পরিষ্কার করতে নিভাকে সাহায্যও করতে হয় ওকে। ঘর জুড়ে শুয়ে থাকা। আবার তার ওপর এইসব ধ্যাষ্টামো অসহ্য মনে হয়। ধাক্কা দিয়ে শরীরটা সরিয়ে বমি পরিষ্কার করে।

মর মর। ভালো ছিলি ভাসুরের বাড়ী, এলি আমায় জ্বালাতে। ভাসুর চড় মেরেছে। বেশ করেছে। মেয়েছেলে একটা চড় সহ্য করতে পারনি। আমার ঘাড়ে চাপলি। হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল আমার। গরীবের সংসার। প্রত্যেকবার যখন বাড়াবাড়ি হয় নিভা ফেটে পড়ে রাগে। নিভার ঘ্যানঘ্যানানি অবস্থাটাকে আরো অসহনীয় করে তোলে। প্রফুল্ল গজরাতে থাকে। শরীরটা কঠিন হয়। নিভা থামে না। আক্রোশে খান্ খান্ হয়। কই মাছের প্রাণ মরবি কি আর সহজে। স্বামী খেলি, ছেলেকে খেলি, আমায় খা এবার রাক্ষুসী। দেখি তোর কত নোলা।

তক্তপোশের ওপর শুয়ে থাকা কঙ্কালটার বুকটা ধুক ধুক করে। মরেনি যে এক নজরেই বোঝা যায়। এতবার মেয়েছেলেটা ভুগিয়েছে যে সেবার বলাতেও ওঠে না প্রফুল্ল, দাঁত খিচিয়ে নিভাকে থামায়।

যাও না দেখে এসো একবার টেঁসে গেছে বোধহয়। সুখেন এসে যখন একগাল হেসে বলে তখনই তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় প্রফুল্ল। ওই ঘরে ছুটে গিয়ে দেখে বুড়ীর সত্যিই শেষ অবস্থা। বিনা চিকিৎসায় মেয়েছেলেটা যদি মরে তবে পাড়ার লোকে দুষবে। শাশুড়ীটাকে না চিকিৎসা করে মারলো। কে থাকে লোকের কথার তলায়? প্রথমেই মন্মথকে ডেকেছিল। মন্মথ এসে অবস্থা দেখে রায় দিয়েছিল, কি আর করা। মুখে গঙ্গাজল দাও। ব্যাপারটা এগোচ্ছিল নিরুপদ্রবেই। হঠাৎ হাজির হতচ্ছাড়া, পাজী এই হলধর।

সে কি গো? ডাক্তার ডাকবে না মাস্টার? বুড়ীর এখনও প্রাণ আছে যে। হৈ হৈ করে ডাক্তার নিয়ে হাজির হলো একটা। হলধরের সঙ্গে প্রফুল্লকেও যেতে হলো বারুইপুর হাসপাতালে। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে নিভা সুখেনকে যেতে দিলো না।

এই দেশে নাকি চিকিৎসার অব্যবস্থা? বিনে ওষুধে, বিনে ডাক্তারে, বিনে চিকিৎসায় মরছে নাকি লোক? সমস্ত বাজে কথা। মেয়েছেলেটাকে নিয়ে বারুইপুর হাসপাতালে এমন লীলাই হলো যেন ভরাযুবতী মরতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্যালাইন, অক্সিজেন, ইন্‌জেকশন। দুদিন পরই বিপদ গেলে কেটে। মেয়েছেলেটার বিপদ কাটলো, বিপদ বাড়লো প্রফুল্লর। বিপদ বাড়লো নিভার। পাড়াপ্রতিবেশী খোঁজ নিতে আরম্ভ করলো। সারাদিনের খাটুনীর পর নিভার আবার সেবা করতে শুরু করতে হল।

কি গো বৌমা? মাকে একটু খেতে দাও। ওষুধ দিয়েছ তো সময় মতো?

একদিন তো ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে রক্ত উঠলো প্রফুল্লর মাথায়। যে চারটে ট্রাঙ্ক ও ঘরে ছিল, সেগুলো হঠাৎ ওদের ঘরের কোণ জুড়ে।

ব্যাপারটা কি? এগুলো এখানে কেন? প্রফুল্ল চিৎকার করে ওঠে।

হলধরদাদা এসে বললো রোগীর ঘরটা ফাঁকা থাকলেই ভালো। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সরিয়ে আনলো এই ঘরে। নিভা কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দেয়।

এতো দরদ যখন নিয়ে যাক না নিজের বাড়ীতে। করুক না সেবা। খাওয়াক না হাওয়া যত খুশী। নিজের ছেলের ঘরটা দিক না ছেড়ে মেয়েছেলেটার জন্য। প্রফুল্ল রাগে দাপাদাপি করে। সেই সন্ধেতেই সুখেন আর প্রফুল্ল ট্রাঙ্ক চারটে আবার টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। ঘরটার দিকে তাকালে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে প্রফুল্লর। কিভাবে ঘরটা বেহাত হলো। বাবার ও একটাই ছেলে। হলধরের বাবা ওর জ্যাঠা। হলধররা তিন ভাই। একটা ট্রেনে কাটা পড়ে, গেছে। বাকী দুটি ভাইয়ের মধ্যে জমিজিরেত ভাগ হয়েছে। প্রফুল্লর ভাগে পড়েছে ওর সর্বস্ব। আছে শুধু ভাঙাচোরা এই বাস্তুভিটে আর সামান্য জমি। সংসার চলে না বলেই গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারী করে। নিভাদের বাড়ী কালিকাপুরে। দুটো স্টেশন পরে। ওর যখন পাঁচ বছর তখনই ওর বাবা মরে যায়। বাবার নাকি ছিল কিছু টাকা। সেই টাকার রঙ লাল কি হলুদ তা অবশ্য প্রফুল্ল জানে না। মেয়েছেলেটা এক নম্বরের সেয়ানা। ন্যাকা ন্যাকা গলায় প্রায়ই বলতো আগে ভাসুর নাকি হাতিয়ে নিয়েছে সব। প্রফুল্ল বিশ্বাস করে না এক বিন্দু।

টাকা চায় না প্রফুল্ল কিন্তু শাশুড়ীটা যে এসে ঘাড়ে চাপবে তাও সহ্য করতে পারে না ও। নিভার সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন বেশ ছিল গুছিয়ে ভাসুরের বাড়ীতে। জামাইয়ের ঘাড়ে যে চাপতে পারে সেই রকম আশঙ্কার বীজ পর্যন্ত দেখা ছিল না। কিন্তু ভাসুরের বাড়ীতে যে হঠাৎ কি হলো। যে গাছের বীজ পর্যন্ত দেখা যায় নি, তা মহীরুহ হয়ে প্রফুল্লর ঘাড়টাই দিল মটকে। বৈশাখ মাস। চারিদিকে ঠা ঠা রোদ্দুর। ছোট একটা টিনের বাক্স নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে এসে হাজির। প্রফুল্ল আর নিভা প্রথমে ভেবেছিল এসেছে বোধহয় থাকতে কদিন। কিন্তু দিন গড়িয়ে মাস হয় যখন, প্রফুল্ল চিন্তিত হয়ে পড়ে। নিভা খুঁচিয়ে জানে যে এটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত। দুবছর তাও কাটে মোটামুটি। স্বাস্থ্যটা ভালো ছিল খুব। যৌবন ঢলে পড়লেও, শরীরটা টস্‌কায়নি এতটুকু। মোটে পনেরো বছরে নিভার জন্ম। বয়স তখনও পঞ্চাশের কোঠায়। প্রফুল্লর থেকে মোটে পাঁচ বছরের বড়। খাটতো খুব সংসারে। সুখেনকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতো। নিভা আর প্রফুল্ল থাকতো এই ঘরে। শাশুড়ীর এস এই থাকাটা তখনও খুব বিরক্তিকর লাগতো। তবে নিভা বেশ খুশীতেই ছিল। সংসারের ভারটা বেশ লাঘব হয়ে গেছিল। নিভার আদুরেপনা তাই মাঝে মাঝে প্রফুল্লকেও ছুঁয়ে যেতো। বিয়ের প্রথম প্রথম যে সব খুনটুসি ছিল তাও ঝালিয়ে নিতো প্রফুল্ল। বায়স্কোপেও গেছে সেই দু বছরে মোট তিনবার। কিন্তু প্রফুল্ল চিরকালের অভাগা। তিন বছরের মাথায় পড়লো ম্যালেরিয়ায়। সেই যে পড়া আর উঠল না বিছানা থেকে। দেড় বছর ধরে ভুগে চললো একটানা। পাড়াপ্রতিবেশীর ব্যবহার তাজ্জব হয়ে যায় প্রফুল্ল। যখন ভালো ছিল তখন ওদের দরদ উথলে পড়তো মেয়েছেলেটার অমানুসিক খাটুনি দেখে। আবার যখন বিছানায় পড়লো তখন ওরা সেবাযত্নের অবহেলায় খোঁজ নেয়। কিন্তু এই একটা মেয়েছেলের জন্য ওদের সংসারে যে একতিল সুখশান্তি নেই তার কেউ খবর রাখে? কতো আশা ছিল পাশের ঘরটা সুখেনের জন্য গুছিয়ে দেবে ও। সুখেন পড়াশুনা করবে। একলা খাটে ঘুমবে। বন্ধুবান্ধব এলে বসাবে। আর—যখন ওর বিয়ে দেবে বৌ নিয়ে থাকবে সুখেন ওই ঘরটাতে। কতো সুন্দর স্বপ্ন ছিল প্রফুল্লর। একটাও কি তার সত্যি হতে পেরেছে এই মেয়েছেলেটার জন্যে।

তক্তপোশের পায়ের দিকটায় ঠায় বসে আছে নিভা। কতোক্ষণ চানের জন্য বেরিয়েছে প্রফুল্ল, এখনও ফেরেনি ও। উৎকণ্ঠা চাপতে চাপতে সারা শরীরটা যেন ঝিম মেরে গেছে। চাদরটা বুক অবধি টেনে দিয়েছে নিভা। মাথার দিকের জানলাটা পুরো বন্ধই আছে কিন্তু তাও কোথা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে কে জানে। এক একবার মনে হচ্ছে নিঃশ্বাসে কাঁপছে বুঝি। দু একটা মাছি ভনভন করে মুখের ওপর বসছে। ইচ্ছে করেই নিভা হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে না মাছিগুলো। মাছিগুলো মুখের ওপর বসছে—তখনই ওর বেশ নিশ্চিন্ত লাগছে। কোনো সাড় নেই। নিশ্চল পাথর যেন একটা। গলার কাছে একটা দুঃখবোধকে টেনে আনার চেষ্টা করছে প্রাণপণ। কিন্তু শরীররে নানা অংশ থেকে ডেলাগুলো ওপরে উঠে আসার আগেই মিলিয়ে যাচ্ছে অনবরত। ঘরটা আজই খালি করতে হবে। না— আজ খালি করা যাবে না। লোকে অনেক কথা বলবে। তাছাড়া ঝামেলা মিটতেও রাত হবে। ভালো করে ঘর পরিষ্কার করতে হবে। তক্তপোশটার

বেশ দাম নিয়েছিল। কিন্তু রাখা যাবে না এটা। ফেলে দিতেই হবে। কতো রোগের জীবাণু যে বাসা বেঁধেছে এর ভেতর। সুখেন বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারবে। বড়ো কটু গন্ধ বেরোচ্ছে। একটা ধূপ জ্বালাতে পারলে ভালো হতো। ঠাকুরের আসনেই ধূপ রয়েছে। কিন্তু জ্বালানো যাবে না। ধূপের গন্ধে মৃত্যুর গন্ধ মাখামাখি। মৃত্যুর গন্ধটা এখনই বাতাসে চাউর করা যাবে না। আর কতক্ষণই বা, এই শুকনো হাড়কটা সরিয়ে নিয়ে গেলেই তো মৃত্যু ছাড়বে এই বাড়ী, রোগজ্বালা, নোংরামী, অশান্তি যাবে সব—সব। বসে থাকতে থাকতে হাত পা ধরে যাচ্ছে নিভার। প্রায় ঘন্টা চারেক হয়ে গেলো। আর কোনো ভয় নেই। মরেই গেছে মেয়েছেলেটা। আজ প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে নিভা মা শব্দটা ব্যবহার করেনি। তুমি কিছু দেবে, আমি কিছু দেবো, তবেই তো গড়বে সম্পর্ক। শুধু চুষে চুষে যদি একজন নিয়েই চলে তবে তার সে! কি সম্পর্ক? মা বলেই কি? এই মেয়েছেলেটাতো ওকে শুধু জ্বালিয়েই গেলো। তার ওপর প্রফুল্লর দিবারাত্তির খিটখিটানি। নিভা যেন ইচ্ছে করেই এনে রেখেছে ওকে। সুখেনকে একটু বাড়তি সুখ দিতে ওর মনও কি চায় না? টেনে ফেলে দিতে তো প্রফুল্লও পারেনি। তড়পেছে অবশ্য অনেকবার। কিন্তু নিভার মনে হয় পাড়া প্রতিবেশীর ভয়েই প্রকাশ্যে বেশী বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়নি। আর জ্যাঠার কান্ড দেখো, সেই যে তাড়ালো আর কোনোদিন খোঁজ করলো না।

ঘরের আলো প্রায় নিভে এসেছে। দেহটাকে আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এই দেহটাই নিভার সব জ্বালার মূল। চোখের সামনে থেকে যখন এই কুৎসিত জড় পিন্ডটাকে সরানো হবে, তখনই নিভার এতো দিনের সাধ পূর্ণ হবে। আজকে সকাল থেকেই নিঃসাড়ে পড়েছিল। নিভা আর প্রফুল্লকে কিছু বলেনি কারণ তারপরে যদি নিরাশ হতে হয় তবে প্রফুল্ল আর ওকে আস্ত রাখবে না। দশটা নাগাদ যখন নাকের কাছে হাত রেখে নিঃশ্বাসটা অস্বাভাবিক মনে হয় তখন ও প্রফুল্লকে না ডেকে পারেনি। প্রফুল্ল উঠতে চায়নি কিন্তু নিভার কাকুতি মিনতিতে শেষ পর্যন্ত ওঠে আর উঠে নাকে হাত দিয়েই চমকে যায়। লাফিয়ে ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে টেনে। কোনো মতেই জানানো যাবে না কাউকে। ঘন্টাখানেক পরে প্রাণটা গেলো টের পায় ওরা। নিভা চেঁচিয়ে কেঁদে লোক জড় করার কথা ভাবছিল আর তখনই প্রফুল্ল রায় দেয়।

এখন না, কয়েক ঘন্টা কাটুক, তবেই লোক ডাকবো। মেয়েছেলেটার কোনো বিশ্বাস নেই, শত্রুতা করে যদি বেঁচে ওঠে ডাক্তারের একটা সুঁইয়ের ফোঁড়ে। খুটখুট করে দরজায় শব্দ হয়।

কে? সুখেন সর্তক হয়।

আমি, খোল। প্রফুল্লর গলা পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সুখেন। প্রফুল্ল ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে এ ঘরে আসে। দেহটার বুকে মাথায় হাত বোলায়।

ইস্, গাটা শক্ত একেবারে। এতক্ষণে প্রফুল্লর মুখের পেশী ঢিলে হয়।

গলা ফাটাও এবার। তাড়াতাড়ি শুরু করো। এরপরে রাত হয়ে গেলে এ মড়া নিয়ে আবার ঝামেলা। নিভা চেঁচিয়ে ওঠে।

মা আ...কানফাটা শব্দটা গলার ভেতর দিয়ে সুরে বেরিয়ে আসে। জিভের মধ্যে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অনভ্যাসে শব্দটার গায়ে নোনা ধরেছে, টান মারতেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত জানলো সবাই। হলধরই মাতব্বরী করতে সবার আগে ছুটে এলো। দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ভর্তি। ঠ্যালা জোগাড় হলো একটা। সকাল থেকে আশা আশঙ্কার টানাপোড়েন বিধ্বস্ত প্রফুল্ল। অবসন্ন হয়ে ও দাওয়ার এক কোণে বসে পড়েছে। সুখেন যাবে মুখাগ্নি করতে। হলধর ঠ্যালার ওপর কাপড় বিছোতে বিছোতে বলে।

আমি পারব না। কতো রাত্তির হবে তার নেই ঠিক। কাল ইস্কুলে নেই আমার? শরীর দুমড়ে মুচড়ে হাই তোলে সুখেন।

না না খোকা যাবে না। শরীর খারাপ করবে ওর। নিভার একটানা কান্না বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ।

নাতি হয়ে মুখাগ্নি করবে না হলধর বিস্মিত।

হলধরের এই আগবাড়ানো উথলানিতে প্রফুল্লর অবসাদ ঘুচে যায়।

আমি করবো মুখাগ্নি। সুখেন যাবে না। প্রফুল্লর দৃঢ়স্বরে কিছুটা কাজ হয়। প্রফুল্লর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হলধর চুপ করে যায়।

ঠ্যালার স! প্রফুল্ল যায়। হলধর ছাড়াও জনা বারো লোক স! নিলো। বর্ষাকাল আর রাত্রিবেলা না হলে শ্মশানযাত্রী আরো কিছু জুটতো। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেই সন্ধ্যা থেকে। আকাশটা থম মেরে আছে। আরো জোরে বৃষ্টি হবে বোধহয়। প্রফুল্লদের আসতে আসতে মাঝরাত হবে নিশ্চয়ই। রাত্রিতে আর খাবার পাট নেই। মুড়ি আর গুড় কিছুটা দিয়ে দেবে সুখেনকে। ও পারবে না এতোক্ষণ না খেয়ে থাকতে। নিভা একটা বড় বাটির মধ্যে মুড়ি আর গুড় নিয়ে ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

খেয়ে নে, কেউ নেই এখন।

এই মুড়ি চিববো রাতে? তুমি খাও। হাত দিয়ে সুখেন বাটিটা ঠেলে দেয়।

লক্ষ্মী বাবা আমার, খেয়ে নে। আর একটা দিন শুধু কষ্ট কর। কালই ওই ঘরটা পরিষ্কার করবো তক্তপোশটা টেনে ফেলে দেবো বাইরে। আমার কাছে কিছু লুকনো টাকা আছে তাই দিয়ে তোকে খাট কিনে দেবো একটা। তুই একা একা থাকবি ও ঘরে। কথাগুলো গলে গলে বেরিয়ে আসে।

ও ঘরে আমি থাকবো? ওই আস্তাকুঁড়ে?

সুখেন ভ্রু তোলে বিস্ময়ে।

আরে ও ঘর কি আর ওই অবস্থায় থাকবে?

দেখবি কেমন বানাবো ওটাকে? নিভার গলায় প্রশ্রয়।

রক্ষে করো বাবা, দরকার নেই আমার। এই ঘরটা খোলামেলা, বড়। আমি আর বাবা থাকবো এই ঘরেই। তোমার লুকনো টাকার কিনে দিও একটা খাট। এই ঢাউস চৌকিটাতে বাবা শোবে, আমি জানলার ধারে নতুন খাটটা পেতে শোবো। সুখেন গড় গড় করে বলে চলে।

আর আমি? নিভা হাসে।

তুমি? তুমি আবার কোথায় শোবে? ওই তক্তপোশটায়। ওটা বিক্রি করার দরকার নেই। কোনো মানেই হয় না খালি হয়ে গেল যখন, তুমিই শোবে ওটাতে।

ওটাতে আমি শোবো? নিভা কঁকিয়ে ওঠে।

না কেন? যে সব জিনিষপত্র দিয়ে ঘর ঠাসা আছে, তা থাক। এই ঘরটা আর নোংরা করে কাজ নেই। সব যেমন আছে তেমনি থাক্। আর তুমি মেয়েছেলে তোমার আবার কি অসুবিধা?

মেয়েছেলে। নিষ্পলক দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে চোখ দুটো ফেটে বেরিয়ে আসে। শল্য চিকিৎসকের ছুরির মতো ঝক্‌ঝকে শব্দটা ছিটকে এসে ফালাফালা করে চেয়ে মণি দুটো। ছালছাড়ানো চোখে সুখেনের কপাল জুড়ে ব্রণর দাগগুলো স্পষ্ট দেখতে পায় ও। আস্তে আস্তে পা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢোকে।

তক্তপোশটা খাঁ খাঁ করছে। শক্ত, ঠাণ্ডা, শুকনো দেহটা আর পড়ে নেই। যতক্ষণ ছিল তক্তপোশটার ওপর কেউ নিভাকে চড়াতে পারেনি। ওই অথর্ব- শরীরটার মধ্যেই মা কথাটা আটকে ছিল। ওই শরীরটাকে মেরেই নিভা মা থেকে মেয়েছেলে হয়ে গেছে। খালি তক্তপোশটার ওপর লুটিয়ে পড়ে নিভা।

মা, মাগো, — পাগলের মতো ওই নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত বিছানায় মায়ের শরীরের গন্ধ খোঁজে ও।